প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

১৯ তম পুনর্মুদ্রণ ঃ অগাস্ট, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of
the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক ইতিহাস | **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় : EHI : 04 : 13-16

		রচনা	**সম্পাদনা**
একক 49-52	:	অধ্যাপক অলোক কুমার ঘোষ	অধ্যাপক জহর সেন
একক 53-54	:	অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায়	
একক 55	:	ড. সচ্চিদানন্দ ধর	
একক 56	:	ড. অমিত ভট্টাচার্য	
একক 57-60	:	অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য	
একক 61-64	:	অধ্যাপিকা সুমিত সেন	অধ্যাপক আশিস কুমার রায়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EHI – 04

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
13

একক 49 ❑ চীনের ইতিহাস 7-11

একক 50 ❑ চীনের ইতিহাস-২ 12-22

একক 51 ❑ জাপানের ইতিহাস 23-31

একক 52 ❑ জাপানের ইতিহাস-২ 32-39

পর্যায়
14

একক 53 ❑ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 40-44

একক 54 ❑ আফিম যুদ্ধ — তার পরবর্তী ঘটনা ও চীন-জাপান যুদ্ধ 45-54

একক 55 ❑ জাপান-কমোডর পেরির আগমন ও সগুনের পতন 55-70

একক 56 ❑ জাপান ১৮৬৮-১৮৮৯ 71-84

পর্যায়
15

একক 57	❑	চীনের সংস্কার অন্দোলন থেকে অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (১৮৯৮-১৯১১)	85-107
একক 58	❑	চীন ভূখণ্ডে নতুন শক্তির বিকাশ এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯১১-১৯২১)	108-122
একক 59	❑	সংবিধান পরবর্তী যুগে জাপান। (১৮৯০-১৯১৫) সাল পর্যন্ত জাপানের সমরবাদের উত্থান এবং আধুনিকীকরণ	123-133
একক 60	❑	সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররূপে জাপানের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৯১৫-১৯৩১)	134-146

পর্যায়
16

একক 61	❑	চীনের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক বিবর্তন (১৯২১-১৯৩৭)	147-160
একক 62	❑	চীনা সাম্যবাদী আন্দোলনে সাফল্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা (১৯৩৭-১৯৪৯)	161-167
একক 63	❑	বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে জাপান এবং জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৩১-১৯৪৫)	168-183
একক 64	❑	জাপানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম (১৯৩১-১৯৪৫)	184-187

একক ৪৯ ❒ চীনের ইতিহাস

গঠন

৪৯.০ উদ্দেশ্য
৪৯.১ প্রস্তাবনা
৪৯.২ চীনের নামকরণ ও জাতিবৈচিত্র্য
৪৯.৩ চীনে ঐতিহ্যবাদের প্রভাব
৪৯.৪ প্রাচীন চীনের সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র
৪৯.৫ অনুশীলনী
৪৯.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি এশিয়ার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম চৈনিক সভ্যতার ঐতিহ্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। এই একক পাঠ করে আপনি চীনের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪৯.১ প্রস্তাবনা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচারে চীন শুধু প্রাচীন নয়, বড়ও বটে। অষ্টাদশ শতাব্দে অন্তরাঞ্চল ও বহিরাঞ্চল মিলিয়ে এই চীনই ছিল বৃহত্তম সাম্রাজ্য। বর্তমান চীনের চাইতেও বেশি এলাকা তখন চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল আমুর অঞ্চলের সাইবেরিয়া বনভূমি থেকে উস্থরী পর্যন্ত। তিব্বত, বহির্মঙ্গোলিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া তখন চীনের অন্তর্গত। চারপাশের কোরিয়া, অ্যানাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল ও মধ্য এশিয়ার শেখশাসিত অঞ্চল তখন চীনের সম্রাটকে নজরানা পাঠাত। বর্তমান এককে এই বিশাল দেশটির প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেওয়া হবে।

৪৯.২ চীনের নামকরণ ও জাতিবৈচিত্র্য

'চীন' নামটি এসেছে চৌ বংশের (খ্রিস্টপূর্ব ১১২২-২৪৯) একটি করদ রাজ্য 'চিন' থেকে। চীনের উত্তর-পশ্চিমে কান্-সু এবং শেন-সি জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই 'চিন' রাজ্য। 'চিন-কুয়ো' নামে পরিচিত এই রাজ্য আশপাশের রাজ্যগুলোকে জয় করে একটি ঐক্যবন্ধ রাষ্ট্র্য গড়ে তোলে। এই সময়ে 'চিন' রাজ্যের সঙ্গে বাইরের যে সব দেশের যোগাযোগ ছিল, তারা সকলেই ঐক্যবন্ধ বড় রাষ্ট্রটিকেও 'চীন' বলে ভাবতে শুরু করে। এইভাবে গোটা পৃথিবীতেই 'চীন' নামটাই স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

চীন সাম্রাজ্য বহু জাতির বাস। আসলে মিশ্র চীনা জাতির উৎপত্তি হয়েছে মোঙ্গালীয়, তাতার, তিব্বতি, বর্মী, সান, মাঞ্চু প্রভৃতি জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণে। তাই চীনা জাতির অনেক শাখা। সাধারণভাবে চীনের অধিবাসীদের ছ'টি 'ৎ সু' বা জাতি-শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) হান্-ৎসু ; (২) মিয়াও-ৎসু ; (৩) মান্-ৎসু বা মাঞ্চু ; (৪) মং-ৎসু অথবা মঙ্গোল ; (৫) হুই-ৎসু অর্থাৎ মুসলমান এবং (৬) ৎসাং-ৎসু বা তিব্বতীয়। এদের মধ্যে জাতি হিসেবে হান্‌রাই প্রাচীনতম এবং প্রধান। চীনের ইতিহাস বা সভ্যতা বলতে এদেরই ইতিহাস বা সভ্যতাকে বোঝায়, এরাই চীনের প্রকৃত প্রতিনিধি। তবে সব জাতি বা শাখাই সাধারণভাবে নিজেদের চীনা বলে ভাবে এবং সেটা তাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। মান্দারিন হল তাদের সর্বজনীন ভাষা।

চীনের ভাষা নিয়ে সাধারণভাবে একটা ভুল ধারণা চালু আছে। অনেকে মনে করেন, চীনের ভাষা বর্ণভিত্তিক নয়, চিত্রভিত্তিক। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। চীনা ভাষার সংরচন ও ব্যবহারের ছ'টা ভাগ আছে। এর একটা মাত্র ভাগ চিত্রধর্মী। বাকি ভাগগুলো বর্ণধর্মী। তবে সমগ্র চীনেই লেখার ও বলার ভাষা এক। এই একভাষিকতাও চীনের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

৪৯.৩ চীনে ঐতিহ্যবাদের প্রভাব

চীন একটি গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী দেশ (traditionalist)। তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ ধরন ছিল। মার্কোপোলোর মতো মধ্যযুগীয় পর্যটক, আর ভোলতেয়ার—দিদেরো-র মতো অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক—সকলেই একথা স্বীকার করেছেন। নিজেদের কৃষ্টি বিষয়ে চীনারা খুবই অভিমানী ছিলেন। স্বদেশকে তারা বলতেন ঝংগুয়ো বা আসল দেশ ; নিজেদের সভ্যতাকে বলতেন ঝংঘুরা বা সব সভ্যতার মূল। চীনাদের দাবি, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকেই তারা ছ'প্রকার কলাবিদ্যায় পারদর্শী। এগুলো হল : 'লি' বা শিষ্টাচার, 'য়ো' বা সংগীত, 'শে' বা ধুনর্বিদ্যা, 'য়ু' বা সারথ্য, 'শু' বা রচনা এবং 'সু' বা অঙ্কশাস্ত্র। চীনের স্বাভাবিক জীবনদর্শন সৃষ্টিবাদ (Creationism) বা অদ্বৈতবাদ (Monism) কোনোটিকেই গ্রহণ করেনি। কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তাদের জগৎ তৈরি হয়েছে, একথা যেমন তারা বিশ্বাস করেনি, তেমনি অতীন্দ্রিয় পরমপিতা আর তাদের জাগতিক জীবন অভিন্ন সূত্রে বাঁধা—একথাও তারা বলতে চায়নি। তাদের ধারণায়, জীবপ্রক্রিয়ার দুটো বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। একটি হল 'ইন' এবং অন্যটি হল 'ইয়াং'—যেমন সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, সাকার-নিরাকার, গুণ-নির্গুণ, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিন, নারী-পুরুষ ইত্যাদি। এই দুই-এর টানাপোড়েনেই সভ্যতা তৈরি হতে থাকে। অনেকে বলেন, টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্বের ধারণা চীন সংস্কৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি। তাই মাও-সে-তুং সহজেই তাদের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝাতে পেরেছিলেন।

এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে চীনা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তাকে চীনারা মনে করত পবিত্রতম বা সভ্যতম। তাদের মতে, চীনা সভ্যতার প্রধান গুণ চারটি।

(ক) চীনা সভ্যতা মৌলিক এবং সৃজনক্ষম। চীনা সভ্যতা কাউকে অনুকরণ করেনি, চীনারা তাই কার কাছে ঋণী নয়।

(খ) স্থায়িত্ব এই সভ্যতার বড় গুণ। মিশর, ব্যাবিলন ও সিন্ধুর সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু চীনের সভ্যতা শুধুই টিকে যায়নি, প্রসারলাভও করেছে।

(গ) এই সভ্যতা বহুব্যাপ্ত। আয়তনে চীন বিরাট। এই বিশাল দেশে এক ভাষা, এক বর্ণমালা।

(ঘ) চীনা সভ্যতার চতুর্থ গুণটি হল এর মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা।

ঐতিহ্যবাদের প্রভাবে চীনারা এই গুণগুলোকে বাইরের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিল। তাই অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতাকে (Herodianism) তারা বর্বর মনে করেছিল এবং জাপানি প্রয়োগবাদকে দূরে রেখে পশ্চিমের দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে ছিল। সমাজ রক্ষা করতে হলে প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তি অটুট রাখা দরকার, কনফুসীয় এই শিক্ষা চীনারা কখনো ভোলেনি। পশ্চিমী পণ্যসভ্যতার স্পর্শে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে, এই ভয়ে তারা দীর্ঘদিন পশ্চিমকে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিয়েন্-লুং রাজত্বের সময়ে ব্রিটিশি প্রতিনিধি লর্ড ম্যাকার্টনি ব্রিটেন-রাজের শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে চীনে আসেন। কিন্তু জবাবে চিয়েন্-লুং ব্রিটেন-রাজকে একটা চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি লেখেন—

"আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য তদারক করবার জন্য লোক পাঠাবার যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তা অনুমোদন করা সম্ভব নয়, কেননা সেটা আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের আইনবিরুদ্ধ। আমার প্রধান কাজ প্রজাপালন। দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান জিনিস আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

বস্তুত, আমার এই স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে কোনো জিনিসের অভাব নেই। সবই প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহির্জগতের বর্বরদের তৈরি কোন জিনিস আমদানি করবার আমার দরকার নেই।"

৪৯.৪ প্রাচীন চীনের সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র

বহুজাতিক চীন ছিল মিশ্র সংস্কৃতির পীঠস্থান। ধরে নেওয়া হয় যে, বহুদিন ধরে আটটি কৌণিক সংস্কৃতির ধারা এসে তৈরি করেছিল চীনা সংস্কৃতি। (১) এদের মধ্যে একটি ছিল হোপেই (বেজিং-এর চারপাশ), শান্টুং এবং দক্ষিম মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পূবালি সংস্কৃতি। আদি সাইবেরীয় গোষ্ঠীজাত এই সংস্কৃতির ধারকরা 'শিকারী' থেকে বুনিয়াদী 'কৃষকে' উন্নীত হয়েছিল। (২) এরই পশ্চিমে ছিল শান্‌সি ও অন্তর্মঙ্গোলিয়ার জেহল প্রদেশের উত্তুরে সংস্কৃতি। এখানকার মোঙ্গাল জাতির মানুষ ছিল যাযাবর পশুপালক। (৩) আরও পশ্চিমে আদিম তুর্কিরা শেন্‌সি আর কাংসু প্রদেশে গড়ে তুলেছিল উত্তর-পশ্চিম সংস্কৃতি। তারা কৃষিকাজ জানত, ভেড়া ও ছাগল পালন করত, ঘোড়াকেও তারা পোষ মানিয়েছিল। (৪) পশ্চিমের সেঝুয়ান এবং কাংসু-শেনসি-র পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে তিব্বতিরা। তারা ছিল প্রধানত মেষপালক। এই চারটি সংস্কৃতি ছাড়া দক্ষিণে ছিল চার ধরনের সংস্কৃতি। সেগুলো হল অস্ট্রো-এশিয়াটিক লিয়াও সংস্কৃতি, কোয়াংটুং এবং কোয়াংসির থাইঘেঁষা ইয়াও সংস্কৃতি, আদি থাই সংস্কৃতি এবং ইয়াও ও থাই-এর সম্পূর্ণ মিশ্রণের পর নতুন আর একটি মিশ্র সংস্কৃতি। দক্ষিণের এই সংস্কৃতিগুলো মূলত ছিল কৃষিমুখী।

ওলফার্ম এবারহার্ড-এর (Wolfram Eberhard) মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই আটটি ধারাকে পৃথক পৃথকভাবে চেনা যেত। কিন্তু এর এক শতকের মধ্যেই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতিগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দুটো প্রধান চৈনিক সংস্কৃতি-চেতনা গড়ে ওঠে। পূর্বে লুং শান (Lung Shan) ও পশ্চিমে ইয়াং-শাও (Yang Shao)। লুং শান সংস্কৃতির মানুষরা কৃষিকাজে উন্নত ছিল, তাদের স্থায়ী কৃষিজমি ছিল, স্তরবিন্যাস্ত সমাজভিত্তিক গ্রামগুলো মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত এবং তারা চাকা ঘুরিয়ে চমৎকার কালো মৃৎপাত্র তৈরি করত। ইয়াং-শাও গ্রামগুলো তুলনায় ছিল অস্থায়ী। তবে তারাও সুন্দর সুন্দর পাথুরে হাতিয়ার (কাস্তে, কোদাল) ব্যবহার করে কৃষির উন্নতি ঘটিয়েছিল। ভেড়া ও ছাগল ছাড়াও তারা শূয়োর ও কুকুর পালন করত। লাল, কালো ও সাদা—এই তেরঙ্গা মৃৎপাত্র তারা বানাতে জানত। রেশমের ব্যবহারও তারা আবিষ্কার করেছিল বলে জানায়। প্রথম সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাও এই ইয়াং-শাও-এর হোনান অঞ্চলেই গড়ে ওঠে বলে মনে করা হয়। সম্ভবত ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এখানে ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় এবং ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তা বিস্তৃত অঞ্চলে ২২০৫ অব্দে ই-উ (Yii) এখানে সিয়া (Hsia) রাষ্ট্রের পত্তন করেন। এই বংশের শাসন স্থায়ী হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭২৫ মতান্তরে ১৭৬৬ অব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের চীনে সামন্ততন্ত্র ছিল না। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজের ভিত্তি ছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

৪৯.৫ অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। চীনের জাতিগত উৎস কী ছিল? চৈনিক সভ্যতার উপর ঐতিহ্যবাদী প্রভাব কতটা ছিল?

২। প্রাচীন চীনের সাংস্কৃতির ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। কোনো কোনো জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণে চীনা জাতির সৃষ্টি হয়েছিল? তাদের বিভিন্ন শাখাগুলি কী কী?

২। প্রাচীন চীনে সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিক ধারণা প্রচলিত ছিল কি?

৩। উত্তর চীনে যে চারটি সাংস্কৃতিক ধারার প্রাধান্য ছিল, সেগুলো কী কী?

৪। দক্ষিণ চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কী ছিল?

৫। প্রাচীন চীনে লুং শান ও ইয়াং শাও গ্রামগুলির মধ্যে কোনো চারিত্রিক পার্থক্য ছিল কি?

বিষয়ানুগ প্রশ্ন ঃ

১। মান্দারিন কী?

২। ঝংঘুয়া শব্দটির অর্থ কী? ঝংগুয়ো কাকে বলা হত?

৩। জেহল প্রদেশটি কোথায় অবস্থিত ছিল?

৪। আদিম তুর্কিরা চীনের কোন্ অঞ্চলে বসতি করেছিল?

৫। প্রাচীন চীনের কোন্ প্রদেশে ইয়াও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল?

৬। কালো মৃৎপাত্র চীনের কোথায় তৈরি হত?

৭। প্রাচীন চীনে কৃষির হাতিয়ার কী দিয়ে বানানো হত?

৮। ইয়াং শাও গ্রামে কোন্ কোন্ পশু পালন করা হত?

৯। ইয়াং শাও গ্রামের মৃৎপাত্রে কী কী রং থাকত?

১০। প্রাচীন কোথায় কখন প্রথম ব্রোঞ্জের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়?

৪৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। P.B. Ebrey (ed.) : Chinese Civilisation and Society, 1981.

২। J.K. Faibank (ed.) : The Cambridge History of China, Vol. 10. 1978

৩। Wolfram Eberhard : A History of China, 1977.

৪। W.S.Morton : China, Its History and Culture, 1980.

৫। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ মহাচীনের ইতিকথা, ১৩৬৭ (বাং)।

একক ৫০ ❒ চীনের ইতিহাস—২

গঠন

৫০.০ উদ্দেশ্য
৫০.১ প্রস্তাবনা
৫০.২ প্রাচীন চীনের সামন্ততন্ত্র
৫০.২.১ আদি সামন্ততন্ত্র
৫০.৩ সামন্ততন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়
৫০.৩.১ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
৫০.৪ চীনের সামাজিক ভিত্তি—পরিবার
৫০.৫ পুরোনো চীনের অর্থনীতি
৫০.৬ চীনে ধর্মচেতনা
৫০.৭ জেন্ট্রি ও কৃষক : সামাজিক দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন
৫০.৮ চীনের রাজবংশসমূরে কালানুক্রম
৫০.৯ চীনে মধ্যযুগের অবসান
৫০.১০ অনুশীলনী
৫০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৫০.০ প্রস্তাবনা

প্রাচীন চীনে সমাজ, অর্থনীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগুলো কীভাবে গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই এককটির উদ্দেশ্য। এই এককটি পাঠ করে আপনি চীনের সামন্ততন্ত্রের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য পরিবারের ধরন, কৃষি, শিল্প, ধর্মচেতনা, চীনের সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং রাজবংশগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫০.১ প্রস্তাবনা

কৃষিভিত্তিক চীনে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ অব্দে সামন্ততন্ত্রের একটা গড়ন লক্ষ্য করা যায়। চৌ-বংশের আমলে সেই সামন্ততন্ত্র পরিণত হয়ে উঠেছিল। ব্যাপক, কেন্দ্রীভূত ও দীর্ঘস্থায়ী এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবারও এক বিশেষ নীতিকাঠামোর মধ্যে সাংগঠনিক ভিত্তিরূপ পেয়েছিল। ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক দ্বন্দ্ব—সবকিছুর কেন্দ্রেই ছিল এই পরিবার। জেন্ট্রি ও কৃষকদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও

যেমন চীনা সামন্ততন্ত্র ভেঙে যায়নি, তেমনি এই পরিবারও তার পুরোনো চেহারায় ছিল অটুট। চীনা সমাজ ও অর্থনীতির এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সরল আলোচনা বর্তমান এককে করা হয়েছে।

৫০.২ প্রাচীন চীনের সামন্ততন্ত্র

দীর্ঘকাল ধরে চীনের রাজনীতি-অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। মধ্যযুগে কৃষি যেমন সংগঠিত উৎপাদনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেমনি একে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছিল সামন্ততন্ত্র। চীনের সামন্ততন্ত্রকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ অব্দে শুরু হয় আদি-ব্যবস্থার সামন্ততন্ত্রের (early feudalism) পর্যায়। তার প্রায় তিন-চারশো বছর পর দেখা যায় পরিণত সামন্ততন্ত্র (mature deudalism)।

৫০.২.১ আদি সামন্ত্রতন্ত্র

ইয়াং-শাও, মতান্তরে লুং-শান সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা শাং বংশের শাসনকালে চীনের আদি-সামন্ততন্ত্র দেখা যায় বলে অনেকে মনে করেন। হোনান, পশ্চিম শান্টুং, দক্ষিণ হোপেই, মধ্য ও দক্ষিণ শান্‌সি, পূর্ব শেন্‌সি এবং কিয়াংসু ও আনহুই-এর অংশবিশেষ নিয়ে আনুমানিক একাদশ-দশম খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠেছিল শাং রাষ্ট্র। সেচভিত্তিক কৃষি আর অশ্ব-রথে চড়ে তীর-ধনুক দিয়ে লড়াই—এই ছিল শাং রাষ্ট্রের মূল শক্তি।

শাং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ও রাষ্ট্রের সব জমির মালিক ছিলেন রাজা, যিনি মৃত্যুর পর 'তি' বা পরম-দেবতার মর্যাদা পেতেন। রাজার উত্তরাধিকারের নিয়ম ছিল মজার। একজন রাজা মারা যাওয়ার পর তার পরবর্তী ভাই রাজা হতেন। সব ভাইয়ের মৃত্যু হলে প্রথমে বড় ভাইয়ের ছেলেরা, বড় থেকে ছোট, তারপর তার পরে ভাইয়ের ছেলেরা পরপর রাজা হতেন। রাজার 'চেন ' কর্মচারীরা অভিজাতদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। অভিজাত জমিদাররা রাজাকে 'কর' পাঠাতেন। অন্তত ৩০টি রাজ্য থেকে আসত নজরানা।

রাজার পরেই সামাজিক স্থান ছিল অভিজাতদের। তারাই হতেন জমির নিয়ন্ত্রক। তারা ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন। সাধারণ মানুষের গাড়ি চড়ার অধিকার ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তারা মূলত ছিলেন অভিজাতদের অধীনে ভূমিদাস। গ্রামের কারিগর ও শিল্পীরাও বংশপরম্পরায় তাদের অধীনে থাকতেন। শাং রাজা যখন অন্য কোনো রাজ্য জয় করতেন, তখন সেই রাজ্যের কৃষক-কারিগর-শিল্পীরাও এমনিভাবে দাস-এ পরিণত হতেন, আর সেই রাজ্যের অভিজাতরা শাং রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গো যুক্ত হয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে চৌ বংশ যখন শাং রাজ্য জয় করে নেয়, তখন শাং রাজ্যের বেলায় একই ঘটনা ঘটে।

৫০.৩ সামন্ততন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়

পশ্চিমী ধাঁচে না হলেও চৌ বংশের আমলে যে চীনে পরিণত সামন্ততন্ত্রের ছবি দেখা গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। চৌ-রা পশ্চিমদিকের অঞ্চল থেকে পূর্বদিকে শাং রাষ্ট্রের দিকে এগিয়েছিলেন।

একসময়ে শাংদের সঙ্গো তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তারপর দশম খ্রিস্টপূর্বাব্দের কোনো এক সময় ব্রোঞ্জ ধাতুর উন্নততর অস্ত্রের অধিকারী চৌ-রা শাংদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মধ্য জোনানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চৌ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শাং-সংস্কৃতির সঙ্গো তারা জুড়ে দেন পশ্চিম থেকে নিয়ে আসা তুর্কি আর দক্ষিণ থেকে নিয়ে আসা তিব্বতি সংস্কৃতি।

ঘটা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সুং ফা' বা মহামহিম চৌ-সম্রাট অভিজাতদের ভূম্যধিকার প্রদান করতেন, সেই সঙ্গো দেওয়া হত একটি সনদ। তাতে লেখা থাকত, নতুন সামন্তপ্রভুর অর্থনৈতিক ও সামরিক দায়দায়িত্বের কথা। প্রথমে চৌ-বংশের আত্মীয়দের মধ্যেই এই ভূম্যধিকার বিলি করা হত, তারপর সহযোগী গোষ্ঠীগুলোর মোড়লদের। বড় ভূস্বামীরা আবার স্বগোত্রের অন্যদের মধ্যে পত্তনি দিতেন। এইভাবে তৈরি হত উপ-সামন্ত-সত্ত্ব। কয়েক শতকের মধ্যে ভূম্যধিকার হয়ে যায় পারিবারিক এবং হাং বংশের রাজত্বের সময় (আনুমানিক ২০৬-২২০ খ্রিস্টাব্দ) অভিজাত চীনারা কৌমের বদলে পরিবারের নামেই পরিচিত হতে থাকে। এই অভিজাতদের মধ্য থেকেই চীনের সামন্ত প্রশাসকশ্রেণী বা ম্যান্ডারিন তৈরি হয়েছিল। প্রধানত ছ'রকমের ম্যান্ডারিন তখন দেখা যেত। রাজকীয় দপ্তরের জন্য 'Mandarin of Heaven', জনকল্যাণের জন্য 'Mandarin of Earth', ধর্মানুষ্ঠানের জন্য 'Mandarin of Spring' প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের জন্য 'Mandarin of Summer' বিচারের জন্য 'Mandarin of Autumn' এবং পূর্ত দপ্তরের জন্য 'Mandarin of Winter'।

৫০.২.১ সামন্ত্রতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনে সামন্ততন্ত্র সংহত হয়ে উঠেছিল। এই সামন্ত্রতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। চীনা সামন্ততন্ত্র ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও কেন্দ্রীভূত। সাধারণ ব্যবহার্য হস্তশিল্পভিত্তিক সব বস্তু কৃষকরা ও তাদের সহযোগী কারিগররা গ্রামেই তৈরি করে নিত বটে, কিন্তু খনিজ শিল্প ও উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো ভূস্বামী রাষ্ট্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের কারিগররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল রাষ্ট্রীয় দাস। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সংগঠিত রাজকীয় আমলাতন্ত্রর সম্রাটের নেতৃত্বে ভূস্বামীদের প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু এই আমলাতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসকগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং চীনা সামন্ততন্ত্র ছিল কেন্দ্রীভূত এক অতি উন্নত সামন্তব্যবস্থা।

চীনের সামন্ত্রতন্ত্র ছিল দীর্ঘস্থায়ী। সমাজে পুঁজির বিকাশের শর্ত উপস্থিত ছিল না তা নয়, কিন্তু তবুও সামন্ত ব্যবস্থা টিকে গিয়েছিল। মিং রাজবংশের আমলে (১৩৬৮-১৬৪৪) সামন্ত খাজনা ও দৈহিক শ্রমকে একত্রিত করে রৌপ্যমুদ্রায় দেয় অর্থ খাজনায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চিং রাজবংশের আমলে কুয়াংসি প্রদেশের খনিশিল্পে, কুয়াংতোং প্রদেশের বস্ত্রশিল্পে বা চিয়াংসি প্রদেশের চীনামাটির শিল্পে শ্রমবিভাগের বিকাশ ঘটেছিল। শান্‌সি প্রদেশের খাজাঞ্চিখানায় প্রাচীন ব্যাঙ্কিং ও ঋণব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও চীনা সামন্তব্যবস্থার দেওয়াল ভাঙেনি। এর কারণ সংগঠিত চীনা সামন্তবাদে ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী ভূস্বামীদের অধীনস্থ হয়ে যেত ও এই তিনের নিবিড় সমন্বয় সামন্ততন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলত। যেহেতু ব্যবসায়ীদের ও মহাজনদের রাজনৈতিক আভিজাত্য স্বীকার করা হত না, তাই তারা পুঁজির মালিক হওয়ার পর ভূস্বামী শ্রেণী ও রাজকীয় আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এতে চীনা সামন্তব্যবস্থারই সংহতি বৃদ্ধি পেত।

৫০.৪ চীনের সামাজিক ভিত্তি—পরিবার

কৃষিপ্রধান সামন্ত চীনের সামাজিক জীবন প্রধানত ছিল গ্রামভিত্তিক। বিভিন্ন পরিবারের গোত্রনাম, কুলনাম বা দেবালয়ের নাম অনুসারে গ্রামের নামকরণ হত, যেমন চ্যাং, ওয়াং, লি ইত্যাদি। চীনের গ্রামজীবনের ভিত্তি ছিল কৌলিক সংগঠন। পরিবার এই কৌলিক সংগঠনেরই অংশমাত্র ছিল। কৌলিক জীবন ছিল অনেকটাই 'বংশ-মন্দির', 'শাখা-মন্দির' বা 'পারিবারিক দেবালয়ে'-র উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় মন্দিরকে বলা হত তু-তি-মিয়াও।

চীনা সমাজে পরিবারকে এবং পারিবারিক বন্ধনকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত। চীনের আদর্শ পরিবার হল বহু আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে সম্মিলিত বড় পরিবার। এইরকম পরিবারকে বলা হত 'উ তাই তুং তাং' বা 'পাঁচপুরুষের বাস'। চীনা পরিবারে ভাইবোনদের মধ্যে বড়কে বলা হয় 'শিউং' এবং 'ৎসু', ছোটদের বলা হয় 'তি' এবং 'মেই' ; জ্যেঠামশাইকে বলে 'পো', কাকাকে 'শু' পিসিমাকে বলা হয় 'কু', মামা এবং মাসিমাকে যথাক্রমে 'চিন্' এবং 'য়ি' ; জ্যেঠিমা হচ্ছে 'পো-মু', কাকিমা 'শু-মু', পিসেমশাই 'কু-ফু', মামিমা 'চিন-মু' মেসোমশাই 'য়ি-ফু' ; খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইবোনদের বলা হয় যথাক্রমে 'থাং-শিউং-তি' এবং 'থাং-ৎসু-মেই'। এদের সবাইকে নিয়েই হল আদর্শ পরিবার। কনফুসীয় নীতি অনুসারে, এই আদর্শ পরিবারই হল নৈতিক শিক্ষা, আচার-আচরণ, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির প্রধান কেন্দ্র।

চীনা পরিবার ছিল সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক। পিতার পরেই ছিল জ্যেষ্ঠর কর্তৃত্ব এবং অনুজের কর্তব্য ছিল অগ্রজের নির্দেশ মেনে চলা। বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুত্রসন্তান লাভ ও বংশরক্ষা। পুরুষদের একাধিক বিয়ে আইনসম্মত না হলেও তারা উপপত্নী রাখতে পারতেন এবং সমাজে উপপত্নী ও তার সন্তানদের বৈধ মর্যাদা ছিল। আমেরিকার বিখ্যাত কথাশিল্পী পার্ল এস. বাক-এর 'দি গুড আর্থ' (The Good Earth) উপন্যাসে এই সামাজিক ছবি চমৎকার ধরা হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ শাসিত 'জু' বা গোত্রভিত্তিক চীনা সমাজে মেয়েদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। 'মুই সাই' প্রথা অনুসারে আর্থিক সংকটের সময় বাবা-মা ধনীদের কাছে মেয়েদের বিক্রি করে দিতেন। তারা ধনীগৃহে আজীবন রক্ষিতা বা দাসী হয়ে থাকত। সাধারণভাবে 'লি চি' বা সরকারি নির্দেশ অনুসারে নারীর বাধ্যতা ছিল তিন প্রকার (সান-ৎ সুং), আর তার গুণ হল চার প্রকার (স্সু-তেহ্)। তারা (১) বাল্যে পিতা, (২) যৌবনে স্বামী এবং (৩) বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। তাদের চারটি গুণ হল—(১) সতীত্ব, (২) সংযম ও মিষ্টভাষণ, (৩) রমণীয়তা ও নম্রতা এবং (৪) গৃহকর্ম-নৈপুণ্য। চৈনিক সমাজে তাকেই আদর্শ নারী বলা হত, যিনি 'লিয়াংচি' এবং 'শিয়েন-মু' অর্থাৎ 'সুগৃহিণী' এবং 'দয়ালু মা'।

চীনের সমাজ সংগঠনে বর্ণপ্রথা একেবারেই ছিল না। আদিতে চীনারা চার ভাগে বিভক্ত ছিল—শিহ্ বা পণ্ডিত, নুং বা চাষি, কুং বা শ্রমিক এবং শাং বা বণিক। কিন্তু এই বিভাজন ছিল কর্মভিত্তিক। সমাজে স্তরান্তর প্রচলিত ছিল।

৫০.৫ পুরোনো চীনের অর্থনীতি

সভ্যতার শুরু থেকেই কৃষিকাজকে চীনের অর্থনৈতিক ভিত্তি বলে মনে করা হত। পৌরাণিক সূত্র অনুসারে, দশ হাজার বছরেরও অনেক আগে সম্রাট শেন মুং চীনাদের ভূমিকর্ষণ শিখিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বসন্তে রাজা নিজে প্রজাদের সামনে হলচালনা করে হলকর্ষণ উৎসবের সূচনা করতেন। পেইপিং বা বেইজিং-এর কৃষিমন্দিরে উৎসব হত, একে বলা হত 'শিয়েন নুং তান্'।

চীনে বরাবরই কৃষিকাজকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। একটা প্রবাদই ছিল এইরকম : "যদি একটিমাত্র লোকও চাষ না করে, তবে কেউ না কেউ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।" এমনকি 'শী তাই ফু' বা রাজকর্মচারীরাও অবসর নেওয়ার পর চাষের কাজে লেগে যেতেন। প্রাচীন চীনা সাহিত্য এ বিষয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। মহামুনি মেনশিয়ুস লিখে গেছেন, "বসন্তকালে রাজা চাষের কাজ পরিদর্শন করে ঘাটতি শস্যের বীজ দান করতেন ; শরৎকালে ধান উৎপাদন পরিদর্শন করে তিনি ঘাটতি শস্যের মূল্য দিতেন।" দেশপ্রেমিক কুয়ান ৎসু-র কথায়, "কৃষিপ্রধান জাতীয় সম্পদ, অতীতে তাই রাজারা কৃষকদের শ্রদ্ধা করতেন।" কনফুসীয় নীতিমালাতেও বলা আছে, 'ঝং নং বিং শাং' অর্থাৎ "কৃষিকে মর্যাদা দাও, বাণিজ্যকে নয়।" প্রচুর পরিমাণে নানা জাতের শস্য চীনে উৎপাদিত হত। দক্ষিণ ও মধ্য চীনে ধান, আর উত্তর চীনে গমন, ভুট্টা, সয়াবিন ও বাদাম প্রধান শস্য ছিল। চীনে নানা জাতের ভেষজ গাছ পালন করা হত।

কৃষি চীনা অর্থনীতির ভিত্তি হলেও শিল্পে তারা মোটেই পিছিয়ে ছিল না। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছিল নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পুরোনো ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, য়ৌ-ৎ সাও প্রথম স্থাপত্যবিদ্যার সূচনা করেন। আগুন ব্যবহারের শিক্ষা দেন সুয়েই জেন। চিত্রাঙ্কন প্রথা ও লিখিত অক্ষরের প্রচলন করেন ফু-শি। সময় পরিমাপের উপায়ও তিনিই উদ্ভাবন করেন। শেন নুং আবিষ্কার করেন লাঙল এবং কোদাল। ভেষজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। এছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের মধ্যেই চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল—(১) পোশাক ও টুপি, (২) যান ও নৌকা, (৩) হামান দিস্তা, (৪) তির-ধনুক, (৫) ধাতুমুদ্রা ও (৬) শবাধার। 'শান তাই' অথবা ত্রিবংশের সময় থেকে, (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১০০০) লু-য়ি বা ষড়শিল্প এবং লু-কু বা ষড়কর্ম পদ্ধতির চর্চা চীনে ছিল। ছ'রকম কর্মপদ্ধতি বা বিজ্ঞানের নাম হল—(১) তু-কুং (স্থাপত্য), (২) চিন্-কুং (ধাতুবিদ্যা), (৩) শি-কুং (গৃহনির্মাণ শাস্ত্র), (৪) মু কং (আসবাববিদ্যা), (৫) সউ-কুং (প্রাণীবিজ্ঞান) এবং (৬) চ্ছাও-কুং (উদ্ভিদবিদ্যা)।

লবণ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য বহু আগে থেকেই চীনে খনন চালানো হত। ধাতু গলানোর জন্য ব্যবহৃত হত জলচাকাবিশিষ্ট হাপর। খণ্ডিত তোরণ, ঝুলন্ত সেতু বানাবার কায়দা চীনারা রপ্ত করেছিল। এছাড়া তারা আবিষ্কার করেছিল ভূমিকম্প ও দিকনির্ণয়ের যন্ত্র, কাগজ, বারুদ, ছাপাখানা ও চীনামাটি। প্রায় সাতহাজার বছর আগে থেকেই চীনে রেশমশিল্পের খ্যাতি ছিল। রোমান ভাষায় চীনকে বলা হত 'সেরিকা' জানত বলে চীনাদের লৌহশিল্প পরবর্তীকালে দ্রুত উন্নতি করে। প্রথম খ্রিস্ট-শতাব্দের লেখক প্লিনি জানিয়েছেন, তার সময়কার রোমে চীন থেকে আসা লোহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। অধ্যাপক

নিডহামের মতে, পঞ্চম শতাব্দের পর চীনারা যে-কোনো পরিমাণ ঢালাই লোহা তৈরি করতে পারত এবং ইস্পাত তৈরিতেও তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

শিল্পে ও বাণিজ্যে চীনের কর্মিক সংগঠন ছিল খুবই পুরোনো। কোনো বিশেষ শিল্পসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও কর্মীদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনকে বলা হত 'হাং'। একই ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের বলা হত 'তুং-হাং'। হাংগুলোর জেলা বা প্রদেশের প্রধান শহরে স্থানীয় কেন্দ্র থাকত, সেই সঙ্গো বছরে দুবার সাধারণ সভা আহুত হত। প্রতিটি হাং কোন বিশেষ দেবতার পুজো করত, যেমন আমাদের দেশে "সিদ্ধিদাতা গণেশ"-এর পুজো করা হয়।

৫০.৬ চীনের ধর্মচেতনা

চীনা সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্ম। ধর্মাচরণের ভিত্তি আবর ছিল কতকগুলো সামাজিক সম্বন্ধ ঃ 'সান-কাং' বা তিন-বন্ধন, 'লু-চি' বা ছয় বিভাগ, 'উ-লুন', বা পাঁচ কুটুম্বিতা এবং 'চিউ-ৎসু' বা নয় পুরুষ। 'সান কাং'-এর মধ্যে আছে—(১) রাজা-প্রজা, (২) পিতা-মাতা-সন্তান এবং (৩) স্বামী-স্ত্রী। 'লু-চি'র মধ্যে আছে—(১) ভাইবোন, (২) পিতা-পিতৃব্য, (৩) বংশানুক্রম, (৪) মাতা-মাতুল, (৫) শিক্ষক-ছাত্র এবং (৬) বন্ধু-বান্ধবী। 'উ-লুন' ও 'চিও-ৎসু' হল বর্তমান ও ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নিয়ে।

এইসব সম্বন্ধে আবদ্ধ চীনারা অনেক নীতিপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণের সূচনা করেছিল। যুগযুগ ধরে চীনা মনীষীরা এইসব নীতি রচনা করেছিলেন। নীতিগুলোর প্রথমেই উল্লেখ্য 'উং চাং' বা পাঁচটি নীতি। এগুলো হল ঃ জেন—উপচিকীর্ষা, য়ি—ন্যায়পরায়ণতা, লি—শিষ্টাচার, চিহ—জ্ঞান এবং শিন—সত্যবাদিতা। দ্বিতীয়ত উল্লেখযোগ্য 'স্‌সু-শিং' বা চার-কর্তব্য। এগুলো হল শিয়াও—বাৎসল্য, তি—সৌভ্রাতৃত্ব, চুং—বিশ্বস্ততা, শিন—সত্যনিষ্ঠা। এছাড়াও চীনে বহুবিধ নীতি চালু ছিল। পরবর্তীকালে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন এই সূত্রগুলোকে একত্র করে নতুন নীতিধারার প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয়, 'পা-তেহ্‌' বা আটপ্রকার ধর্মনিষ্ঠা।

মধ্যযুগের চীনে যে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনার বিকাশ ঘটে, তার তিনটি ধারা ছিল। এই তিন ধারার ভিত্তি রচনা করেছিল ফুসফুসীয় নীতিমালা, তাও-শিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্ম।

কনফুসীয় নীতিমালার প্রবক্তা দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্ব) শান্টুং প্রদেশের লু নামক সামন্তরাজ্যের এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন। বাবা শিউ লিয়াং ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং মা চেন সাই ছিলেন অভিজাত 'ইয়েন' বংশের মেয়ে। কনফুসিয়াস নামটি ল্যাটিন। এর চীনা নাম 'ফুয়াং ফু জি', অর্থাৎ মহাপ্রভু কুং।

কনফুসিয়াস প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, ছিলেন নীতিশিক্ষক। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, কনফুসিয়াসকে প্রাচীন গ্রীসেও লাইকারগাস বা সোলোনের সম-আসনে রাখাই ভালো (Confucius himself belongs rather to the type of Lycurgus and Solon than to that of the great founders of religious–Bertrand Russel : The Problem of China). কনফুসিয়াস নিজে কোনো মৌলিক তত্ত্বের দাবি করেননি। তিনি তাঁর নীতিধর্মে (লি) প্রাচীন জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর কথা বলেছিলেন। তিনি পাঁচটি নৈতিক বিষয়ের কথা বলেন—দান, শুচিতা, জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও বিশ্বাস।

এছাড়াও তিনি ছ'টি গুণের অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো হল, সু (পরার্থপরতা), জেন (মানবিকতা), ই (সত্যনিষ্ঠা), লি (শালীনতা), চি (প্রজ্ঞা) ও সিন (আন্তরিকতা)। রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ এবং বন্ধু-বান্ধবী এই পঞ্চ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কনফুসীয় নীতিমালার অন্যতম অংশ। কনফুসিয়াস শাসকের কল্যাণকর শাসন ও ন্যায়সংগত আচরণের ওপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, রাজা তার কর্তব্যে ব্যর্থ হলে প্রজার বিদ্রোহ বৈধ। তাঁর মতে, প্রজারাই রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি।

কনফুসিয়াসের শিক্ষায়তনকে বলা হত 'শতদর্শন শিক্ষায়তন'। তাঁর শিক্ষার প্রধান তিনটি বিষয় ছিল ইতিহাস, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্র। প্রাচীন ঐতিহ্যক মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কনফুসিয়াস ধ্রুপদী বিদ্যা উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিহাস মন্থন করে তিনি গ্রন্থপঞ্চক সংকলন করেছিলেন। এগুলো হল ঃ

১। লি চি বা অনুষ্ঠানপঞ্জি। এতে আছে ধর্মব্যাখ্যা ও সদাচারের নিয়মাবলি ;

২। ই কিং বা পরিবর্তন-তত্ত্ব। প্রধানত জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং জ্যামিতিক-বিদ্যা এতে আছে ;

৩। সি কিং বা কাব্যগ্রন্থ। এটা মানুষের জীবন ও নীতি বিষয়ে অনেক প্রাচীন কবিতার সংকলন ;

৪। চুন-কিউ বা বসন্ত ও শরতের বিবরণ। এটা কনফুসিয়াসের মাতৃভূমি লু-র ইতিহাস ;

৫। সু-কিং বা ইতিহাসগ্রন্থ। এটা আদি চীনের ইতিবৃত্ত।

এই গ্রন্থপঞ্চক ছাড়াও চারটি 'সু' বা গ্রন্থ, মোট ন'টি গ্রন্থের সমষ্টি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। 'প্রাজ্ঞবচন' বা Analect তার একটি, কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশাবলি এই গ্রন্থে সংকলিত করেন। অন্য তিনটি গ্রন্থ হল ঃ (১) টা-সুয়ে বা মহাবিদ্যা, (২) চু ইয়াং বা মধ্যপন্থা এবং (৩) মেনাসিয়াসের গ্রন্থ। সক্রেটিসের ভাষ্যকার যেমন প্লেটো, মেনসিয়াসও তেমনি ছিলেন কনফুসিয়াসের ভাষ্যকার।

কনফুসীয় নীতিবিদ্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরই সমসাময়িক কিন্তু অগ্রজ লাওৎজু (Lao-tzu) বা লাগুৎসির (Lao-tse) তাও-শিক্ষা। তাও কথাটির অর্থ পথ। কিন্তু কনফুসিয়াস সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন সমাজজীবনের সুস্থাতার পথ দেখিয়েছিলেন, আর লাওৎজু দেখিয়েছিলেন বুদ্ধিচর্চার পথ, ব্রহ্মবাদী নিষ্কাম কর্মযোগের পথ, যে পথ ধরলে মানুষ ধৈর্য, বিনয়, প্রজ্ঞা, প্রেম, করুণা, অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে। রাজার দেশ শাসনের ক্ষেত্রেও লাওৎজু হস্তক্ষেপ বিনা দেশ শাসন বা নিঃস্বার্থ প্রজাপালনের কথা বলেছিলেন, যা আসলে ছিল অবাস্তব। অবাস্তব এবং সহজবুদ্ধিগ্রাহ্য নয় বলেই তাও-শিক্ষা বা লাওৎজু-র শিষ্য চুয়াংৎসু (Chuang-tzu)-র ব্যাখ্যা, এবং তাওশিক্ষার দুটো বই তাও এবং তি, একত্রে তাও-তে চিং (Tao-Te-Ching) সাধারণের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

এই দুই ধর্মপথ ছাড়াও খ্রিস্ট্রিয় প্রথম শতকে তৃতীয় ধর্মপথের সন্ধান চীনারা পেয়েছিল—তা হল বৌদ্ধধর্ম। কথিত আছে, হানবংশীয় সম্রাট মিং তি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ভারত থেকে দুজন বৌদ্ধ শ্রমণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। এঁরা হলেন কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। মহাযান বৌদ্ধধর্মই চীনে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, যদিও হীনযান শাখারও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শ্রেণীনির্বিশেষে চীনা সমাজ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কারণ চীনা নৈতিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ জীবনদর্শনের সাদৃশ্য ছিল।

৫০.৭ জেন্ট্রি ও কৃষক ঃ সামাজিক দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন

নীতিনিষ্ঠ ধর্মপথের পথিক ঐতিহ্যগর্বিত চীনা সমাজে পরিবর্তন আসত খুবই ধীরে। সামাজিক টানাপোড়েন যেহেতু তেমন স্পষ্ট ছিল না, পরিবর্তনের লক্ষণও তাই ছিল অস্পষ্ট। একমাত্র খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পর থেকে সামাজিক স্তরগুলোর মধ্যে সম্পর্কজনিত উত্তেজনা দেখা দেয়, পরিবর্তনের লক্ষণও তাই তখন থেকেই কিছুটা স্পষ্ট হতে থাকে। এই সময়েই চীনা সমাজে দুটো শ্রেণী পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় আগের চাইতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রেণী দুটো হল উচ্চবিত্ত ভূ-কেন্দ্রিক ভদ্রলোক শ্রেণী বা জেন্ট্রি (Gentry) এবং কৃষকশ্রেণী।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে একদিকে যখন লোহার ব্যবহার ও খনিশিল্পের প্রসার সামন্তপ্রভুদের হাতে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খুলে দেয়, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় সমাজ ও উৎপাদন কাঠামোর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পেশাদার প্রশাসকশ্রেণীর। এই শ্রেণীটিই হল জেন্ট্রি, যাদের বিদ্বৎশ্রেণীও (Scholarliterati) বলা যায়। ধ্রুপদী চীনা শিক্ষাব্যবস্থার স্নাতক এই পণ্ডিত রাজকর্মচারীরা ক্ষমতা ও জমি এই দুই-এরই অধিকারী ছিলেন। ইউরোপের জেন্ট্রির সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল। ইউরোপের জেন্ট্রি অর্থনৈতিক ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করতেন, আর চীনা জেন্ট্রি রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে, প্রশাসনিক পদাধিকারে ভূম্যধিকার পেতেন। ঐতিহাসিক জাঁ শেনো বলেছেন, পণ্ডিত রাজকর্মচারীরা প্রকৃত অর্থেই ছিলেন চীনের শাসকশ্রেণীর। চৈনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, অনেকে তৎকালীন চীনা-রাষ্ট্রকে "Gentry State" আখ্যা দিয়েছেন। জেন্ট্রির ক্ষেত্রে ভূম্যধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার চমৎকার সমন্বয়কে অধ্যাপক যোসেফ নিওহাম "Bureaucratic Feudalism" বা 'আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র' বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

অন্যদিকে জেন্ট্রির প্রতিপত্তি যত বেড়েছিল, তত খারাপ হয়েছিল কৃষকের অবস্থা। বহু কৃষকের নিজস্ব জমি ছিল না। তারা ভাড়াটে চাষি হিসেবে বেশি কর দিয়ে জেন্ট্রির তত্ত্বাবধানে জমি চাষ করত। অর্থ ও ফসল—দুই উপায়েই জমিদারের পাওনা মেটাতে হত। তার ওপরে ছিল বেগার খাটা। চিং তিয়েন পদ্ধতি* অনুসারে যে কৃষকদের জমি দেওয়া হয়েছিল, তাদেরও জেন্ট্রি জমিদারদের কাছে সবসময়েই করজোড়ে থাকতে হত। চাষের সরঞ্জাম কেনার জন্য, বীজধানের জন্য, বাড়তি করের জন্য তাদের ঋণ নিতে হত। জেন্ট্রি জমিদাররাই ছিলেন মহাজন। তাঁরা স্থানীয় মোড়ল বা ম্যান্ডারিনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। ম্যান্ডারিন, পুলিশ ও আদালতের সাহায্যে কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন এই জেন্ট্রি সদস্যরা।

জেন্ট্রি ও কৃষক—এই দুই শ্রেণীর বিপরীত সম্পর্ক মাঝেমাঝেই সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি করত। ঘটত কৃষকবিদ্রোহ। তৎকালীন চীনা সমাজে কৃষকরাই ছিল একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী। কারিগর, দিনমজুর, মাঝি, কুলি, ফেরিওয়ালা—এদের সঙ্গে নিয়ে কৃষকরা গোপন সমিতি গড়ে তুলত এবং জেন্ট্রির অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিত। মাও-সে-তুং তাঁর চীন-বিপ্লব ও চীনা বিপ্লব ও চীনা

*এই পদ্ধতিতে নিজেদের জন্য জমি চাষ করা ছাড়াও সরকারি খাস জমিতে কৃষকদের শ্রম দিতে হত।

কমিউনিস্ট দল সম্পর্কিত বইয়ে নির্দিষ্টভাবে ১৭টি গ্রামবিদ্রোহের এবং ২০০০-এর বেশি বছর ধরে ব্যাপ্ত ছোট-বড় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোরে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "চীনে কৃষকবিদ্রোহ এবং কৃষকযুদ্ধের ব্যাপক ব্যাপ্তি পৃথিবীতে নজিরবিহীন এবং চীনা সামন্তসমাজে কৃষকই সত্যকার চালিকা শক্তি গঠন করেছে।"

কিন্তু তবুও দীর্ঘকাল, এমনকি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চীনা সমাজের বস্তুগত পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। কারণ এই কৃষকবিদ্রোহগুলো একজোট হয়ে শ্রেণিসংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। চীনা সামন্ততন্ত্রও তাই পরাজিত হয়নি।

৫০.৮ চীনের রাজবংশসমূহের কালানুক্রম

চীনা রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজবংশের স্থান ছিল খুবই উঁচুতে। সম্রাটের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা হত, তাকে বলা হত 'স্বর্গের বরপুত্র'। চীনদেশে প্রচলিত উপকথা অনুসারে প্রাচীনতম রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফু-সি (Fu-Hsi) শেন নুং (Shen Nung) এবং হুয়াং তি (Huang Ti)। এরা ছিলেন একাধারে রাজা ও ধর্মগুরু। চীনের প্রাচীনতম ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য সু-তিং (Shu Ching) এ চতুর্থ সম্রাট ইয়াও-এর যুগ থেকে প্রাচীন চীনের রাজাদের কথা বলা আছে। ইয়াং-এর পর সুন ও তারপর রাজা হন ই-উ (Yu)। খ্রিস্টপূর্ব ২১৭৬, মতান্তরে ২২০৫ অব্দে ই-উ সিয়া (Hsia) রাজবংশের পত্তন করেন। পরবর্তী রাজবংশ ছিল চেৎ ট্যাং প্রতিষ্ঠিত সান বা ইন (Shan/Yin)। খ্রিস্টপূর্ব ১১২২ অব্দে প্রতিষ্ঠিত চৌ (Chau) বংশ দীর্ঘ ৯০০ বছর চীন শাসন করে। এই সময়েই লাওৎজু ও কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। চৌ-এর পর ছিল প্রথম সার্বভৌম সম্রাট শি হুয়াং তি (Shi Huang Ti)-র চিন বংশ, যার নামানুসারেই ঐ দেশের নাম হয় চীন। চীনের মহাপ্রাচীর এই সম্রাটই নির্মাণ করিয়াছিলেন। চীন বংশের পর আসে হান বংশ (Han, খ্রিস্টপূর্ব ২০৬—খ্রি. ২২০)। এই সময় চীনের ইতিহাসের একটি স্বর্ণযুগ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ললিতকলা, সব ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি আসে। চান্দ্র পঞ্জিকার প্রবর্তন, ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্র, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, জীর্ণ বস্ত্র থেকে কাগজ তৈরি—এইসব এই সময়ের ঘটনা। এই কারণেই বোধহয় বহু চীনা নিজেদের "Sons of Han" বলতে ভালোবাসেন। হান বংশের পর আসে ট্যাং (Tang) বংশ (৬১৮-৯০৭), কিন্তু তারপর দীর্ঘ রাজনৈতিক, অনিশ্চয়তার কাল। অবশেষে ৯৬০-এ সুং (Sung) বংশের আমলে স্থিতি আসে বটে, কিন্তু ১২৭৯তে মোঙ্গালরা চীন দখল করে এবং মোঙ্গাল শাসন বজায় থাকে ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত। ১৩৫৮তে প্রতিষ্ঠিত হয় মিং (Ming) বংশের শাসন, কিন্তু ১৬৪৪-এ মাঞ্চুরিয়ার অরণ্য থেকে এসে মাঞ্চু-উপজাতি চীনে নতুন রাজবংশ স্থাপন করে। বেজিং-এ রাজধানী বসিয়ে এই মাঞ্চু বা চিং (Ching)-রাই ১৯১১-র বিপ্লবের আগে পর্যন্ত চীন শাসন করে।

দশজন মাঞ্চু-সম্রাটের মধ্যে কাং সি (Kang-hsi, ১৬৬২-১৭২২) ছিলেন সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর ভারতের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক কাং সি উদারচেতা শাসক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। কনফুসীয় নীতিধর্মে আস্থাবান হয়েও তিনি তাওবাদ বৌদ্ধধর্মকে, এমনকি পোর্তুগিজ পাদ্রীদের খ্রিস্টধর্মকেও যথেষ্ট সম্মান দেখান। কয়েকজন জেস্যুইট খ্রিস্টান পাদ্রীকে

তিনি সরকারি কাজেও নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য পাদ্রীদের পরবর্তী স্বার্থসন্ধানে বিরক্ত হয়ে ১৭১৭ সালে বিদেশিদের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

৫০.৯ চীনের মধ্যযুগের অবসান

চীনে মধ্যযুগের অবসান ঠিক কখন হয়, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পুরাতনপন্থী চৈনিক ঐতিহাসিকরা, যেমন শিয়াও-ই-শান, চিং-তাই-তুং-শি, মনে করেন, মিং যুগের অবসানের পর চিং যুগের শুরুতে মধ্যযুগের শেষ হয়। কেননা পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত এই সময়েই। কিন্তু ফেয়ারব্যাঙ্ক, ভিষাক, ইম্যানুয়েল সু প্রভৃতি ঐতিহাসিক অহিফেন যুদ্ধের (১৮৩৯) আগে পর্যন্ত চীনে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়নি বলে মনে করেন। কারণ এই যুদ্ধের পরই (১৮৩৯-৪২) চীনের বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত অবসান ঘটে। জাঁ শ্যেনো, ইস্রায়েল এপ্‌স্টেইন, জিয়ান বোজান, মারিয়ানে বাস্তিদ প্রভৃতি ঐতিহাসিকরাও অহিফেন যুদ্ধকেই মধ্যযুগ-আধুনিক যুগের বিভাজক-রেখা হিসেবে গণ্য করেছেন। কেননা, এর পরেই সামন্ততান্ত্রিক চীন আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক চীনে পরিণত হয়।

৫০.১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চীনে কীভাবে সামন্ততন্ত্র এসেছিল ?

২। প্রাক্-আধুনিক চীনের সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৩। পুরোনো চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির আলোচনা করুন।

৪। চীনের ধর্মচেতনার উৎস কী কী ?

৫। প্রাক্-আধুনিক চীনে সামাজিক পরিবর্তনের শর্ত উপস্থিত ছিল কি ? জেন্ট্রি ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল ?

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। পুরোনো চীনের শাং রাষ্ট্রে উত্তরাধিকার নীতি (রাজার) কী ছিল ?

২। সামন্ততান্ত্রিক চীনে ভূম্যধিকার-এর স্বরূপ কী ছিল ?

৩। চৈনিক সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল কোথায় ?

৪। কনফুসীয় নীতিশিক্ষার প্রধান গ্রন্থগুলির কী কী ?

৫। মধ্যযুগের চীনে শ্রেষ্ঠ মাঞ্চু সম্রাট কে ছিলেন ?

৬। চীনে মধ্যযুগের অবসান কখন হয় ?

বিষয়ানুগ প্রশ্ন ঃ

১। শাং রাষ্ট্রে যুদ্ধের হাতিয়ার কী ছিল ?

২। ‘তি’ কাকে বলা হত ?

৩। ‘চেন’ কারা ?

৪। চৌ রাষ্ট্রে কোন্ কোন্ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল ?

৫। মধ্যযুগের চীনে গ্রামের নামকরণ হত কীভাবে ?

৬। ‘মুই সাই’ প্রথা কী ?

৭। ‘সেরিকা’ কথাটির অর্থ কী ?

৮। কনফুসিয়াস কত সালে কোথায় জন্মেছিলেন ?

৯। লাওৎজু কে ছিলেন ?

১০। ‘Gentry State’ কোন্ রাষ্ট্রকে বলা হত ?

১১। ‘Bureaucratic Feudalism’ কথাটা কে বলেছিলেন ?

১২। মাও-সে-তুং পুরনো চীনে কতগুলো গ্রামবিদ্রোহের কথা বলেছেন ?

১৩। ‘স্বর্গের বরপুত্র’ কাকে বলা হত ?

১৪। ই-উ কোন্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

১৫। ‘চীন’ নামটি কোন্ রাজবংশের নাম থেকে এসেছিল ?

৫০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Franz Schurmann and Orville Schell (ed.) : China Readings, Vol. I., Imperial China.

২। Jo Needham : Science and Civilisation in China, Vol. I, 1954.

৩। Witold Rodzinski : The Walled Kingdom, 1984.

৪। J.Milton and W.B. Murphy : Tradition and Revolt—Imperial China, Islands of the Rising Sun, The Rise and Fall of Empires, 1980.

৫। Michael Loewe : Imperial China, 1966.

৬। থান উন শান ঃ আধুনিক চীন, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে, বিশ্বভারতী, বাং ১৩৫২।

একক ৫১ ❒ জাপানের ইতিহাস

গঠন

৫১.০ উদ্দেশ্য
৫১.১ প্রস্তাবনা
৫১.২ দেশ-পরিচয়
৫১.৩ জন-পরিচয়
৫১.৪ জাপানের ঐতিহ্য
৫১.৫ সভ্যতার উৎস
৫১.৬ জাপানের ধর্ম
৫১.৭ সামন্ততন্ত্রের প্রথম পর্যায়, কেন্দ্রীকরণ ও সামন্ততন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়, বিকেন্দ্রীকরণ
৫১.৮ সামুরাই প্রথার আবির্ভাব
৫১.৯ সামুরাইদের বৈশিষ্ট্য
৫১.১০ অনুশীলনী
৫১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৫১.০ প্রস্তাবনা

এই এককটি এশিয়া মহাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় দেওয়া জন্য লিখিত হয়েছে। এই একক থেকে আপনি—

- জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে,
- জাপানের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে,
- জাপানের পৌরাণিক পরিচয় প্রসঙ্গে ও সভ্যতার উৎস সম্বন্ধে,
- জাপানের ধর্ম সম্পর্কে এবং
- জাপানের সামন্ততন্ত্র ও সামুরাইপ্রথা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫১.১ প্রস্তাবনা

এশিয়া মহাদেশের এক আশ্চর্য দেশ এই জাপান। জলবেষ্টিত জাপান পারিপার্শ্বিক স্থলভূমির সুবিধা তেমন না পেলেও প্রাচীনকাল থেকেই একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান ইউরোপীয় স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারপরেও ইউরোপের

কাছে কখনোই নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয়নি। নিজের শক্তিতে বেড়ে ওঠা এই জাপানের ইতিহাস তাই আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। এই এককে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের পরিচয় দেওয়া হবে।

৫১.২ দেশ-পরিচয়

'নিপ্পন' বা 'সূর্যোদয়ের দেশ' জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্ত। জাপান আসলে অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। হোক্কাইডো, হনশু, শিকোকু এবং কিউশু—এই চারটি প্রধান দ্বীপ ও আরও প্রায় চার হাজারের মতো ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশটি গঠিত হয়েছে। জাপান চারদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। জাপান-সাগর এবং পূর্বচীন-সাগর জাপানকে এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বর্তমানে জাপানের আয়তন ১,৪৫,৮৩৪ বর্গমাইল। আয়তনের দিক দিয়ে জাপান অত্যন্ত ছোট একটি দেশ। ভারতবর্ষের আয়তনের আট ভাগের এক ভাগ। জাপানের ভূখণ্ড গোটা পৃথিবীর ভূখণ্ডের মাত্র ০.৩ শতাংশ।

৫১.৩ জন-পরিচয়

জাপানিদের পূর্বপুরুষ নির্ধারণে পণ্ডিতরা সবাই একমত নন। কেউ কেউ জাপানের আদিম অধিবাসী হিসেবে ইয়ামতোকে গণ্য করেন। আবার অনেকের ধারণা, খর্বকায় ও সর্বাঙ্গ-লোমাবৃত আয়নু জাতিই জাপানের আদি জনগোষ্ঠী। তবে এদের মুখের ছাঁচ ককেশীয়, দৈহিক গঠনও অন্যরকম। হোক্কাইডো দ্বীপে হয়তো ক্ষয়িষ্ণু এই আয়নু জাতির কয়েকজনের দেখা পাওয়া যেতে পারে। 'কোরো-পক গুরু' নামে জাপানের অন্য এক আদিম অধিবাসীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রকায় এই আদিবাসীদের সম্ভবত ইয়োজো-তে বসতি ছিল। এখন এরা প্রায় নিশ্চিহ্ন। আসলে কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে জাপানিদের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা মুশকিল। জাপানি মিশ্র জাতি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি এশীয় অঞ্চল থেকে এসে যে সব আগন্তুক জাপানে বসতি স্থাপন করে, তারাই জাপানিদের পূর্বপুরুষ হিসেবে পরিচিত। তারা অনেকে মঙ্গোলিয়া থেকেও এসেছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। আবার, এও বলা হয় যে, জাপানিরা খাস মঙ্গোলীয় নয়।

৫১.৪ জাপানের ঐতিহ্য

জাপানের সৃষ্টি সম্পর্কে পৌরাণিক বর্ণনাটি বেশ মজার। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে ভাসমান এক রক্তবর্ণ পিণ্ড থেকে নাকি উদ্গত হয়েছিলেন স্বয়ম্ভু দেবতা কুনি-তোকো—তাচি নো মিকোতো। এরপর আবির্ভূত হয়েছিলেন কুনি নো সাৎসুচি নো মিকোনো এবং তোয়োকুমু-নু মিকোতো। এই তিনজন মিলে জন্ম দিয়েছিলেন দেবাংশী দম্পতি ইজানাগি নো মিকোতো এবং ইজানামি নো মিকোতো-র। ইজানাগি ও ইজানামি জন্ম দিয়েছিলেন সূর্যদেবীর—আমাতেরাসু ওহো কামি। এই আমাতেরাসুর পৌত্র নিনিগি প্রথম জাপান দ্বীপপুঞ্জ শাসন করতে এসেছিলেন। তিনি কিউশুর অন্তর্গত

তাকাচিহো পর্বতে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। জাপানি কিংবদন্তি অনুসারে, এই নিনিগির প্রপৌত্র জিম্মু তেন্নো ছিলেন জাপানের প্রথম স্বীকৃত সম্রাট। ৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি জাপানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিয়োটোর দক্ষিণে ইয়াখটো প্রদেশে তাঁর রাজধানী ছিল। এই কথা জাপানোর দুটো অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ 'কোজিকি' ও 'নিহনশোকি'তে লিপিবন্ধ আছে। বইদুটো রচিত হয়েছিল যথাক্রমে ৭১২ ও ৭২০ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য স্যার জর্জ স্যানসম ও রিচার্ড স্টোরি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা বইদুটোকে ইতিহাসের প্রামাণ্য সূত্র হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন।

৫১.৫ সভ্যতার উৎস

ঐতিহাসিকরা জাপানি সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে চৈনিক সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দ থেকে চৈনিক সভ্যতা জাপানকে প্রভাবিত করতে থাকে। জর্জ স্যানসম, আর্নল্ড টয়েনবি প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, চীনের সভ্যতার স্পর্শই জাপানকে উচ্চতর সভ্যতার আস্বাদন দিয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে চীনা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে জাপান লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার, লিখন পদ্ধতি, চীনের দর্শন, বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসীয় মতবাদ—এইসব বিষয়ে জানতে পারে। পশ্চিমের ঐতিহাসিকরা এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন 'জাপানের চৈনিকীকরণ'। ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দের শেষপর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলেছিল। জাপানের চৈনিক পথের প্রধান স্থপতি ছিলেন সম্রাজ্ঞী সুইকোর আমলের প্রকৃত শাসক ইয়ামাটো সম্রাট শোটোকু (৫৯৩-৬২২)। বুদ্ধের নীতি ও কনফুসিয়াসের দর্শনের ভিত্তিতে তিনি ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন সংবিধান রচনা করেন। সতেরোটি ধারা সম্বলিত এই সংবিধান জাপানের প্রথম লিখিত আইন-বিধি। এর ওপর ভিত্তি করেই ৭০১ খ্রিস্টাব্দে জাপানের প্রথম আইনগুচ্ছ বা 'Code of Law' রচিত হয়।

৫১.৬ জাপানের ধর্ম

সাধারণভাবে জাপানিরা শিন্তো, বৌদ্ধ ও কনফুসীয় এই তিনটি ধর্মকে অনুসরণ করত বলে ভাবা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কনফুসীয় মতবাদকে কিন্তু ধর্মমত বলা যায় না। চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে কনফুসীয়বাদ প্রসারলাভ করেছিল। কিন্তু এটা ছিল কতকগুলো ব্যাবহারিক নীতির সমষ্টি। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা এর মধ্যে কমই ছিল। আসলে সঠিক অর্থে জাপানে দুটো ধর্মের প্রাধান্য ছিল—শিন্তো ও বৌদ্ধ।

শিন্তো ধর্মে জাপানের সম্রাট ও তার পূর্বপুরুষদের দেবতার সম্মান দেওয়া হয়েছিল। শিন্তো ধর্মের আদর্শ অনুসারেই প্রথম সম্রাট জিম্মুকে 'জিম্মু তেন্নো' বলা হত। 'তেন্নো' কথার অর্থ দৈন-ক্ষমতাসম্মপন্ন সম্রাট। শিন্তো ধর্মে বহুদেববাদ স্বীকৃত। এই ধর্মের রীতি মেনে জাপানিরা সূর্যদেবী, অগ্নিদেব, বৃষ্টির দেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা ও নানা অলৌকিক শক্তির পুজো করত। এই ধরনের পুজো জাপানে 'কামি-উপাসনা' নামে পরিচিত। 'কামি' শব্দের অর্থ দেবতা বা অলৌকিক শক্তি। তাই শিন্তো ধর্মের অন্য নাম 'কামিপথ'।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শিন্তো ধর্মের রক্ষণশীল প্রতিনিধিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম জাপানে কিছুদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। চীন ও কোরিয়া হয়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম এসেছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দে জাপ-সম্রাট শোটোকু নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পেয়েছিল। বৌদ্ধ মন্দিরগুলোকে সরকারি জমিও দেওয়া হয়েছিল।

দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গো বৌদ্ধধর্মের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বৌদ্ধ পুরোহিতরা শিল্পকলা, শিক্ষা, বাস্তুনির্মাণ, ওষুধ তৈরি প্রভৃতি কাজে দক্ষ হওয়ায় সম্রাট তাদের খুব খাতির করতেন। বৌদ্ধ পুরোহিতরা অনেকেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। দেশে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে সম্রাটের পরিবার ও অভিজাত মানুষরা বৌদ্ধ পুরোহিতদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন।

সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের বাস্তব সুবিধার আশায়। এইদিকে লক্ষ্য রেখে কিছু পুরোহিত পৃথক একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এই পুরোতিদের বলা হত উবাসোকু-জেন্‌জি বা উপাসক-সন্ন্যাসী। এরা সাধারণ মানুষদের ওঝা হিসেবে, চিকিৎসক হিসেবে এবং পুরোহিত-গুরু হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতেন। বৌদ্ধদর্শন নিয়ে এদের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। উবাসোকুদের বিচরণক্ষেত্র ছিল প্রধানত গ্রামাঞ্চল। পাহাড়ি এলাকায় এই একই কাজ যারা করতেন, তাদের বলা হত সুগেন্‌দা। গোঁড়া বৌদ্ধরা অবশ্য এদের পুরোহিত হিসেবে স্বীকার করতেন না। এই পুরোহিতরা আসলে প্রাক্‌-বৌদ্ধ জাপানের প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গো বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক বৌদ্ধ বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন সপ্তম-অষ্টম শতাব্দে।

৫১.৭ সামন্ততন্ত্রে প্রথম পর্যায়, কেন্দ্রীকরণ ও সামন্ততন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়, বিকেন্দ্রীকরণ

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের আগে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসকে দুটো পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল প্রদান সামন্তগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসনের যুগ। ১০৬৮ থেকে ১১৯২ পর্যন্ত ছিল স্থানীয় সামন্তশ্রেণী শাসিত বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রকাঠামোর যুগ। প্রথম পর্যায়ের নায়ক ছিলেন ফুজিয়ারা সামন্তগোষ্ঠীর নেতা কামাতারি। যে সোগো গোষ্ঠী ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাকে সরিয়ে তিনি জাপানে ফুজিয়ারা কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

ফুজিয়ারা প্রাধান্যের যুগে, অষ্টম শতাব্দের প্রথমদিকে বৌদ্ধপ্রধান নারা নগরে জাপানের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারা প্রথমে ছিল একটি ছোট গ্রাম। চীনের রাজধানী ছাংআন-এর আদলে এখানে নগরের পত্তন করা হয়েছিল। নারা থেকে ৭৮৪ সালে রাজধানী নিয়ে যাওয়া হয় বিওয়া হ্রদের কাছে নাগাওকাতে। পরে ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় হেইয়ান কিৎও বা মিইয়াকো বা বর্তমান কিয়োতো শহরে।

৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগ বলা

হয়। জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের যুগ হিসাবে চিহ্নিত। একাদশ শতকের প্রথম দিকে জনৈকা সভানারী (Court Lady) মুরাসাকি শিকিবু (Murasaki Shikibu) রচিত "জেঞ্জি মনোগাটারি (Genji Monogatari) গ্রন্থে হেইয়ান যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের রাজনীতিতে ফুজিয়ারা বংশের প্রাধান্যের যুগ আরম্ভ হয়। ফুজিয়ারা প্রাধান্যের ফলে জাপানি রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটেনি। রাজবংশজাত ব্যক্তিরাই সম্রাট পদে আসীন হতেন। কিন্তু এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর হাতে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ফুজিয়ারা বংশ সম্রাট বংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুবক সম্রাটকে ফুজিয়ারা বংশজাত কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হত। যে মুহূর্তে এই দম্পতির একটি পুত্র-সন্তান জন্মাত, সেই মুহূর্তে সম্রাটকে পদত্যাগ করতে হত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হত শিশুপুত্র। এই শিশুপুত্রের অভিভাবক এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত হতেন ফুজিয়ারা বংশের কোনো অগ্রগণ্য নেতা, এই ফুজিয়ারা নেতাই প্রকৃত শাসক হিসেবে জাপানের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। জাপান সম্রাটদের সিংহাসন ত্যাগের গড় বয়স ছিল মাত্র ৩১ বছর। এই সুযোগে এক ফুজিয়ারা নেতা শিশু সম্রাটের প্রতিনিধি (Regent) হিসেবে জাপানের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতেন। ফুজিয়ারা নেতারা কেবলমাত্র জাপান সম্রাটকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেই ক্ষান্ত হননি, জাপানের শাসনব্যবস্থার উন্নতির দিকেও তাদের কড়া দৃষ্টি ছিল। ফুজিয়ারা নেতারা রাজধানী চিয়োটোতে বসবাস করতেন। ফুজিয়ারা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় শাসন ফুজিয়ারা নেতা মিচিনাগার পর শিথিল হয়ে যায়। পরবর্তী ফুজিয়ারা নেতারা রাজধানীর বিলাসে গা ভাসিয়ে দেন। প্রাদেশিক শাসকেরাও বছরের অধিকাংশ সময়টা অতিবাহিত করতেন রাজধানী কিয়োটোর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক শাসনকার্যে এক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। প্রদেশগুলিকে অবহেলা প্রদর্শনের ফলশ্রুতি হিসেবে সেখানে নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন ঘটে। ক্রমশ কিয়োটোর বিলাসবহুল জীবনে আসক্ত ফুজিয়ারা বংশীয় নেতাদের হাত থেকে প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণের রাশ শিথিল হয়ে পড়ে। তখন থেকেই প্রাদেশিক শাসনভার ফুজিয়ারা বংশের বাইরে স্থানীয় নেতৃত্বের হাতে চলে যেতে থাকে। এই স্থানীয় নেতারা সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বহু নিষ্কর জমি দখল করে নেন। এই সমস্ত নিষ্কর জমির মালিকেরা পরবর্তীকালে ডাইম্যো (Daimyo) বা জমিদার নামে পরিচিত হন।

৫১.৮ সামুরাই প্রথার আবির্ভাব

এই নিষ্কর জমি দখলকালী জমিদার শ্রেণী দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন—টাইরা (Taira) এবং মিনামোটো (Minamoto)। জাপানের দক্ষিণাংশে এবং পশ্চিমাঞ্চলে টায়ারা গোষ্ঠী তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং উত্তরে ও পূর্ব জাপানে মিনামোটো গোষ্ঠী তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল, কিছুদিনের মধ্যেই এই দুই গোষ্ঠী ফুজিয়ারা প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ও কর্মচারীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আয়তন বাড়িয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তাদের

পক্ষে এই বাড়তি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল। তাই প্রাদেশিক কর্মচারীরা নিজেদের এলাকা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল সমরকৌশল অনুচর নিয়োগ করেন। এই সামরিক অনুচরেরা কিছুদিনের মধ্যেই এক-একজন শক্তিশালী সামন্ত নায়কের অধীনে এক-একটি যুদ্ধরাজ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন থেকেই বিভিন্ন প্রভাবশালী স্থানীয় নেতার অধীনে সামন্তসেনা (Feudal Army) গড়ে ওঠে। জাপানের ইতিহাসে এক নয়া পেশাদার যোদ্ধা শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যে শ্রেণী সামুরাই হিসেবে বেশি পরিচিত। দ্বাদশ শতকের জাপানের এই সামুরাই প্রথার বিস্তৃতির ফলে সম্পূর্ণ সামরিক সামন্ততান্ত্রিক এক ধরনের নয়া অভিজাততন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল।

সামুরাই প্রথার পটভূমি অবশ্য রচিত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এর প্রথম সূচনা হয়েছিল শোতোকু তাইশি-র (৫৭৪-৬২১) নিয়মাবলির প্রবর্তন এবং সেই সূত্রে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের তাইকা সংস্কারের সময়ে। তাইকা সংস্কারের সময়ে যে রিৎসু-র‍্যিও আইন রাজনৈতিক স্বার্থে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাই এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল।

রিৎসু-র‍্যিও আইন জমি ও দাসদের সরকারের অধীনে নিয়ে এসে তাদের জাতীয়করণ ঘটায়। সব জমিকেই প্রথমে সরকারের খাস সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর তা সাধারণ মানুষের মধ্যে খাজনার বিনিময়ে বণ্টিত হয়। খাজনা দিতে হত ধান-চাল, কোরা ও মিহি সিল্ক, লবণ ইত্যাদি পণ্যে বা শ্রমদানের মাধ্যমে।

রিৎসু-র‍্যিও আইন অনুসারে প্রত্যেক পুরুষকে দেওয়া হয়েছিল দুই 'তান্' বা 'দান' বা প্রায় ২৫ কাঠা জমি আর একজন মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল ১৭ কাঠা জমি। জমি বণ্টন করত সরকারি আমলারা। কালক্রমে এই আমলারাই কিন্তু অধিকাংশ জমির অধিপতি হয়ে ওঠে এবং কিছু স্থানীয় নেতাকে নিষ্কর জমি দখল করে ডাইম্যো হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। অন্যদিকে তারা কৃষকদের প্ররোচিত করে জঙ্গল হাসিল করে নতুন আবাদি জমি দখল করত। জাপানের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বেড়ে যায় এবং একদিকে গড়ে ওঠে একটা ভূম্যধিকারী সামন্তশ্রেণী ও গোষ্ঠী-প্রধানদের (উজি) সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে থাকে একটি জমি দখলকারী স্বনির্ভর কৃষকশ্রেণী।

এই স্বনির্ভর কৃষকশ্রেণী আবার তাদের দখল করা জমির নিরাপত্তার দায় অর্পণ করেছিল আমলা-সামন্তশ্রেণীর ওপর। বিনিময়ে তারা আমলাদের জমিতেও উৎপাদনের কাজে শ্রমদান করত আবার তাদের রক্ষীবাহিনীর কাজও করত। জাপানের অভিজাতদের সামাজিক দ্বন্দ্বে এই রক্ষীবাহিনীকে কাজে লাগানো হত। যখন লড়াই থাকত না, তখন এরা আবার কৃষিকাজেই ফিরে যেত। এভাবেই নবম শতাব্দ থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে জাপানে একটা পেশাদার যোদ্ধাবাহিনী গড়ে ওঠে। এরাই সামুরাই নামে পরিচিত হয়।

সুতরাং জাপানে সামুরাইদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সামরিক শক্তির সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। তিনটি ব্যাপারেরই ভিত্তি ছিল জমির অধিকার।

রাজধানী কিয়োটোর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে এই পেশাদার যোদ্ধা শ্রেণী এক-একটি সামন্ততান্ত্রিক

গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হত। এইভাবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেত। ইতিমধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং শেষপর্যন্ত এই অন্তর্দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। ফুজিয়ারা নেতারাও এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সামরিক গোষ্ঠীগুলির সাহায্য গ্রহণ করেন। তাছাড়া দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমর্থনে কিয়োটোতে যে ফুজিয়ারা-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয় সেই বিদ্রোহ দমন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সামরিক গোষ্ঠীগুলির সাহায্য নেয়। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যববহার করে দুই সামন্ততান্ত্রিক সামরিক গোষ্ঠী—টাইরা এবং মিনামোটো। এই গোষ্ঠী দুটি ফুজিয়ারা আধিপত্যের অবসান ঘটায়। তারপর প্রাধান্যের দাবিতে টাইরা এবং মিনামোটো গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। টাইরা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন কিয়োমোরি (Kiyomori)। কিয়োমোরির নেতৃত্বাধীন টাইরা গোষ্ঠী মিনামোটো গোষ্ঠীকে হারিয়ে দিয়ে কিয়োটোতে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে। জাপান সম্রাট টাইরা গোষ্ঠীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে আবার মিনামোটো গোষ্ঠীর হাতে শিমোনোমেকি প্রণালীর কাছে এক জলযুদ্ধে টাইরা গোষ্ঠী পরাস্ত হয়। মিনামোটো গোষ্ঠীর প্রধান জোরিটোমো (Yoritomo) তখন নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই যুদ্ধ জাপানের ইতিহাসে ডল-নো-ওরার যুদ্ধ নামে পরিচিত। রিচার্ড স্টোরি-র মতে, এই সময় থেকেই সামুরাই প্রথা জাপানে সংহত হতে থাকে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো সামুরাইদের শ্রেণী-চরিত্রদেরও পরিবর্তন ঘটেছিল।

৫১.৯ সামুরাইদের বৈশিষ্ট্য

প্রথমদিকে, সামুরাইরা ছিলেন একাধারে কৃষক ও যোদ্ধা। তাঁরা শান্তির সময় প্রভুর জমিতে চাষ-আবাদ করতেন এবং যুদ্ধের সময় প্রভুর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে জাপানে সমর-কৌশল ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। তখন থেকেই কৃষক-যোদ্ধা ব্যাপারটি আর থাকে না। কৃষকদের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হয়। সামুরাই শ্রেণী কেবলমাত্র পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ডাইম্যো-শাসিত অঞ্চলে প্রভুর এলাকা ও দুর্গ রক্ষা করার দায়িত্ব সামুরাইদের ওপর দেওয়া হয়। যেহেতু সবসময়ই তাঁদের প্রভুর কাছাকাছি থাকতে হত, তাই তাঁরা আর চাষবাসের কাজে যুক্ত থাকতে পারতেন না। প্রভুর এলাকা সুরক্ষিত করার প্রতিদান হিসেবে সামুরাইরা কখনও দ্রব্যের মাধ্যমে, কখনওবা অর্থের মাধ্যমে তাঁদের পারিশ্রমিক পেতেন। সামুরাই শ্রেণীর মধ্যে আবার অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস ছিল। এক-একটি স্তরযুক্ত সামুরাই এক-একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকতেন। উচ্চ পর্যায়ভুক্ত সামুরাই গ্রামীণ শাসনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতেন এবং আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন। আবার অন্যান্য স্তরভুক্ত সামুরাইরা সংবাদ সরবরাহ, দুর্গরক্ষা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন। প্রভুহীন সামরুরাইরা পরিচিত হতেন রোনিন নামে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে একজন সামুরাই-এর জীবনযাত্রা আলোচনা প্রসঙ্গো ইয়ামাগা সোকো (Yamaga Soko) বলেছেন, খাদ্য, পোশাক, জীবনযাত্রা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার—এই সমস্ত বিষয়েই তাঁকে উৎকৃষ্ট মানের শ্রেষ্ঠ সামুরাই ঐতিহ্য মেনে চলতে হত।

টোকুগাওয়া জাপানের সামুরাই শ্রেণী ছিল অত্যন্ত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান একটি শ্রেণী। কনফুসীয় নীতি অনুযায়ী উদারতা, আনুগত্য এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল প্রাক্-আধুনিক চীনা সমাজের ভিত্তি। জাপান চীনা সমাজের এই নীতি গ্রহণ করতে কুন্ঠিত হয়নি। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্র সামরিক শৌর্য এবং কনফুসীয় পাণ্ডিত্যের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিল। এই সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ছিল সামুরাই শ্রেণী। সামুরাই শ্রেণী সে যুগে একটি নীতি সংহতি মেনে চলতেন। এই নীতিসমষ্টি বুশিডো (Bushido) নামে পরিচিত ছিল। কনফুসীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে একজন শাসক এবং সৈন্যকে পরিচালিত করার নিয়মাবলি নিয়ে বুশিডো গড়ে উঠেছিল। বুশিডো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ল্যাটুরেট (Latourette) বলেছেন,—Honour was dearer than life, and in many sitations self-destruction was regarded not only as right and proper but as the only right course. Disgrace and defeat were atoned for by suicide.

তবে আঠারো-উনিশ শতক জাপানে ছিল 'তাই হেই' বা শান্তির যুগ। যুদ্ধবিগ্রহ না থাকায় সামুরাইরা তখন শাসনকাজেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলে বিস্‌লে (W.G. Beasley) মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীকালে তারা বেতনভোগী কর্মহীন শ্রেণীতে পরিণত হন।

৫১.১০ অনুশীলনী

বিষয়ানুগ প্রশ্ন ঃ

১। পুরোনো জাপানের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল?

২। Sinicisation of Japan ধারণাটির ব্যাখ্যা করুন।

৩। জাপানে ফজিয়ারা প্রাধান্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৪। ফুজিয়ারা শাসনের পরের দিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল কেন?

৫। কীভাবে জাপানে সামন্তসেনা গড়ে উঠেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। সামুরাই জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ইয়ামাগো সোগো কী বলেছেন?

২। পুরোনো জাপানের প্রথম সংবিধান কীভাবে রচিত হয়?

৩। পুরোনো জাপানের 'কেন্দ্রীয় শাসনের যুগ' কোন্‌টি?

৪। জাপানে বিকেন্দ্রীভূত সামন্তশাসন কখন সূচিত হয়?

৫। হেইয়ান যুগ কাকে বলে?

৬। ডাইম্যোরা ক'ভাগে বিভক্ত ছিল?

৭। জাপানের নয়া-অভিজাততন্ত্র কোন্‌টি?

৮। টাইরা-মিনামোটো গোষ্ঠী কীভাবে জাপানে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল?

৯। ডান-নো-উরার যুদ্ধে কী হয়েছিল ?

১০। সামুরাই কীভাবে পেশাদার যোদ্ধায় পরিণত হয় ?

১১। জাপানি ঐতিহ্যে জাপান দেশটির অভিধা কি ?

১২। কিংবদন্তি অনুসারে কোন্ দেবদেবী জাপানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

১৩। জাপানের প্রথম স্বীকৃত সম্রাটের নাম কী ?

১৪। জাপানের প্রাচীনতম বই দুটোর নাম কী কী ?

১৫। মুরাসাকি শিকিবু কে ছিলেন ?

১৬। ফুজিয়ারা আমলে কত বছর বয়সে সম্রাট সিংহাস ত্যাগ করতেন ?

১৭। ডাইম্যো কাদের বলা হত ?

১৮। সামুরাই শব্দটির অর্থ কী ?

১৯। বুশিজো কী ?

২০। তাই হেই যুগের অর্থ কী ?

৫১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। The Cambridge History of Japan.

২। K. Asakawa : The Early Institutional Life of Japan, 1963.

৩। R.K. Reischauei : Early Japanese History, Vol. H. 1960.

৪। Richard Story : A History of Modern Japan, 1963.

৫। Peter Duus : Feudalism in Japan, 1971.

৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি ঃ ইতিহাসের জাপান, কলকাতা, ১৯৯১।

একক ৫২ ❒ জাপানের ইতিহাস—২

গঠন

৫২.০ উদ্দেশ্য
৫২.১ প্রস্তাবনা
৫২.২ জাপানে সামন্ত-অর্থনীতির রূপান্তর
৫২.৩ জাপানের ভূম্যধিকারী ডাইম্যোদের কথা
৫২.৪ জাপানে শোগুন শাসনের প্রতিষ্ঠা
৫২.৫ টোকুগাওয়া শাসনতন্ত্র—কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা
৫২.৬ টোকুগাওয়া কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামো
৫২.৭ শোগুনযুগের অর্থনীতি
 ৫২.৭.১ কৃষি
 ৫২.৭.২ কুটিরশিল্প ও বাণিজ্য
 ৫২.৭.৩ শিল্প
৫২.৮ নয়া বাণিজ্যিক শ্রেণীর উত্থান ও জাপানের পুরোনো অর্থনীতির ভাঙনের লক্ষণ
৫২.৯ অনুশীলনী
৫২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫২.০ প্রস্তাবনা

জাপানের অর্থনৈতিক সংগঠনের রূপান্তর, নতুন নতুন শ্রেণীর উত্থান ও শেষপর্যন্ত উনিশ শতকে জাপানের পুরোনো অর্থনীতির ভাঙনের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়াই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন কীভাবে জাপানে রাজার ক্ষমতা খর্ব করে সেনাপ্রধান বা শোগুনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত শোগুন শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

৫২.১ প্রস্তাবনা

সামুরাইদের সাহায্যে ডাইম্যোরা জাপানের অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাদের আবার জাপানের সেনানায়ক বা শোগুনকে খুশি রেখে চলতে হত। কারণ দ্বাদশ শতকে সামন্তদ্বন্দ্বের পরিবেশে এই শোগুনই সম্রাটের হাত থেকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা কেড়ে নেন। শোগুন একটি কেন্দ্রীয়

শাসনের প্রবর্তন করেছিলেন। তবে টৌকুগাওয়া শোগুনের শাসনকালে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন জাপানে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সময়ে জাপানে যে নয়া বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, তারাই শেষ পর্যন্তজাপানের অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। জাপানের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলিরই একটি পরিচয় দেওয়া হবে বর্তমান এককে।

৫২.২ জাপানে সামন্ত-অর্থনীতির রূপান্তর

সামন্ত-প্রভুত্বের সংহতিলাভ—টৌকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের ভিত্তি-প্রস্তুতি।

জাপানের সামন্ততন্ত্র ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের সঙ্গো তুলনীয় ছিল না। প্রধানত জোরিটোমোর সামন্তযুদ্ধ জয়ের পর জাপানে বড় একটা ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। জোরিটোমো নিজেই তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ভূ-স্বত্ব দান করেছিলেন। যারা এই স্বত্ব পেয়েছিলেন, তারা হয়ে উঠেছিলেন তার ‘কে-নিন’ বা ‘বংশবদ ভূস্বামী’।

কিন্তু জাপানী ভূম্যধিকার (Shoen) আর ইউরোপীয় ম্যানরের মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাপানি ভূ ম্যধিকার অনেক সময়েই রাজন্যবর্গের খাসজমির মধ্যে উপ-অধিকার হিসেবে গণ্য হত। ফলে কখনো কখনো অধিকারের সীমা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হত। আবার সেই এলাকাতেই কৃষকদেরও ভূ-স্বত্ব থাকত। আসলে কৃষক, জমিদার সামন্ত গোষ্ঠীপতি ইত্যাদি অনেকের স্তরভিত্তিক অধিকার বা Shiki ছিল Shoen-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের পর পোর্তুগিজ মিশনারিরা জাপানে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের সূচনা করে। তাদের সঙ্গোই আসে খ্রিস্টধর্ম ও গোলাবারুদ। এর ফল ছিল দু'রকমের। এক, সম্ভাব্য বিদেশি আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য শহর ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হয়েছিল। দুই, আঞ্চলিক ভূস্বামীদের হাতে প্রচুর আগ্নেয় অস্ত্র আসার ফলে তাদের সাহস ও শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। নৈরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে ওঠে। ফলে স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। দ্বাদশ শতকীয় জাপানে যে নিষ্কর জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, তারাই ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন সামন্ত প্রভু (Fedal baron) বা স্বাধীন ডাইম্যো-তে পরিণত হয়।

৫২.৩ জাপানের ভূম্যধিকারী ডাইম্যোদের কথা

ডাইম্যোরা শুধুমাত্র যে জমিদার ছিলেন তা নয়। তাঁরা শাসকগোষ্ঠীকে শাসনকার্যেও সাহায্য করতেন, প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে। ডাইম্যোদের বাহুবলের উৎস ছিল সামুরাই বা যোদ্ধার বংশ। একজন ডাইম্যোদের গড়ে ভোগদখলীভূত জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল দশ হাজার বা তার বেশি কোকু (Koku) ধান্য-শস্য (এক কোকু = প্রায় পাঁচ বুশেল)। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮.৫ মিলিয়ন কোকু। ডাইম্যোদের মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিলেন বৃহৎ ডাইম্যো (Great Daimyo) যাদের মোট শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল দু লক্ষ কোকু অপেক্ষা তার কিছু বেশি। ডাইম্যোদের

মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি জমিতে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার কোকুর কম। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ডাইম্যোদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫। পরে এই সংখ্যা কমে যায়। অষ্টাদশ শতকে অনুগত ফিউডাই (Fudai) নামের ডাইম্যোদের সংখ্যা ছিল ১৪৫। ক্ষুব্ধ টোজোমা (Tozama) অভিহিত ডাইমিয়োদের সংখ্যা ছিল ৯৭। ১৪৫ জন ফিউডাই-এর জমিতে বাৎসরিক মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল ৬.৭ মিলিয়ন কোকু এবং ৯৭ এবং টোজমার জমিতে মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল ৯.৮ মিলিয়ন কোকু। ফিউডাই ও টোজমার মোট সংখ্যা পরে কিছু পরিবর্তিত হয়। টোকুগাওয়াদের পতনের আগে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৬ এবং ৮৬ মোট (২৬২)।

৫২.৪ জাপানে শোগুন শাসনের প্রতিষ্ঠা

জাপানের রাজনীতিতে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর মিনামোটো জোরিটোমো জাপান সম্রাটের কাছ থেকে শোগুন (Shogn) খেতাব অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। শোগুন কথার অর্থ প্রধান সেনানায়ক। ১১১২ খ্রিস্টাব্দে জাপানের ত্রয়োদশবর্ষীয় সম্রাট গো-টারা জোরিটোমোর অনুরোধে তাঁকে শোগুন খেতাবে ভূষিত করতে বাধ্য হন। ঐ বছরই জাপানের শাসনব্যবস্থায় শোগুনতন্ত্রের উত্থান ঘটে। জোরিটোমো ও তাঁর বংশধরেরা কামাকুরা থেকে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শোগুন হিসাবে দেশ শাসন করেন। তারপর হোজো বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের হাতে শাসনভার অর্পিত হয়। তবে হোজো বংশজাত শাসকেরা শোগুন উপাধি গ্রহণ না করে মিনামোটো বংশের শিক্কেন (Shikken) বা প্রতিনিধি (Regent) হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে মিনামোটো বংশজাত নেতা আশিকাগা তাকাউজি গো-ডাইগোকে সিংহানসচ্যুত করে জিম্যোয়িন (Jimyoin) বংশীয় কোমিও (Komiyo)-কে জাপানের সম্রাট পদে বসিয়ে দেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আশিকানা ও তার বংশধরেরা শোগুন হিসেবে দেশশাসন করেছিলেন। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাপানে যখন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং অশান্তি ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তখনই জাপানে তিনজন প্রতিভাবান নেতা—নোবুনাগা, হিদেযোশি এবং ইয়েযাসুর উত্থান ঘটে। একটি দক্ষ প্রশাসন ও শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে এই তিনজনই সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষার রেখেছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে একমাত্র ইয়েযাসুই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য লাভ করেছিলেন, কারণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত টৌকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের শাসন জাপানে ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল।

৫২.৫ টৌকুগাওয়া শাসনতন্ত্র—কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

টৌকুগাওয়া যুগে মিকাডো বা সম্রাট ছিলে নামেই সর্বোচ্চ শাসক। আসল শাসক ছিলেন শোগুন। প্রথম সারির সর্বোচ্চ ডাইম্যো হিসাবে শোগুন জাপানে জমিদারির প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিজের অধিকারে রেখে অবশিষ্ট অংশ অন্য ডাইম্যোদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। শোগুনের শক্তির ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক। ডাইম্যোদের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি অনুগত করে রাখার জন্য তিনি কতকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। (১) প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী ডাইম্যোদের তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত করা

হয়েছিল ; (২) শক্তিশালী এবং বিদ্রোহপ্রবণ ডাইম্যোদের জমি এমনভাবে বণ্টিত হত যাতে তাদের পরস্পরের জমিদারি সংলগ্ন না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হত ; (৩) শোগুনের নির্দেশে প্রত্যেক ডাইম্যোকে তার প্রধান কর্মকেন্দ্র এডোতে বৎসরের কিছুকাল অতিবাহিত করতে হত, তাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য ; ডাইম্যোদের কাছে শাসনকার্যে সাহায্য পাওয়া ছিল শোগুনের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডাইম্যোদের বছরের বেশ কিছুকাল স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা ; (৪) স্ব স্ব জমিদারিতে প্রত্যাবর্তনের আগে ডাইম্যোদের আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে এডোতে নিজ নিজ জামি বা প্রতিভূ রেখে আসতে হত ; কোনো ডাইম্যোদের আনুগত্যের অভাব দেখা দিলে শাস্তি পেতেন তাঁর প্রতিভূ ; ডাইম্যোদের স্ত্রী-পুত্রেরাই প্রতিভূ হিসাবে গৃহীত হতেন ; শোগুন প্রবর্তিত এই বিধানকে বলা হতো স্যান্‌কিন কোটাই (Sankin Kotai) বা বিকল্প উপস্থিতি (Alternative attendance); (৫) বিভেদ-নীতি অনুসরণ করে শোগুন ডাইম্যোদের মধ্যে বংশগত বিরোধ জিইয়ে রাখতেন ; ফলে বিদ্রোহপ্রবণ ডায়মিয়োগণ শোগুন-বিরোধী কার্যকলাপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েতেন এবং কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হত।

৫২.৬ টোকুগাওয়া কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামো

টোকুগাওয়া শোগুনের কেন্দ্রীয় শাসনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল দুটি আইনসভা, যথা কাউন্সিল অব এলডার্স (Council of Elders) এবং জুনিয়ার কাউন্সিল (Junior Council)। এই উভয় সভাই গঠিত ছিল শোগুন সমর্থক ফিউডাইদলভুক্ত ডাইমিয়োদের নিয়ে। কাউন্সিল অব এলডার্স [জাপানি নাম গোরোজু (Goroju)]-এর মোট সভ্যসংখ্যা ছিল বা পাঁচ। সভ্যরা শোগুনকে প্রশাসনিক উপদেশ দিতেন ; বড় ডাইম্যোদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন ; রাজকীয় অট্টালিকাগুলির তত্ত্বাবধান করতেন ; এককথায় শোগুনের পক্ষ থেকে দেশের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারক করতেন। জুনিয়র কাউন্সিলের [জাপানি নাম ওয়াকাডোশিযোরি (Wakadoshijori)] সর্বপ্রথমে সভ্যসংখ্যা ছিল ছয়। পরে এই সভ্যসংখ্যা ছয় থেকে চার-এর মধ্যে সীমিত হয়। সভ্যেরা আখ্যাত হতেন উপমন্ত্রীরূপে। এঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে ছিল ছোট ডাইম্যোদের নিয়ন্ত্রণ করা, শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারীগণের কাজকর্ম তদারক করা ইত্যাদি।

তখন প্রদেশ, জেলা, শহর এবং গ্রামেও যথাযোগ্য শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রদেশের শাসনভার অর্পিত ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর। বৃহৎ ডাইম্যোদের মধ্য থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হত। জেলার শাসনভার ন্যস্ত থাকতে জেলাশাসকের উপর। জেলাশাসক নিয়োগ করা হত ছোট ডাইম্যোদের মধ্য থেকে। প্রথম শ্রেণীর জেলাশাসক পরিচিত ছিলেন গুন্ডাই (Gundai) নামে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাশাসক অভিহিত হতেন ডায়কোয়ান নামে (Daikwan)। এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করত জেলার আয়তন এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের ওপর। জেলাশাসকের প্রধান কর্তব্য ছিল ভূ মিচাষদের তদারক করা, ভূমির ওপর কর নির্ধাতরণ করা এবং নির্ধারিত কর আদায় করা। কর নির্ধারণের সময় কৃষকের করভার বহনের ক্ষমতার ওপর ভিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রতিটি

জেলা গঠিত ছিল কতকগুলি গ্রাম নিয়ে। গ্রামে ছিল স্বায়ত্বশাসন। গ্রামের প্রধান হতেন ডাইমিয়োদের মনোনীত ব্যক্তি। গ্রাম শাসনের জন্য গ্রামের ডাইমিয়োরাই একটি গ্রাম-সভা নির্বাচন করতেন। এই গ্রাম-সভার মুখ্য দায়িত্ব ছিল স্থানীয় কর আদায় করা। শোগুনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তখন পাঁচটি শহর ছিল, যথা এডো, কিয়োটা, ওসাকা, সবকাই এবং নাগাসাকি। শোগুন যুগের শাসনব্যবস্থায় পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ দুটিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। পুলিশ এবং গুপ্তচর ছিল শোগুনের চোখ ও কানের মতো। ওমেটসুকে (প্রথম শ্রেণীর ইনস্‌পেক্টর) এবং মেটসুকে (দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনস্‌পেক্টর) পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ দুটি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সুতরাং মধ্যযুগীয় জাপানে ফিউডাল শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও কার্যত সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল শোগুনের হাতে। তাই ইয়েযাসু প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে 'কেন্দ্রীভূত ফিউডাল' শাসন (Centralized Feudalism) বলা চলে। শোগুন শাসনের সময়ে জাপানে ডাইম্যো সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হট্‌স্‌পার' (Hotspar) এবং 'গ্লেনডাওয়ার' (Glendower)-এর অভাব ছিল না। তাই শোগুন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিদ্রোহ প্রবণ ডাইম্যোদের বিরুদ্ধে দমননীতির আশ্রয় নিতেন। শোগুনের এই নীতি ছিল একাধারে দমননীতি ও ভারসাম্য নীতির নিপুণ সমন্বয় (A system of checks and balances)।

৫২.৭ শোগুনযুগের অর্থনীতি

৫২.৭.১ কৃষি

শোগুন যুগে জাপানের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। বমিক বা গিল্ডভুক্ত কারিগর ছিল বটে, কিন্তু ব্যবসা বা শ্রমশিল্পের পরিবর্তে কৃষিকেই তখন অগ্রাধিকার দেওয়া হত। ফলে তখন ব্যবসা বা শ্রমশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার সম্ভব হয়নি। উন্নতমানের সার ব্যবহারের ফলে কৃষিজাত শস্যাদির (তুলা, চাল, চা, তামাক, পাতা, মারবেরি ইত্যাদি) উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৬০০-১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

কৃষির উন্নতি হয় কিন্তু কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়নি। করভাবে জর্জরিত ঋণগ্রস্ত এবং নিপীড়িত কৃষকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে কৃষকের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। তার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। ফলে তার অবস্থা হয় অনেকাংশে মধ্যযুগের ইউরোপের সার্ফদের মতো। কৃষক নিজ গ্রাম ত্যাগ করে জীবিকার উপার্জনের অন্য অন্যত্র যাবার অনুমতি পেত না। ইচ্ছামতো সে যে-কোনো প্রকার ফসল উৎপন্ন করতে পারত না। খাদ্যে আঞ্চলিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে ডাইম্যো ঠিক করে দিতেন কখন কী ফসল চাষ করতে হবে।

৫২.৭.২ কুটিরশিল্প ও বাণিজ্য

চাষবাস ছাড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উদ্যোগ। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা তাদের অবসরকালীন ঋতুতে নানা ধরনের কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকতেন। ব্যবসায়ীরা তাদের থেকে শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করে বাণিজ্যের জন্য নিয়ে যেতেন। গ্রামীণ কারিগরেরা শিল্পী সংঘ

(Crafts guild)। গড়ে তুলেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পজাত পণ্য তৈরি থেকে তার বাণিজ্য পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করত গিল্ড। সাধারণত গিল্ডগুলি তাদের নিজস্ব আইনকানুন অনুসারে চলত এবং রাষ্ট্র তাদের কাজকর্মের হস্তক্ষেপ করত না। টোকুগাওয়া যুগের শুরুতে জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কুটিরশিল্পকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি স্থানীয় শিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপান নিজেকে বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন রখার ফলে বিদেশি বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি হয়। বিদেশি বাজার লুপ্ত হবার ফলে জাপানের শিল্প এই যুগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে জাপান এক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে আরম্ভ করে। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ জি. সি. অ্যালেন (G.C. Allen) এই আর্থিক সংকটকেই টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

৫২.৭.৩ শিল্প

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে এবং জাপানের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ে। তবে এই ভাঙন শুধুই নেতিবাচক ছিল না। নতুন অর্থনীতির বিকাশও এতে ত্বরান্বিত হয়েছিল। জাপানে কৃষির বাণিজ্যকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জাপানি বণিকদের উদ্যোগে। কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে জাপানি ব্যবসায়ীদের হাতে যে মুনাফা এসেছিল, তা তাঁর শিল্পে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করেন। ফলে শহরাঞ্চলে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকেরা দারিদ্র্যের চাপে গ্রাম ছেড়ে কাজ পাবার আশায় শহরাঞ্চলে যেতে আরম্ভ করে। এতদিন পর্যন্ত ধান জাপানের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। ধান ছিল বিনিময়ের একক (Unit of Exchange)। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে এই সময় জাপানে মুদ্রা-অর্থনীতির (Money Economy) প্রচলন ঘটে। অভিজাত শ্রেণী ও সম্পত্তিশালী শ্রেণীর লোকেরাই হস্ত শিল্পজাত পণ্য বেশি কিনতেন। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে জাপানের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রেশম ও সুতিবস্ত্র, আসবাবপত্র এবং ধাতব পদার্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। কারণ গোটা টোকুগাওয়া যুগেই জাপান বিদেশিদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

৫২.৮ নয়া বাণিজ্যিক শ্রেণীর উত্থান ও জাপানের পুরোনো অর্থনীতির ভাঙনের লক্ষণ

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এইভাবে জাপানে এক নয়া বাণিজ্যিক শ্রেণীর (Neo Commercial class) উত্থান ঘটে। ঐতিহাসিক ন্যাথানিয়েল পেফার (Nathaniel Peffer) এই শ্রেণীকে "ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সমার্থক" (Equivalent to European Bourgeoisie) বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে এই নয়া বণিকশ্রেণীর জাপানে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। এই সময়ে একদল বণিক শহরে অর্থনীতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এদের বলা হত

"চোনিন" (Chonin)। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 'চোনিন'রা উদ্যোগ নিয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন। এই বণিকেরা কৃষকদের থেকে ও গ্রামীণ শিল্পী ও শহুরে কারিগরদের কাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে, সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করতেন। স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের বণিকেরা কাঁচামাল সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতেন। তাছাড়া তারা নানাধরনের অর্থনৈতিক কাজ এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিনে এনে এক জায়গায় জমা করে রাখার জন্য তাঁরা বড় বড় গুদামঘর (Warehouse) তৈরি করেছিলেন। যেসব অঞ্চলে গুদামঘর তৈরি হয়েছিল, সেইসব অঞ্চল ক্রমে এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার বা গঞ্জে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া এই বণিকশ্রেণী অর্থনীতিতে সুপরিচিত নানা ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ; যথা—হুন্ডি দেওয়া, ঋণ দিয়ে উৎপাদকদের সাহায্য করা, প্রতিজ্ঞাসূচক মুদ্রা (Promissory Notes) বাজারে ছাড়া—প্রভৃতির সাথেও যুক্ত থাকতেন। এই নতুন বণিকশ্রেণীর কল্যাণেই ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়েডো, ওসাকা (Osaka) প্রভৃতি শহর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই দুটি শহরে সে সময়ে মিৎসুই সংস্থা (Mitsi House), কোনোইকে সংস্থা (Konoike House), সুমিটোমো সংস্থা (Sumitomo House) প্রভৃতি বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে ওঠে। প্রধানত বণিকশ্রেণী ও বাণিজ্যিক সংস্থার উত্থানই জাপানের আর্থসামাজিক পটভূমিকায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল এবং টোকুগাওয়া জাপানের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে চূড়ান্ত আঘাত করেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান যেমন সামন্ততন্ত্রের পতন সুনিশ্চিত করেছিল, তেমনই জাপানে এই নতুন বণিকশ্রেণী পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভেঙে ফেলে নয়া ব্যবস্থার পত্তন করেছিল।

৫২.৯ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন ঃ

১। জাপানে ডাইম্যোরদের আর্থিক উপার্জন কেমন ছিল ?

২। ইউরোপের ম্যানবের সঙ্গো জাপানের ভূম্যধিকারের পার্থক্য কী ছিল ?

৩। শোগুন কী কী উপায়ে ডাইম্যোরদের নিয়ন্ত্রণ করতেন ?

৪। টোকুগাওয়া শাসনে প্রদেশ থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত শাসনের ধরন কী ছিল ?

৫। টোকুগাওয়া আমলে কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল ?

৬। টোকুগাওয়া জাপানে শিল্পের প্রসার হয়েছিল কী ?

৭। নয়া-বাণিজ্যিক শ্রেণী জাপানের অর্থনীতিতে কী ভূমিকা পালন করেছিলে ?

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। Shoen ও Siki-এর মধ্যে পার্থক্য কী ?

২। ফিউডাই ও টোজোমা ডাইম্যোদের চারিত্রিক পার্থক্য কী ছিল ?

৩। জাপানে প্রথম শোগুনতন্ত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪। স্যান্‌কিন কোটাই কী?

৫। জাপানে পুলিশ ও গুপ্তচরদের কী বলা হত?

৬। জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে চলত?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন ঃ

১। কো-নিন কাদের বলা হত?

২। কামাকুরা কার রাজধানী ছিল?

৩। হোজো শাসকের উপাধি কী ছিল?

৪। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

৫। গোরোজু ও ওয়াকাডোনিয়ারি বলতে কী বোঝায়?

৬। গুন্ডাই ও ডায়কোয়ান—অর্থ কী?

৭। কোন্ কোন্ শহর জাপানে শোগুনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল?

৮। টোকুগাওয়া জাপানের প্রধান বাণিজ্য-শহর ও প্রধান বাণিজ্য-সংস্থা কোন্‌গুলি?

৫২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. B. Sansom : Japan, A Short Cultural History 1987.

২। John H. Hall : Government and Local Power in Japan, 1980.

৩। H. Paul Varley : Imperial Restoration in Medieval Japan.

৪। W. G. Beasley : The Modern History of Japan, 1963.

৫। E. O. Reischaner : Japan, the Story of a Nation, 1970.

৬। G. Elison and B. L. Smith (ed.) : Warlords, Artist and Commoners, 1981.

একক ৫৩ ❐ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

গঠন

৫৩.০ উদ্দেশ্য
৫৩.১ প্রস্তাবনা
৫৩.২ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক
৫৩.২.১ য়ুরোপের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক
৫৩.২.২ ত্রিমুখী বাণিজ্য
৫৩.৩ য়ুরোপের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
৫৩.৪ সারাংশ
৫৩.৫ অনুশীলনী
৫৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ষোলো শতকে পোর্তুগিজদের মাধ্যমে য়ুরোপের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্কের সূত্রপাত
- চীনে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্য এবং চীন থেকে রপ্তানি করা নানা জিনিসের বিবরণ
- চীন-য়ুরোপ বাণিজ্যসম্পর্কে ভারত, বিশেষত বাংলাদেশের অবস্থান
- আঠারো শতকে ভারত-চীন-য়ুরোপ এই ত্রিমুখী বাণিজ্যচক্রের গুরুত্ব এবং ব্রিটিশদের ভূমিকা
- বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে চীন-য়ুরোপ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা
- একদিকে চীনের সংস্কৃতিকে য়ুরোপমুখী করে তোলা আর অন্যদিকে পশ্চিম-বিরোধী চীনা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস
- চীন-য়ুরোপ সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সংঘাত-সম্মিলনের টানাপোড়েন।

৫৩.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককে আমরা আলোচনা করব, কীভাবে ষোলো শতকের প্রথমার্ধে পোর্তুগিজ বণিক আর চীন-য়ুরোপে বাণিজ্যসম্পর্কের সূচনা করেছিল। মেলাকা অধিকার করে এই পোতুর্গিজরা চীনের উত্তর-পূর্বে চলে আসে এবং তারপর ষোলো শতকের মধ্যভাগে চীনা সম্রাট তাদের ম্যাকাও দ্বীপে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। তখন থেকেই পুরোদমে চীন-য়ুরোপ বাণিজ্য চলতে থাকে। তবে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যপথও এইসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব হয়। তারপর শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ বণিকরাও এই বাণিজ্যে এগিয়ে আসে। শুরু হয় ভারত-চীন-যুরোপ—ত্রিমুখী বাণিজ্য। বাণিজ্যের মুনাফার লোভেই ইংরেজরা চীনে জোর করে আফিমের বিক্রি বাড়াতে চায় আর চীনের চায়ের ব্যবসার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

যুরোপের সঙ্গো চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূচনাও হয় এই বাণিজ্যের পথ ধরেই। যদিও বিদেশিদের চীনারা অবিশ্বাসের চোখে দেখত, তবুও একদিকে মিশনারিদের চেষ্টা আর অন্যদিকে কিছু চীনা পণ্ডিতের যুরোপীয় জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ—এই দুইয়ে মিলে চীনের পশ্চিমমুখী দরজা ক্রমশ খুলে যায়। শুরু হয় যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-এর চীনা ভাষায় অনুবাদ। আফিমের যুদ্ধ আর থাইফীং বিদ্রোহের পর যুরোপীওরাও চীনের সমাজ ও অর্থনীতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চীনে পশ্চিমী প্রযুক্তির আমদানি করতে থাকে। চীনের ঐতিহ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে একদল চীনা 'পশ্চিমীকরণ-বাদী' যুরোপীয় জ্ঞান-প্রযুক্তিকে স্বাগত জানান। এরই ফলে ক্রমশ চীন কীভাবে এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে, সেটাই বিস্তারিতভাবে এই এককে বর্ণনা করা হবে।

৫৩.২ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

৫৩.২.১ যুরোপের সঙ্গো চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক

যুরোপের সঙ্গো চীনের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সংযোগ পোর্তুগিজদের মাধ্যমেই প্রথম আরম্ভ হয়। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে চীনা সম্রাট পার্ল নদীর মোহানায় অবস্থিত ম্যাকাও (Macao) দ্বীপে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন। পোর্তুগিজদের মাধ্যমে গোয়া ও মেলাকা (মালাক্কা) থেকে চন্দন, হস্তিদন্ত, আবলুস কাঠ ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে রুপো চীনে আমদানি হতে থাকে ; চীন থেকে পোর্তুগিজরা চীনা রেশম সুতো, সার্টিন, তামা, পারদ, কর্পূর ও চীনামাটির পাত্রাদি রপ্তানি করে। রপ্তানিযোগ্য বস্তুর কিছু অংশ যুরোপ ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যেত কিন্তু অধিকাংশ ভাগ নাগাসাকিতে রুপো ও তামার সঙ্গো বিনিময় করে আবার চীন ও ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কে ফিরে আসত। ফিলিপিনের বাজারে যেত চীনের সুতি কাপড় এবং স্পেনীয় জাহাজে রেশম সুতো ও পোর্সেলিন পাত্রাদির সঙ্গো মশলা ও গোলমরিচ লাতিন আমেরিকা, স্পেন ও মেক্সিকো নিয়ে যাওয়া হত।

১৫১১ সালে পোর্তুগিজরা মেলাকা অধিকার করে। ১৫২০ সালে তারা চীনের দক্ষিণ-পূর্ব তটে আসে। কিন্তু এই অদৃষ্টপূর্ব সামুদ্রিক বিদেশিদের প্রতি সন্দিহান চীনা শাসকরা চীনে বাণিজ্য প্রতিবন্ধিত করলেন। কিন্তু বিদেশি রুপোর প্রয়োজন ও লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রলোভন সম্রাটকে বাধ্য করল বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে। ১৫৬৭ সাল থেকে চীনা নাগরিকদেরও এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হল। চীনের বাণিজ্যিক পোত দক্ষিণ চীন সাগরে আবার দৃষ্টিগোচর হল।

১৬শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের বাণিজ্য পোর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের কুক্ষিগত ছিল। শিল্প-বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের একীকরণের পর এবং ব্রিটিশ-শক্তির ভারতে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়োর সঙ্গো সঙ্গো তাদের বাণিজ্যপোত দক্ষিণ চীন সাগর অতিক্রম করে চীনের দিকে হস্ত প্রসারিত করল। চীনের তটবর্তী প্রদেশ চিয়াংসু (Jiangsu) ও চিচিয়াং (Zhijiang)-এর বণিকরা

প্রভূত পরিমাণ রেশম সুতো ও সুতির কাপড়, পারদ, কাঁচা তামা ও ঔষধিজাতীয় লতা-পাতা ক্যান্টনে (অধুনা কোয়ং চোউ) নিয়ে গিয়ে য়ুরোপীয়দের কাছে বিক্রি করত।

৫৩.২.২ ত্রিমুখী বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে য়ুরোপে চীনা পণ্যদ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চীন সাম্রাজ্য তখন ভারত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের মুখ্য কেন্দ্র। ঢাকা এবং কোলকাতা এই চীনমুখী বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। ভারতের দেশী বণিক সম্প্রদায় ও মূলধন বিনিয়োগকারীদের সহযোগে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কাপড় ও আফিম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্রি করে রুপো ও গোলমরিচ আহরণ করত, যা দিয়ে চীনে কেনা চা ও তুলোর মূল্য শোধ করা হত। এই বাংলা-চীন বাণিজ্যের ওপর ব্রিটিশরাই প্রভুত্ব করতেন, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় বণিকদের প্রাধান্য দেখা গেছে। দক্ষিণ চীন সমুদ্র অঞ্চলে চীন ও থাইদেশের বণিকরা চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে যে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল, য়ুরোপীয়রা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সেই স্থান অধিকার করতে পারেনি। তাছাড়া চীনা শিল্পপতি ও জাহাজ মালিকরা ওলন্দাজ ক্ষেত্রের সঙ্গে দ্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের উপর বরাবর আধিপত্য করেছে। কিন্তু ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার (বোনা) কাপড় ও আফিমের বাণিজ্যে অধিকার কায়েম করে চীনের চায়ের ব্যবসার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা ; তাঁদের এই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছিল।

৫৩.৩ য়ুরোপের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

ষোলো শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত চীন ও য়ুরোপীয় দেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয়েছিল তার পুরোধা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ইতালির ম্যাটিও রিক্কি (Matteo Ricci) এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। রিক্কি ও অন্যান্য ধর্মযাজক চীনে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত না হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে উৎসুক ছিলেন। প্রথম দুই শতাব্দীতে ৩৭০টি য়ুরোপীয় গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এই গ্রন্থসমূহে ১২০ বা তার অধিক সংখ্যক ছিল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয়। কিন্তু স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধসম্পন্ন চীনা বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা বহিরাগত জ্ঞান সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন। বিদেশিদের অভিপ্রায় নিয়ে চীনে সর্বদাই অবিশ্বাসের আবহাওয়া ছিল। আফিমের অনীতিকর বেচাকেনা চীনা শাসকদের ও জনতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিদেশিদের উপর প্রতিবন্ধ (ban) লাগু হল। আফিম যুদ্ধ ও থায়ফিং থিয়েনকুও (মহাসমতা-স্বর্গীয় রাজ্য) যুদ্ধের পর ১৮৬০-এর দশক থেকে য়ুরোপীয়রা চীনে বিভিন্ন প্রকারের কারখানা খুলতে লাগলেন এবং ক্রমাগত অর্থ-বিনিয়োগ করে চীনের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার আরম্ভ করলেন। এদিকে চীনেও এক প্রভাবশালী "পশ্চিমীকরণ গোষ্ঠী"র উদ্ভব হল। তাঁরা চীনকে সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের উপর জোর দিলেন। তাঁরা চাইতেন যে, পশ্চিমের বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে চীনকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দুই ক্ষেত্রেই শক্তিশালী করা হোক। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলির সহায়তা নিতে হবে। সম্রাটের আজ্ঞানুসারে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হল :

প্রথমত, চীনা সরকার বিদেশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করার জন্য অনুবাদ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা ও উদ্যোগ গোষ্ঠীর সাহায্যে পরিচালিত হত।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যদেশের মতো শক্তিশালী আর্থিকরূপে উন্নত হওয়ার জন্য মেশিন ও অন্যান্য যান্ত্রিক উপকরণ উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক পদার্থ-আদি সামরিক উপকরণের জন্য রাসায়নিক কারখানা নির্মিত হল। বিদেশী উদ্যোগপতি ও কতিপয় চীনা ধনপতিরা ভারী উদ্যোগের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। এবং এইরূপে ক্রমশ আধুনিক শিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

তৃতীয়ত, পশ্চিম ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। ভাষা জ্ঞান আহরণের দ্বার, তাই পেইচিং, সাংহাই, ক্যান্টন (কোয়ং চোউ) ইত্যাদি প্রধান শহরগুলিতে ইংরেজি, ফরাসি ও রুশি ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তাছাড়া বিদেশি অধ্যাপকদের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হল। চীনা শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের য়ুরোপ ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হল।

চতুর্থত, এ ছাড়া বিদেশের বিভিন্ন দেশে চীনা দূত পাঠিয়ে সেই দেশগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আহরণ করার কাজ আরম্ভ হল। বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর নিজের খরচায় বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আধিকারিক স্তরে দূত পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম দল য়ুরোপে এবং প্রায় একই সময়ে জাপানে পড়াশোনার জন্য যেতে শুরু করে। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানই চীনা বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের প্রধান শিক্ষা, অনুশীলন ও রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিদেশ থেকে এসে এই চীনা বিদ্বানদের দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োগ করা হয়।

বিদেশি শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খাং য়ু-ওয়েই ও লিয়াং ছি-ছাও। এই দুই বিদ্বান রাজনীতিক চীনকে আধুনিক জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৯৭ সালে স্বল্পকালের জন্য এ আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়েছিল, তারপর রক্ষণশীলদের চাপে এই আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। এই প্রাচীনপন্থীরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ কনফুসিয়াসের প্রভাবে লালিত-পালিত চীনের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক বলে মনে করতেন। তাই তাঁদের ধ্যানধারণায় পশ্চিমের এই সাংস্কৃতিক হানা চীনের সভ্যতার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ এবং এর প্রভাব চীনের সমাজকে দূষিত করবে ও চীনেদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটাবে।

৫৩.৪ সারাংশ

ষোলো শতকের প্রথমভাগে মেলাকা দখল করে পোর্তুগিজরা যখন চীনের উত্তর-পূর্বে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন থেকেই চীনের সঙ্গে য়ুরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ শুরু হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ-চীন-য়ুরোপ, এই ত্রিমুখী বাণিজ্যচক্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তখন থেকেই চীনা-বাণিজ্যে অধিকতর সক্রিয় হয় ব্রিটিশ বণিকগোষ্ঠী।

চীনে পশ্চিমীদেশের আগমন সেখানে পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাশীল পণ্ডিতদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দেশগুলির দৃষ্টি চীনের সম্পদের দিকে ছিল। চীনের বিশাল বাজারের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। তাই বহুপ্রকার অনৈতিক উপায়ে তাঁরা চীনের বাজারে আফিমে আফিমে ছয়লাপ করে দেন। চীন কর্তৃপক্ষ ঘোর আপত্তি করেন, কিন্তু বিদেশিরা তা উপেক্ষা করলে যুদ্ধ বেধে যায়। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশাদ এবং বিদেশিরা চীনকে পরাজিত করে সম্রাটকে নানাবিধ অসমচুক্তি (unequal treaty) করতে বাধ্য করেন ও তৎসঙ্গে উন্মুক্ত বন্দর ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে বাধ্য করে।

উপরোক্ত কারণে চীন ও পশ্চিমী শক্তির (মুখ্যত য়ুরোপীয়) মধ্যে যেমন সংঘাতের বাতাবরণ সম্পর্ককে দূষিত করতে থাকে, তেমনি উদ্‌বুদ্ধ চীনা বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য জ্ঞানের ও পাশ্চাত্য সামরিক বিদ্যার সাহায্যে দেশকে শক্তিশালী করতে উৎসুক ছিলেন। তাঁরা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক রূপে চীনকে সমৃদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন। এই পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে চীন বিংশ শতাব্দীর দেহলীতে উপস্থাপিত হল।

৫৩.৫ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) ষোলো ও সতেরো শতকে পোর্তুগিজরা কীভাবে চীনা বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।
(খ) ব্রিটিশ বণিকরা চীনা বাণিজ্যে আগ্রহী হয়েছিলেন কেন?
(গ) চীনের পশ্চিমীকরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?
(ঘ) চীনা সংস্কৃতি সম্পর্কে পশ্চিমী মনোভাব কেমন ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) কী ধরনের পণ্য চীনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত?
(খ) ত্রিমুখী বাণিজ্যচক্র কী?
(গ) চীনে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চীনা ভাষায় অনুবাদের আন্দোলন কীভাবে গড়ে ওঠে?
(ঘ) চীনা সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিশ্বাসীদের বক্তব্য কী ছিল?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) ফিলিপিনের বাজারে কোনো কোনো চীনা পণ্য যেত?
(খ) ম্যাকাও দ্বীক কোথায় অবস্থিত?
(গ) কোন্ কোন্ চীনা পণ্য য়ুরোপীয়রা পছন্দ করত?
(ঘ) বাংলাদেশের কোন্ দুটি অঞ্চল চীনা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
(ঙ) কোন্ বাণিজ্যে চীনা ও থাই বণিকদের প্রাধান্য য়ুরোপীয়রা খর্ব করতে পারেনি?
(চ) ষোলো ও সতেরো শতকে মোট কতগুলি য়ুরোপীয় ভাষার বই চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল?
(ছ) কোন্ কোন্ চীনা শহরে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল?
(জ) কত সালে চীনা ছাত্রের দল আমেরিকায় শিক্ষালাভের জন্য গিয়েছিল?
(ঝ) চীনা সংস্কৃতি-রক্ষার আন্দোলনে কারা প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত?
(ঞ) ১৮৯৭ সালের চীনা রক্ষণশীল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল?

৫৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Yan Chung : China and the Brave New World.
2. Michael Greenberg : British Trade and the Opening of China.

একক ৫৪ ❒ আফিম যুদ্ধ, তার পরবর্তী ঘটনা ও চীন-জাপান যুদ্ধ

গঠন

৫৪.০ উদ্দেশ্য
৫৪.১ প্রস্তাবনা
৫৪.২ আফিম যুদ্ধ
৫৪.২.১ আফিম যুদ্ধের পটভূমি
৫৪.২.২ যুদ্ধ
৫৪.২.৩ যুদ্ধের পরিণাণ—নানচিং সন্ধি
৫৪.২.৪ অন্যান্য দেশ—অসমান সন্ধি
৫৪.৩ থায়ফীং বিপ্লব
৫৪.৩.১ থায়ফীং বিপ্লবের সূচনা
৫৪.৩.২ বিদেশি হস্তক্ষেপ—দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ
৫৪.৪ চীন-জাপান যুদ্ধ
৫৪.৪.১ যুদ্ধের পটভূমি
৫৪.৪.২ শিমোনোসেকির সন্ধি
৫৪.৫ সারাংশ
৫৪.৬ অনুশীলনী
৫৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫৪.০ উদ্দেশ্য

চীন-য়ুরোপে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে য়ুরোপীয় বণিক শক্তি যেভাবে চীনের ওপর শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল তা বর্ণনা করাই এই এককটির উদ্দেশ্য। এখানে আলোচিত মূল বিষয়গুলো হল—

- বাণিজ্যের মুনাফা ঠিক রাখতে গিয়ে চীনে আফিমের বাজার সৃষ্টির জন্য য়ুরোপীয়দের গৃহীত ব্যবস্থা।

- অফিম-ব্যবসার বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহের চাপে চীনা সামন্তশাসকের আফিম-বিরোধী ব্যবস্থা
- এর ফলে য়ুরোপীয় আগ্রাসন ও আফিমের যুদ্ধ
- প্রথম আফিমের যুদ্ধের ফলে চীনা সমাজের দুর্দশাবৃদ্ধি
- চীনা কৃষকদের থায়ফীং বিদ্রোহ
- য়ুরোপীয় শক্তির দ্বিতীয় আগ্রাসন ও দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ
- দুই আফিমের যুদ্ধের ফলে চীনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তি
- ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ ও চীনের পরাজয়ের পর অপমানজনক চুক্তি।

৫৪.১ প্রস্তাবণা

আঠারো শতকে ব্রিটিশরা চীনের বাণিজ্যে যে প্রাধান্য বিস্তারের কাজে অগ্রসর হয়েছিল, উনিশ শতকে তারা সেই কাজে যথেষ্ট সফল হয়। কিন্তু চীন থেকে কেনা পণ্যের দাম তারা টাকা দিয়ে মেটাতে রাজি ছিল না। তাই তারা ভারতীয় আফিম চীনা বাজারে রপ্তানি করতে শুরু করে এবং চৈনিক সমাজকে জোর করে আফিম সেবনে বাধ্য করে। এর ফলে চীন থেকে রুপোর নির্গমন শুরু হয়, চীনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং চীনা কৃষকসমাজ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে চীনা সামন্তশাসক আফিম ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রসর হয়। স্বভাবতই এতে ব্রিটেন ও অন্যান্য য়ুরোপীয়রা ক্রুদ্ধ হয় এবং বেধে যায় আফিমের যুদ্ধ। যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর কতকগুলো অন্যায় শর্ত চীনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় সে দেশের অর্থনীতি আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয় চীনা সামন্তশাসক ও য়ুরোপীয় বণিকশক্তি-বিরোধী থায়ফীং কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটেন-ফ্রান্স আবার চীন আক্রমণ করে। দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধে চীনা শাসককে পরাজিত করে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তারা নৃশংসভাবে থায়ফীং বিদ্রোহ দমন করে।

ইতিমধ্যে জাপানও চীনা-ভূখণ্ডের সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোরিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসা। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তারা কোরিয়া আক্রমণ করে এবং শুরু হয় চীন-জাপান যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও চীন পরাজিত হয় এবং তার ওপর বিদেশি শোষণ আরও তীব্র হয়। ক্রমশ চীন একটি দরিদ্র, আধা-পরাধীন দেশে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা থেকে পরাধীনতার দিকে চীনের এই অধোগতির পরিচয় বর্তমান এককে দেওয়া হয়েছে। চীনে য়ুরোপীয়দের বাণিজ্যিক অভিযান কীভাবে ঔপনিবেশিক অত্যাচারে পরিণত হয়েছিল, তারই আভাস পায়ো যাবে এই এককটিতে।

৫৪.২ আফিম যুদ্ধ

৫৪.২.১ আফিম যুদ্ধের পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে নিজের শেকড় জমিয়ে ফেলেছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ ব্রিটেন শিল্পক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি করে। ভারত থেকে আহৃত পুঁজিদ্বারা তাদের দেশকে সমৃদ্ধ করে। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধিত করে ম্যানচেস্টার প্রভৃতি স্থানের বস্ত্রশিল্প হু হু করে বাড়তে থাকে। এই উদ্‌বৃত্ত বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্যের জন্য নতুন বাজারের প্রয়োজন ছিল ব্রিটেনের।

পক্ষান্তরে, চীন সর্বদাই আর্থিকরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ছিল। বহির্বাণিজ্যে চীনের ঐতিহ্য ছিল না। কিছু সময় ছাড়া চীনের সম্রাটরা বাণিজ্যকে আমল দিতেন না। বহির্বাণিজ্যে চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরাই নিযুক্ত ছিল, কারণ অনুর্বর হওয়ার জন্য এই অঞ্চল কৃষির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল, তাই জীবনধারণের জন্য বাধ্য হয়েই তারা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। মাঝে মাঝে সম্রাটরা বহির্বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিতেন। কিন্তু অর্থ ও রুপো ইত্যাদির অভাব এবং যুদ্ধজনিত রাজকোষের অর্থাভাব পূরণের জন্য বাণিজ্যের দ্বার আবার খুলে দিতে বাধ্য হতেন। যদিও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক (tax) আদায়ের জন্য বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রক (Superintendent of Port) নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য প্রসারের অনুকূল সংগঠন, ব্যাঙ্কের মতো আর্থিক সংস্থান ইত্যাদি আবশ্যিক শর্তের অভাবে বহির্বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসার পেছনে রাজ্যশক্তির আনুকূল্যের অভাব ও মূলধনের নিরাপত্তাহীনতা চীনের বণিকদের উৎসাহ স্তিমিত করেছিল। উপরন্তু, যদিও রাজশক্তির প্রেরণা তাদের পেছনে ছিল না, তথাপি সময়-অসময়ে সম্রাটেরা শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাতেন, এবং প্রায়শ এই শুল্ক মাত্রাতিরিক্ত হত। তাছাড়া কোনো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও ছিল না, তাই বাণিজ্যে লগ্নিকরণে অসুবিধা ছিল।

এদিক দিয়ে ব্রিটিশ বণিকরা ভাগ্যবান ছিলেন। তাদের বাণিজ্য সংগঠনের পেছনে রাজশক্তি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রবল সমর্থন ছিল। এই সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। তদুপরি শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেন ও য়ুরোপের দেশগুলি একে একে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়। এই বিকাশের ফলস্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারের সন্ধান প্রাচ্যে এসে অস্ত্রশক্তির জোরে উপনিবেশ স্থাপন করে। যদিও ইংরেজরা চীনকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে পারেনি কিন্তু এই বিশাল বাজারের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিষিদ্ধ ছিল। বহু শতাব্দী যাবৎ চীনের সিল্ক, চা-পাতা ও চীনামাটির বাসন য়ুরোপে রপ্তানি হত, যার ফলস্বরূপ প্রভূত পরিমাণ রুপো চীনে প্রবাহিত হত। ব্রিটেন ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ এই বাণিজ্যিক ব্যবধান (balance of trade) দূর করার জন্য চীনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রচুর পরিমাণ আফিম গোপনে সরবরাহ আরম্ভ করল। এই বিষ একদিকে যেমন মরণের রস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সর্বনাশ করছিল তেমনি অভূতপূর্ব পরিমাণ রুপো মূল্যস্বরূপ চীন থেকে নির্গত হতে শুরু করল। এইভাবে রাজকোষের অর্থাভাব

প্রকট হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনৈতিক বাণিজ্যের এইরূপে বর্ণনা করেছেন : "একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল ; এমনতর নিদারুণ ঠগী-বৃত্তি কখনো শোনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, "আমি অহিফেন খাইব না।" ইংরাজ বণিক কহিল "সে কি হয়?" চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল ; দিয়া কহিল "যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।" বহুদিন হইল ইংরাজরা চীনে এইরূপে অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন।" ("চীনে মরণের ব্যবসায়", ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ (১৮৮১, পৃঃ ৯৩-৪)।

৫৪.২.২ যুদ্ধ

এইরূপে অর্থনির্গমনের ফলে ১৮৩৪ পর্যন্ত চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল, দেশপ্রেণী শাসকবর্গ ও বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতা করলেন। বিরোধ চরমে উঠলে চীনের সম্রাট লীন ৎচশ্যু নামে এক দেশভক্ত উচ্চ আধিকারিকে ১৮৩৯ সালে ক্যান্টনে (অধুনা কোয়াংচোউ) কমিশনার রূপে এই বেআইনি বাণিজ্য রোধ করতে পাঠান। লীন বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত আফিম ধ্বংস করে ইংরেজদের সঙ্গো বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন, ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কর্মচারীকে চীন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অবশেষে ১৮৪০ সালে ইংরেজদের সঙ্গো চীনের যুদ্ধ বাধল—এ যুদ্ধ ছিল চীনকে উন্মুক্ত বাণিজ্যক্ষেত্র রূপে পরিণত করার যুদ্ধ অর্থাৎ চীনে অবাধভাবে আফিম সরবরাহ করার অধিকারলাভের যুদ্ধ।

৫৪.২.৩ যুদ্ধের পরিণাম—নানচিং সন্ধি

যুদ্ধের পরিণাম জানাই ছিল। সাধারণ জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদেশিদের এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, কিন্তু জনগণের এই অভ্যুত্থানে চীনের রাজশক্তি ত্রস্ত হয়ে উঠল। পতনোন্মুখ এই চীন সাম্রাজ্য (১৬৪৪-১৯১১) সাত তাড়াতাড়ি করে ব্রিটিশশক্তির কাছে মাথা নত করল। জনতার উৎসাহ দমিত হল ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের সঙ্গো "নানচিং (বা নানকিং) সন্ধি" স্বাক্ষরিত হল। চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা গর্ব করে চীনের ক্যান্টন ইত্যাদি পাঁচটি বন্দর ইংরেজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হল। হংকং ইংরেজরা লাভ করলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীনের নিকট থেকে আদায় করলেন। যদিও আফিম বেআইনি পণ্যের মধ্যে গণ্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশদের আফিম-বাণিজ্যতরী সকল যুদ্ধসজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত হত তাতে দুর্বল চীনা সৈন্য তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারত না। অতএব চীনের চোখের সামনে প্রকাশ্যভাবেই এই বিদেশিরা ব্যবসা চালাতে লাগল।

৫৪.২.৪ অন্যান্য দেশ : অসমান সন্ধি

ব্রিটেনের দেখাদেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স চীনকে তাদের সঙ্গো অনুরূপ অবাধ বাণিজ্য করার সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। এই সন্ধিগুলো "অসমান-সন্ধি" (Unequal Treaties) নামে পরিচিত। এতে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। বিদেশি পণ্যদ্রব্য অবাধ প্রবাহের জোরে চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিঘ্নিত হল, চীন অর্ধ-ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-সামন্ততন্ত্রের পথে অগ্রসর হল।

৫৪.৩ থায়ফীং বিপ্লব

৫৪.৩.১ থায়ফীং বিপ্লবের সূচনা

আফিম যুদ্ধের পর চীনের ছীন সরকারকে বিদেশিদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অত্যধিক অর্থ দিতে হল। এই অর্থ আহরণের জন্য সরকার নানাপ্রকার রাজস্ব ও ব্যবসায়িক শুল্ক আদায় করতে থাকেন। এই অর্থের ভার জনগণের উপরই পড়ছিল। উত্তরোত্তর গুরুভার শুল্কের ফলে জনতা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শোষণের অত্যাচারে জর্জরিত জনতা ও কৃষকরা ক্রমে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই গণোত্থান প্রবল বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, হুং শিউছোয়ান (Hong Xiuquan) (১৮১৪-১৮৬৪) নামে এক কৃষক নেতা। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কোয়াংশি প্রদেশকে কেন্দ্র করে তিনি থায়ফীং থিয়েনকুড (Taiping Heavenly Kingdom—মহাসমতা স্বর্গীয় রাজ্য) নামে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রবল সমর্থনে এই রাজ্য শীঘ্রই বিস্তারলাভ করল এবং ১৮৫৩ সালে দক্ষিণ চীনের প্রধান শহর নানচিং (Nanjing/Nanking)-এ রাজধানী স্থাপন করেন। চীনের ১৭টি প্রদেশের ৬০০-র বেশি শহরে এই রাজ্যের অধিকার ছিল। থায়ফীং কর্তৃপক্ষ ভূমিসংস্কার করে কৃষকদের মধ্যে ভূমির সমভাবে বন্টন (equal division) করে। নরনারীদের মধ্যে সমতার নীতি গৃহীত হয় ও প্রাচীন রক্ষণশীল কনফুসীয় আদর্শের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

৫৪.৩.২ বিদেশি হস্তক্ষেপ ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ

থায়ফীং সরকারের উপর্যুপরি আক্রমণে ছীং সাম্রাজ্য যখন পর্যুদস্ত, তাদের এই শোচনীয় অবস্থার সুযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮) শুরু করে ও টলটলায়মান ছীং সম্রাটের কাছ থেকে আরও অনেক সুবিধা ও মুক্তবন্দরের বিশেষ অধিকার আদায় করেন। এই সুযোগে রাশিয়া উত্তর-পূর্ব চীনের হেইলুংচিয়াং অঞ্চল অইধকার ও অন্যান্য বিশেষ অধিকার ছিনিয়ে নেন। থায়ফীং সরকারের অস্তিত্বকে এই শক্তিগুলো শুধু চীনসম্রাট নয় বিদেশি শক্তির পক্ষেও বিপজ্জনক বলে মনে করেন এবং এই বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ছীং সেনার সঙ্গো মিলিত হয়ে সমস্ত বিদেশী শক্তি উদীয়মান থায়ফীং রাজ্যকে ১৮৬৪ সালে কঠোরভাবে দমন করেন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর পুঁজিবাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হল। চীনের বাজারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পুঁজিবাদীদের মধ্যে হুটোপুটি শুরু হল।

৫৪.৪ চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)

৫৪.৪.১ যুদ্ধের পটভূমি

ইতিমধ্যে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানে মেইজ রাজতন্ত্রের “পুনঃপ্রতিষ্ঠার” (Meiji Restoration) পর জাপান শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিলাভ করে। একই সঙ্গো জাপান জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও

সামরিক শক্তির বিকাশের জন্য শক্তি নিয়োগ করে। ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপান সর্বদাই চীন ও কোরিয়ায় নিজের শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের প্রতি সচেষ্ট ছিল। এই উদ্দেশ্যে জাপান ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে চীনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোরিয়া আক্রমণ করে। জাপানের আক্রমণ এই প্রথম নয়। ১৮৭০ সাল থেকে তারা বারকয়েক কোরিয়া আক্রমণ দ্বারা তাদের কাছ থেকে বাণিজ্যের অধিকার ও কোরিয়ায় পাকাপাকিভাবে জাপানি সেনা নিয়োগ করার অধিকার অর্জন করে। কোরিয়া আংশিকরূপে জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

কোরিয়া আক্রমণের পেছনে মার্কিন উসকানি ছিল। ব্রিটেন ও রুশ দেশের মধ্যে পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বার্থের সংঘাত জন্মেছিল। তাই জাপানের মাধ্যমে ব্রিটেন এই ক্ষেত্রে রুশ-প্রভাব প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। জাপানের কোরিয়া আক্রমণের পেছনে ব্রিটেনের প্ররোচনা ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কোরিয়ার শাসকরা চীনের কাছে সেনা পাঠানোর আবেদন জানান। এই সুযোগে জাপান তার জলসেনা ও স্থলসেনা নিয়ে প্রবেশ করে এবং বিদ্রোহ দমনের পরও কোরিয়ায় তাদের সেনা মোতায়েন রাখে এবং একই বছরে জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে চীনের স্থল ও নৌসেনার উপর বারবার হিংস্র আক্রমণ চালায়। চীনের নৌসেনার জেনারেল ও এডমিরাল স্থানীয় অফিসাররা প্রাণপণ লড়াই করেন। কিন্তু জাপানের তুলনায় চীনারা নৌযুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। তদুপরি লী হুংচাং-এর মতো উচ্চপদাধিকারী সেনাপতি ও আধিকারিকরা বলপ্রয়োগ না করার নীতি (non-resistance) অনুসরণ করেন। ফলে চীনা সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। এদিকে জাপানি নৌসেনা চতুর্দিক থেকে চীনাদের উপর মুহুর্মুহু আক্রমণ দ্বারা পর্যুদস্ত করে এবং উত্তর-পূর্ব চীনের বন্দর তালিয়েন (দায়রেন) ও লুষুন অধিকার করেন। জাপানি সেনা ১৮৯৫ সালের গোড়ায় উত্তর চীনের ষানতুং প্রদেশের উপকূল অঞ্চলের চীনের নৌসেনাকে নিঃশেষ করে ফেলে। ত্রস্ত চীনা সম্রাট মার্চ মাসে লী হুংচাং-এর মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে এক অপমানজনক সন্ধি করেন, যার নাম "শিমোনোসেকি সন্ধি।"

৫৪.৪.২ শিমোনোসেকির সন্ধি

এই শিমেনোসেকির চুক্তি অনুসারে উপরোক্ত অধিকৃত অঞ্চল, থাইওয়ান (Taiwan) ইত্যাদি চীনের দেশাংশ জাপানের অধিকারে গেল, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২০ কোটি আউন্স (চীনা টায়েল) রুপো জাপান পেল এবং আরও পেল বাণিজ্য করার ও কারখানা খোলার অধিকার। এইরূপে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করার ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত থাকে।

একদা সমৃদ্ধ চীন বিদেশিদের তাঁবেদারে পরিণত হয়, আর্থিকরূপে ক্রমশ দরিদ্র দেশে পরিগণিত হয়, চীনের কৃষি ও শিল্প ধ্বংস হয়। বিদেশিদের কলকারখানাগুলির কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারে পরিণত হয়।

৫৪.৫ সারাংশ

চীন-য়ুরোপের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল সংঘাতময়। এর প্রথম পর্বে ছিল আফিমের যুদ্ধ, আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল থায়ফীং বিদ্রোহ দমন অভিযান।

'আফিমের যুদ্ধ'-র কারণ ছিল চীনে জোর করে আফিমের বাজার তৈরির য়ুরোপীয় প্রয়াস আগে থেকেই রুপোর অফুরন্ত সরবরাহ ছিল না বলে চীনা পণ্যের দাম দেওয়ার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনে আফিম রপ্তানির কথা ভেবেছিল।

১৭৮১ সালে সংঘবন্ধ প্রস্তুতির পর কোম্পানি ভারতীয় আফিমের প্রথম বড় চালান পাঠায় চীনে ; যা আগে সেখানে খুব একটা পরিচিত ছিল না। তারপর এই ব্যবসা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সহসা, আমদানিকৃত আফিমের বিনিময়ে চীনের রপ্তানিকৃত চা, সিল্ক এবং অন্যান্য পণ্য অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং দেশের ভিতরে আসার চেয়ে রুপো বাইরে চলে যেতে থাকে।

আফিমের শারীরিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৮০০ সালে সম্রাট চিয়াং চিং চীনে আফিম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ততদিনে বহু লোক অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবং বহু ব্যবসায়ী এবং রাজকর্মচারী এই ব্যবসায়ে অংশীদারিত্বের মুনাফার ফলে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে।

চীন থেকে রুপোর নির্গমনের ফলে দেশের ভেতরে দাম বেড়ে যায়। ফসলের দাম কমে যাওয়ায় বোঝা চাপে কৃষকদের ঘাড়ে এবং ভূস্বামী ও খাজনা আদায়কারীরা ফসলে আরো বেশি ভাগ বাড়ায় যাতে রুপোর হিসেবে তাদের আয় আগের মতোই বেশি থাকে। চীনের সামন্ত সমাজের বোঝার ওপর তা আরো চেপে বসে। স্বভাবতই কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। ১৮১০ সালে মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। ১৮১৩ সালে একদল বিদ্রোহী খোদ পেইচিংয়ের রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে।

আত্ম অস্তিত্বের স্বার্থে পেইচিং-এ ছিং (মাঞ্চু) শাসকদের ব্যবস্থা নিতে হয়। আফিম ব্যবসা নিষিদ্ধ করে কঠোর ডিক্রি জারি করার পর, তারা এই নিষিদ্ধকরণের দৃঢ় প্রবক্তা লিন জেস্যুকে কুয়াংচোউয়ের (ক্যান্টনের) বিশেষ কমিশনার নিয়োগ করে। জনগণের সমর্থন নিয়ে লিন শহরে অবস্থিত ব্রিটিশ এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানগুলো অবরোধ করেন। এভাবে তিনি তাদের হাতে জমা ২০,০০০ পেটির বেশি আফিম ফেরত দিতে বাধ্য করেন। ১৮৩৯ সালের ৩ জুন তিনি প্রকাশ্যে এ আফিম ধ্বংস করেন। এর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে প্রথম আফিম যুদ্ধ। যুদ্ধের পরিণতিতে চীনের ওপর অপমানজনক "অসম চুক্তিগুলির" প্রথমটি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এই চুক্তি চীনকে জাতীয় অবলুপ্তের কাছাকাছি নিয়ে যায়। নানচিং চুক্তি (১৮৪২) এবং এর সম্পূরক প্রটোকলে (১৮৪৩) বিধান ছিল : চীনা আইনের বিধান থেকে ইংরেজদের অব্যাহতি দান এবং "সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি"-র নীতি গ্রহণ যা অন্যান্য শক্তিগুলিও দাবি করে এবং সকল বিদেশিকে আদায় করার "সুযোগ" দেয়।

আফিম যুদ্ধ এবং নানচিং ও ওয়াংসিয়া চুক্তির সঙ্গে শুরু হয় চীনের অধীনতা এবং স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য চীনা জনগণের লড়াই। তখন থেকে, চীনা জনগণের দুটি শত্রু—শুধু বিদেশি আক্রমণকারীই নয়, সেই সঙ্গে ছিল দেশকে রক্ষায় অনিচ্ছুক ও অসমর্থ সামন্ত শাসকরা।

যুদ্ধের পরে, আফিম ব্যবসা বাড়তেই থাকে। ১৮৫০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২,০০০ পেটি। ১৮৫৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০,০০০ পেটিতে। কিন্তু এর চেয়েও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে ব্রিটিশ এবং মার্কিন সুতিপণ্যের আমদানি। বস্ত্রশিল্পের রপ্তানিকারক চীন পরিণত হয় ক্রেতায়। য়ুরোপীয় শিল্প-পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হয় য়ুরোপীয় বাণিজ্য পুঁজির শোষণ। চীনের অর্থনীতিতে এটা ছিল আরও বড় আঘাত। কেবল বাজারে সরাসরি প্রতিযোগিতার কারণ নয়, কার্যকর অর্থের জোগানও বন্ধ হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ তাঁতি ও অন্যান্য হস্তশিল্পীরা ধ্বংস হয়ে যায়।

ততদিনে বিদেশিদের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নতুন বন্দর খুলে দেওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেকারত্বও বাড়তে থাকে। দক্ষিণ চীনে হাজার হাজার মাঝি ও কুলির তেমন কোনও কাজ ছিল না। তাছাড়া ১৮৪০-এ শুরু হওয়া কুলি ব্যবসার ফলে মূলত ব্রিটিশ ও মার্কিন জাহাজে করে হাজার হাজার চীনাকে পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পশ্চিমা আগ্রাসনের কারণে চীনের সামন্ত সমাজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। শোষকের বিরুদ্ধে জনগণের বিরামহীন দেশাত্মবোধক লড়াই-এর সঙ্গে মিলে যায় রাজবংশের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ।

অপমানজনক নানচিং এবং ওয়াং সিয়া চুক্তির মাত্র সাত বছর পরে অভূতপূর্ব থায়ফীং বিদ্রোহ চীনকে গ্রাস করে। এই বিদ্রোহ ছিল পুরনো ঢংয়ের কৃষক বিদ্রোহের সর্বশেষ ঘটনা এবং আধুনিক কালে চীনা জনগণের প্রথম মহান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ভিয়েতনাম সীমান্তের কাছে কুয়াংসি প্রদেশে। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, অত্যাচারিত এবং অপমানিত হানরাই শুধু এতে যোগ দেয়নি, সামন্ত প্রভুদের হাতে বর্বর বৈষম্যের, নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তার লোকেরাও যোগ দিয়েছিল। দ্রুত শক্তিসংগ্রহ করে এরা আগুনের তরবারির মতো বিরাট দেশকে আঘাত করে ; উত্তরে পেইচিং, পূর্বে শাংহাই এবং পশ্চিমে তিব্বত পর্বতমালারা দিকে এগিয়ে যায়। পূর্বের যে কোনও বিদ্রোহের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ওরা জনগণের বিপ্লবী রাষ্ট্র থায়ফীং স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ্য ১৫ বছর স্থায়ী হয় (১৮৫০-৬৫), নানচিং-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে।

থায়ফীং বিদ্রোহের মুখে চীনা সামন্ত শাসকের অসাহয়তায় বিরক্ত ব্রিটেন নিজেই সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৬ সালে ব্রিটেন প্রথম চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে যোগ দেয় ফ্রান্স। এইভাবে শুরু হয় দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮)। ১৮৫৭-৫৮ সালে কুয়াংচৌউতে বোমাবর্ষণ করা হয়। পেইচিং থেকে মাত্র ৮০ মাইল দূরে থিয়ানচিন-এ ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী অবতরণ করার পর চীনা রাজতন্ত্র নতিস্বীকার করে এবং থিয়ানচিন চুক্তির মাধ্যমে অনেক অপমানজনক শর্ত মেনে নেয়। অবশেষে চীনা রাজতন্ত্রকে সামনে রেখে ১৮৬৪ সালে বিদেশি শক্তিগোষ্ঠী নিষ্ঠুরভাবে থায়ফীং বিদ্রোহ দমন করে।

ইতিমধ্যে চীন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে তারই প্রতিবেশী অপর এশীয় দেশ জাপান। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান অর্থনৈতিকভাবে ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কোরিয়ার মধ্য দিয়ে চীনের দিকে এগিয়ে আসতে চায়। এ কাজে তাকে উৎসাহ দেয় আমেরিকা।

১৮৯৪ সালে কোরিয়ার কৃষক বিদ্রোহের সুযোগে জাপান দেশ আক্রমণ করে এবং চীনা সেনারা বাধা দিলেই শুরু হয়ে যায় চীন-জাপান যুদ্ধ। যুদ্ধে চীন হেরে যায়।

১৮৯৫-এর মার্চে স্বাক্ষরিত শিমোমোসেকি চুক্তি অনুসারে ছিং রাজবংশ জাপানের কাছে থাইওয়ান এবং পেংহু দ্বীপগুলি অর্পণ করে। কোরীয় প্রশ্নে চীন সকল এক্তিয়ার প্রত্যাহার করে ; বিদেশি বাণিজ্যের জন্য সাতটি বন্দর খুলে দয়ে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অঙ্গীকার করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে চীনের মাটিতে কারখানা স্থাপনের অধিকার লাভ করে জাপান।

লুণ্ঠনের এই কাজে জাপানের প্রতি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন ছিল। জাপানের নৌবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে ব্রিটেন। প্রাথমিক পর্যায়ে অপমানজনক শিমোনোসেকি চুক্তির ব্যবস্থা করেন জনৈক প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব।

৫৪.৬ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) প্রথম আফিম যুদ্ধের প্রধান কারণ কী ছিল ? চীনের উপর এর প্রভাব কী ছিল ?

(খ) থায়ফীং বিদ্রোহের কারণ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জাপান কোরিয়া আক্রমণ করেছিল কেন ? চীন-জাপান যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছিল ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে চীন সম্রাটদের সাধারণ নীতি কী ছিল ?

(খ) বাণিজ্যিক ব্যবধান দূর করার জন্য ব্রিটিশ বণিকরা কী করেছিল ?

(গ) নানচিং সন্ধির শর্তাবলি কী কী ?

(ঘ) কেন দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ?

(ঙ) শিমোনোসেকির সন্ধি চীনের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক ছিল ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) রবীন্দ্রনাথ চীনের কোন্ বাণিজ্যকে 'অপূর্ব বাণিজ্য' অ্যাখ্যা দিয়েছেন ?

(খ) ক্যান্টন বাণিজ্যের চীনা অধিকারিকের নাম কী ছিল ?

(গ) নানচিং সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয় ?

(ঘ) 'অসমান সন্ধি' বলতে কী বোঝায় ?

(ঙ) থায়ফীং বিদ্রোহের নেতা কে ?

(চ) কোন্ শহরে থায়পিং বিদ্রোহীরা রাজধানী স্থাপন করেছিল ?

(ছ) থায়পিং বিদ্রোহের সময় রাশিয়া কোন্ অঞ্চল দখল করে নেয় ?

(জ) কোন্ সময় থেকে জাপান কোরিয়া আক্রমণ শুরু করে ?

(ঝ) কোরিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ কখন হয়েছিল ?

(ঞ) চীন-জাপান যুদ্ধের পর চীন জাপানকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল ?

৫৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. The Cambridge History of China, প্রাসঙ্গিক খণ্ড।
2. Jr. Slack, and R. Edward : Opium, State and Society—China.

একক ৫৫ ❒ জাপান, কমোডর পেরির আগমন ও সগুনের পতন

গঠন

৫৫.০ উদ্দেশ্য
৫৫.১ প্রস্তাবনা
৫৫.২ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের যুগ
৫৫.২.১ পূর্বাবস্থা—তকুগাওয়া শাসনের দুর্বলতা
৫৫.২.২ সাধারণ মানুষের সম্রাটকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ়সংকল্প
৫৫.২.৩ বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতির জাপান অভিযানের প্রচেষ্টা
৫৫.২.৪ নৌ-অধ্যক্ষ পেরির জাপানে আগমন
৫৫.২.৫ আমেরিকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য
৫৫.২.৬ নৌ-বিপন্ন আমেরিকান নাবিকের প্রতি জাপানের দুর্ব্যবহার
৫৫.২.৭ আমেরিকার জাপানের প্রতি ভীতি প্রদর্শন
৫৫.২.৮ পেরির জাপান অভিযান (১৮৫৩)
৫৫.২.৯ পেরির মাধ্যমে জাপানের সঙ্গে চুক্তি
৫৫.২.১০ অন্যান্য দেশের সঙ্গে জাপানের চুক্তি
৫৫.২.১১ আমেরিকার বিশেষ সুবিধালাভ
৫৫.২.১২ জাপানের জাতীয় মানসে চুক্তিগুলির প্রতিক্রিয়া
৫৫.২.১৩ বিশ্বের দরবারে জাপানের প্রবেশ
৫৫.৩ জাপানের চিন্তা ও চেতনা
৫৫.৩.১ বৈদেশিক অনুপ্রবেশে জাপানে বিভিন্ন চিন্তা ও চেতনার দ্বন্দ্ব
৫৫.৩.২ বৈদেশিক অনুপ্রবেশেকে ঘিরে তিনটি দল
৫৫.৩.৩ দলীয় মতভেদ ও দ্বন্দ্বে সগুন শাসনের অতিষ্ঠ ব্যবস্থা
৫৫.৩.৪ সগুন শাসনের অবসান
৫৫.৩.৫ সাৎসুমার পর চো-শুর সামন্তের বিদ্রোহ
৫৫.৩.৬ সগুনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিদেশির ভ্রান্তি
৫৫.৩.৭ সগুনের মৃত্যু—নতুন সগুনের শাসনক্ষমতা প্রত্যর্পণ
৫৫.৪ সারাংশ
৫৫.৫ অনুশীলনী
৫৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন—

- জাপানে তকুগাওয়া শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা কী কী ছিল
- জাপানি সামন্তশ্রেণীর একাংশ ও সাধারণ মানুষ কেন সম্রাটকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল
- এক্ষেত্রে সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশি শক্তির ভূমিকা কী ছিল
- আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল
- জাপানের সাধারণ মানুষের মনে বিদেশি হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল
- এই সংকটে জাপানের সামন্তদলগুলির মতান্তর কীভাবে বেড়ে গিয়েছিল
- শেষপর্যন্ত কীভাবে সগুনের পতন ঘটেছিল এবং জাপানের সম্রাট ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

৫৫.১ প্রস্তাবণা

আগের একক দুটিতে চীনের সঙ্গো য়ুরোপীয় শক্তির সংঘাত-প্রভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি। চীনের মতোই তার প্রতিবেশী দেশ জাপানও প্রথম পোর্তুগিজদের সংস্পর্শে এসেছিল ষোলো শতকে। ১৬০০ সালে ওলন্দাজরা আর ১৬১৩ সালে ইংরেজ বণিকরা জাপানে বাণিজ্যের অনুমতি পেয়েছিল। তবে এরপরে জাপানে সগুন শাসনে প্রাচীনপন্থীরা ক্ষমতাসীন হওয়ায় বিদেশিদের প্রতি জাপান কড়া মনোভাব নেয়। বস্তুত য়ুরোপের সঙ্গো জাপান নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। এই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে দীর্ঘসময় পরে, সম্রাটের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা 'মেইজি রেস্টোরেশন' এর পরে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জাপানের নানা অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতেও বিদেশিদের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায়। এই সময়ে সগুন শাসনের অবসান ঘটে। বর্তমান এককে জাপানের এই বিচ্ছিন্নতার অবসান ও সগুন শাসনের অবসানের বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৫৫.২ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের যুগ (১৮৫৩-১৮৯৪)

৫৫.২.১ পূর্বাবস্থা—তকুগাওয়া শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা

তকুগাওয়া-সগুন শাসনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বহু ত্রুটি ও অসুবিধার কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই শাসনব্যবস্থা ছিল জাপানের জাতীয় জীবনের পরিপন্থী এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার পক্ষে খুবই দুর্বল। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় কারণেই এই শাসনব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং আভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে দূর করতে এই শাসনব্যবস্থা ছিল অসহায় ও অপরাগ।

কালক্রমে তকুগাওয়ার বংশধরগণ খুবই দুর্বল এবং তাঁদের উপদেষ্টাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁরা তাঁদের আমাত্যদের ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত হতে থাকেন। তাঁদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষগণও প্রকাশ্য বিদ্রোহই করতে আরম্ভ করেন। ইয়েদো (Yedo) থেকে দূরবর্তী প্রতাপশালী জায়গিরদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের সাৎসুমা (Satsuma), এবং চো-শুর (Choshu) জায়গিরদারগণ সগুনের কর্মচারীদের কোনো তোয়াক্কা-ই করতেন না। সগুন-শাসনের অবসানের জন্য তাঁরা প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহই করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বর্তমান থাকায় অভিজাত সামুরাই এবং সেনাপতিশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আলস্য, বিলাসিতা এবং পারস্পরিক ঈর্ষার ভাব প্রবল আকার ধারণ করে। সেইজন্য চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষ এবং অপর সাধারণ রাজভক্ত মানুষ এই শাসনব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নতুন এক শক্তিশালী শাসনের পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়।

৫৫.২.২ সাধারণ মানুষের সম্রাটকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ়সংকল্প

এতদিন যাবৎ শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে এবং মধ্যবর্তী সগুন-শক্তিকে বিলীন করে জাপানের নব অভ্যুত্থানের চিন্তা ও ভাবনা নিবদ্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও জাপানের ঐতিহ্যময় রাজশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। ক্রমে সকলেই বুঝতে পারল যে, জাপানের রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে মধ্যবর্তী সগুনদের অপশাসন অবান্তর এবং দেশের উন্নতি এবং সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। অনেকেই সগুন-শাসনকে অবৈধ শাসন বলেও ঘোষণা করতে লাগল। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আলস্যপরায়ণ বিলাসী সামুরাই ও সগুনদের মোটেও সমর্থন করলেন না। সগুন-শাসনের আর একটি দুর্বলতা ছিল এই যে তারা বিদেশি ধর্মযাজক এবং ব্যবসায়ীদের সহ্য করতে পারতেন না। বহির্জগতের সঙ্গো বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত আদানপ্রদানের ফলে জাপান যে আরও সমৃদ্ধতর হতে পারে—এই ধারণা সগুন-শাসকদের ছিল না। তাই তাঁরা জাপানকে বৈদেশিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কিন্তু জাপানের কিছু সংখ্যক দূরদর্শী শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য ও শিক্ষার জন্য জাপানের দ্বার উন্মুক্ত রাখাই জাপানের পক্ষে কল্যাণকর। উপরন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে নানাপ্রকার বাণিজ্যিক ও সামরিক রণতরী এসে জাপানে প্রবেশ লাভের জন্য প্রচেষ্টা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শনও করতে লাগল। দুর্বল সগুন সরকার এই ব্যাপারে জাপানের জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারছিল না।

রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সগুন-শাসনের অবসান এবং বিদেশের সঙ্গো উদার আদানপ্রদানের নীতি প্রচলনের জন্য দেশে একটা বিদ্রোহ এবং শ্রেণীবদ্ধ আরম্ভের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি আক্রমণ এই পরিবর্তনের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

৫৫.২.৩ বিভিন্ন পাশ্চাত্যজাতির জাপান অভিযানের প্রচেষ্টা

নৌ-অধ্যক্ষ পেরির (Commodore Perry) জাপান অভিযান থেকে জাপানের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তকুগাওয়া সগুনদের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশি ইউরোপীয়

এবং আমেরিকান বাণিজ্যতরী জাপানের সঙ্গো বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ জাপান বিদেশির অনুপ্রবেশকে রোধ করে রাখে। কিন্তু কালক্রমে জাপান এই রুদ্ধদ্বার নীতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে রাশিয়া, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বাণিজ্যতরীগুলি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে তাদের বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছিল। জাপানের নিকটবর্তী রাশিয়াও বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণ জাপানের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্যদেশে যে সব বিপুল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছিল তার বিক্রয়ের জন্য প্রাচ্যদেশের বাজারগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতির জন্য তা সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষভাবে তাই জাপানে অনুপ্রবেশের জন্য ঐসব দেশের বিশেষ আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপানে অনুপ্রবেশের জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলির বিশেষ তৎপরতা লক্ষিত হয়। হল্যান্ডের সঙ্গো জাপানের পূর্বেই একটা সীমিত চুক্তি ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং ডাচ ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী জাপানি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গো জাপানের সংঘর্ষ বাধে কুরীল্ ও সাকালিন দ্বীপের অধিকার নিয়ে। অবশ্য এতে জাপানেরই পরাজয় ঘটে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি জাহাজও কু-স্যু (Ku Shyu) দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান জাহাজগুলিও যে-কোনো সময়ে জাপানের সমুদ্র উপকূলে এসে পৌঁছবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইতোমধ্যে অন্যান্য বিদেশি জাহাজ ও জাপানে কখনো কখনো দেখা দিয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের রাজা জাপানকে রুদ্ধদ্বার নীতি পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন।

৫৫.২.৪ নৌ-অধ্যক্ষ পেরির জাপান আগমন

সগুন-শাসিত জাপান ইচ্ছা না করলেও বিদেশি বাণিজ্যতরী এবং রণতরীর ভয়ে সর্বদাই ভীত এবং সন্ত্রস্ত্র হয়েছিল। দেশের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী জাপানের রুদ্ধদ্বার-নীতির বিপক্ষেই ছিলেন। হল্যান্ডের রাজার উপদেশে দুর্বল সগুন শাসকগণ কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়েইছিলেন। শেষপর্যন্ত আমেরিকার ভীতি প্রদর্শনের ফলে জাপান তার রুদ্ধদ্বার নীতিকে বর্জন করতে বাধ্য হয়। আমেরিকার বাণিজ্যতরীর ও রণতরীর চাপে জাপানের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ফলে জাপানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে বহুবিধ উন্নতি এবং মঙ্গালই হয়েছিল। নৌ-অধ্যক্ষ পেরির অভিযানই এই ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। কিন্তু পেরির ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এই অভিযানের পূর্বেও আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে জাপানের উপকূলে বাণিজ্য ও যুদ্ধতরীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

৫৫.২.৫ আমেরিকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য

বহু শক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার। এই জন্য প্রাচ্যদেশগুলি বহুদিন পাশ্চাত্য জাতির অধীনে ছিল। কিন্তু আমেরিকার নৌবহর এবং বাণিজ্যতরীর প্রসারের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বাণিজ্যবিস্তার। প্রাচ্যদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রলোভন আমেরিকার

তখন মোটেও ছিল না। তখন আমেরিকার বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল দেশের বন্দরেই চলাচল করছিল। সুদূর প্রাচ্যের জাপানের উপকূলে এবং নিকটবর্তী সমুদ্রে তখন আমেরিকার জাহাজগুলির সংখ্যা ছিল দ্বিতীয়, ব্রিটিশ জাহাজের পরেই। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মরিসন (Morrison) নামে একটি জাহাজ কতিপয় বিপন্ন জাপানি নাবিককে জাপানে পৌঁছে দেবার জন্য এবং যদি সম্ভব হয় তবে জাপানের সঙ্গো বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইয়েদোর (Yedo) উপকূলের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু মরিসন জাহাজকে উদ্দেশ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়—উপকূলে ভিড়তে দেওয়া হয় না। ব্যর্থ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে মরিসন্ চীনের ক্যান্টন বন্দরে গিয়ে নোঙর করে। তখন জাপান আমেরিকার উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি।

৫৫.২.৬ নৌ-বিপন্ন আমেরিকান নাবিকের প্রতি জাপানের দুর্ব্যবহার

তখন তিনি শিকারের জন্য বহু আমেরিকান জাহাজ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করত। মধ্যে মধ্যে কোনো জাহাজ বিপন্ন হলে বিপন্ন নাবিকেরা জাপানের অধীনস্থ দ্বীপগুলিতে আশ্রয় নিত। এইসব বিপন্ন অসহায় নিরীহ নাবিকদের প্রতি জাপানিরা ভালো ব্যবহার করত না। শুধুমাত্র হল্যান্ডের প্রতিনিধি ও জাহাজের মাধ্যমেই এইসব বিপন্ন নাবিকদের ছেড়ে দেওয়া হত। আমেরিকার তিমি শিকারের প্রসারতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে এবং এইরূপ বিপন্ন নাবিকদের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তাই আমেরিকার গভর্নমেন্ট জাপানের সগুন শাসনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গো এইসব বিপন্ন জাহাজ এবং নাবিকদের উদ্ধার ও নিরাপত্তার জন্য একটা সুসংগত চুক্তি ও বোঝাপড়া করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুর্বল ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জাপানের নগুন শাসকগণ বন্ধুবাবে বিদেশিদের সঙ্গো মধুর ও স্বার্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হলেন না।

৫৫.২.৭ আমেরিকার জাপানের প্রতি ভীতি প্রদর্শন

বন্ধুভাবে জাপানের সগুন শাসন কোনরূপ চুক্তি বা আলোচনার সুযোগ না দেয়োর জন্য শেষপর্যন্ত আমেরিকাকে ভীতি প্রদর্শনের নীতি অবলম্বন করতে হল। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এক কমোডরের অধীনে এক শক্তিশালী নৌবাহিনীকে পাঠিয়ে সরাসরি মুক্তবাণিজ্য চুক্তি করার জন্য আমেরিকার সরকার জাপানের শাসকদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমেরিকরা এই প্রস্তাবও সরাসরি উপেক্ষিত হল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে আবার ১৫ জন বিদেশি বন্দি নাবিককে মুক্তি না দিলে আমেরিকা নাগাসাকি বন্দরকে বোমার আঘাতে ধ্বংস করার ভীতি প্রদর্শন করে। এতে জাপান কিছু পরিমাণে ভীত হলেও বিদেশিদের সঙ্গো মুক্তবাণিজ্য বা অন্য সম্পর্ক স্থাপনে স্বীকৃত হল না। সগুন শাসনের দুর্বলতা এবং অজ্ঞতাই এর কারণ। কিন্তু আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্ত দেশগুলিতে বাণিজ্য সম্পর্ক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে তিনি শিকারের জন্য অধিক সংখ্যক জাহাজের যাতায়াত এবং নাবিকদের খাদ্য, পানীয় ও সুরক্ষার জন্য জাপানি দ্বীপ এবং বন্দরের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করতে থাকল। জাপানের সঙ্গো বাণিজ্য চুক্তি না হলে আমেরিকার বাণিজ্য এবং তিমি শিকারের ব্যবস্থা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই জাহাজ ব্যবসায়ী এবং তিমি শিকারের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি আমেরিকান সরকারের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করল যাতে জাপান তার বন্দর ও দ্বীপগুলিতে জাহাজ চলাচল নিরপাদ ও ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল করে তোলে। এবার আমেরিকার

সরকার আর দৃঢ় হয়ে কমোডের পেরিকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য দিয়ে নৌবহর প্রস্তুত করে জাপানের সঙ্গো কোনো প্রকারের একটা চুক্তি সম্পাদন করার জন্য প্রেরণ করলেন।

৫৫.২.৮ পেরির জাপান অভিযান (১৮৫৩)

আমেরিকার বাণিজ্যিক জাহাজ কোম্পানিগুলির এবং সরকারের বিশেষ ইচ্ছা, নির্দেশ এবং সহায়তা নিয়ে কমোডোর পেরি জাপানের সঙ্গো আমেরিকার একটা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো প্রকার চুক্তি সম্পাদন করার জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে জাপান অভিযান করেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পেরি ইয়েদোর (Yedo) নিকটবর্তী উরাগা উপসাগরে বহু সৈন্যসামন্তসহ রণতরী নিয়ে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি নানারূপ সামরিক শক্তির প্রদর্শনী করে জাপান সরকারের ভীতি উৎপাদন করারও চেষ্টা সকরেন। তারপর তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের লিখিত পত্র জাপান সরকারের শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এর প্রতিক্রিয়া কী হয় তা জানবার জন্য কয়দিন সমুদ্রের জাহাজ নোঙর করে অপেক্ষা করেন। কিন্তু সগুন-শাসিত জাপান সরকার তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিবার সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। কমোডোর পেরিও কোনো জবাব না পেয়ে, এবার আরও বেশিদূর অগ্রসর হতে সাহস করলেন না। নিজেদের মানরক্ষা করে এবং জাপানি সরকারকে চিন্তা করার সময় দিয়ে বুদ্ধিমান পেরি এই বলে সতর্ক করে দিয়ে আমেরিকা ফিলে গেলেন যে, তিনি আবার পরবর্তী বসন্তকালেই এই পত্রের যথার্থ জবাব নেবার জন্য জাপানে আসবেন। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে যেন জাপান সরকার জবাব প্রস্তুত করে রাখে।

কমোডোর পেরির এই হুমকির ফল সঙ্গো সঙ্গো না পেলেও দুর্বল সগুন-শাসন বেশ ভীত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ে। পেরির আগমনে জাপনের অভ্যন্তরে এক বিশেষ আলোড়ন এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই সংবাদ সম্রাটের দরবারেও পৌঁছল। সপারিষদ সম্রাটও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কী করা যায় তা সঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। জাপানের সাধারণ নাগরিকদের মনেও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। দেবতা ও দৈবশক্তিকে বিশ্বাসী সম্রাট রাজ্যের সর্বত্র প্রধান প্রধান মন্দিরে এবং ধর্মীয় স্থানে শান্তি ও মঙ্গালের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার জন্য এক জরুরি আদেশ প্রচার করলেন। রুদ্ধদ্বার নীতির কট্টর সমর্থক হলেও সগুন-শাসিত সরকারের বা সম্রাটের আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশিদের জাপান অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ছিল না। বিশেষত রণতরীর সাজসজ্জায় এবং নৌযুদ্ধ কৌশলে পাশ্চাত্য জাতিগণ সেইকালে বেশ অগ্রণী ছিল। এই বিষয়ে জাপান তখন খুবই অনভিজ্ঞ।

পরবর্তী বসন্তকালে, পূর্বঘোষিত প্রতিজ্ঞা অনুসারেই কমোডোর পেরি বিপুল সংখ্যক রণতরী ও সৈন্য নিয়ে জাপানের উপকূলে এসে উপস্থিত হলেন। এবার পেরির বাষ্পচালিত যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর দেখেই জাপান শাসকমণ্ডলী নিজেদের দুর্বলতা এবং অসহায়তার কথা চিন্তা করে আমেরিকার সঙ্গো একটা সন্ধি করতে সম্মত হলেন। পেরির এই দ্বিতীয় অভিযান জাপানের রুদ্ধদ্বারকে বিশ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হল।

৫৫.২.৯ পেরির মাধ্যমে জাপানের সঙ্গো চুক্তি

পেরির সঙ্গো চুক্তি করতে সম্মত হলেও রক্ষণশীল জাপান সব ব্যাপারেই দেশকে বিদেশির নিকট উন্মুক্ত করতে সহজে স্বীকৃত হয়নি। পেরির সঙ্গো এই চুক্তির দ্বারা মাত্র কয়েকটি সুবিধা তারা আদায়

করে নিতে পেরেছিল। এই সুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান হল বিদেশি জাহাজগুলির অবাধ যাতায়াতে সহায়তা। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায়ই জাহাজডুবি হত। বিপন্ন নাবিকদের উদ্ধার, সুরক্ষা এবং সসম্মানে সুস্থদেহে ফিরিয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল এই চুক্তিতে। এই চুক্তি পূর্বে বিপন্ন অসহায় নাবিকগণ কীভাবে উৎপীড়িত হত তা আমরা আগেই জেনেছি। নানবিকতার দিক থেকে এই শর্তটি খুবই জরুরি ছিল।

আর একটি শর্ত ছিল ভাঙা জাহাজকে কোনো নিকটতম বন্দরে মেরামত করার অনুমতি দেওয়া। প্রয়োজনবোধে যাতায়াতকারী জাহাজকে খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য আবশ্যক উপাদান সরবরাহ করে সাহায্য করা। মোটকথা এই চুক্তির ফলে আমেরিকান জাহাজগুলি জাপানের সমুদ্র দিয়ে অবাধে যাতায়াতের সুবিধা লাভ করে।

অন্যান্য শর্তগুলি মোটামুটি এইরূপ : দুটি বন্দরকে আমেরিকার জাহাজগুলির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। একটি হল ইয়েদোর (Yedo) নিকটবর্তী শিমোদা (Shimoda) বন্দর এবং অপরটি হল উত্তরাঞ্চলের দ্বীপের হাকোদাতে (Hakodate) বন্দর। এই চুক্তি অনুসারে একজন আমেরিকান বাণিজ্যদূতকে (Consul) শিমোদা (Shimoda) শহরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের আইন অনুসারে সীমিতভাবে ব্যবসারও অনুমতি দেওয়া হয়। এই বাণিজ্যিক নিয়মকানুন আমেরিকার পক্ষে কঠোর মনে হলেও তা অবশ্যই মেনে নিতে হল। আমেরিকার চলাচলকারী জাহাজের প্রয়োজনে যেসব জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে তা অবশ্যই জাপানি সরকারের কর্মচারীর মাধ্যমেই করতে হবে।

পেরির সঙ্গো জাপানের এই চুক্তিকে একটা সম্পূর্ণ বাণিজ্যচুক্তি বলা যায় না। তবু এই চুক্তির ফলে আমেরিকান এবং অন্যান্য দেশের জাহাজগুলির পক্ষে জাপান অঞ্চলের সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা আরও সুগম এবং নিরাপদ হয়। জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতির ও কিছুটা উদারতা পরিলক্ষিত হয়। তবে জাপানে বাণিজ্য-দূতাবাস স্থাপন এবং সীমিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধালাভকে আমেরিকার পক্ষে একটা ‘বিশেষ সুবিধা’ বলেই গণ্য করা যেতে পারে।

৫৫.২.১০ অন্যান্য দেশের সঙ্গো জাপানের চুক্তি

পেরির চুক্তি আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের কাছেও জাপানের রুদ্ধদ্বারকে খুলে দিয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পেরির চুক্তির প্রায় দুই বছরের মধ্যেই জাপান ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং হল্যান্ডের সঙ্গো অনুরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তবে পরবর্তী দেশগুলির চুক্তির মধ্যে বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপন এবং ব্যাপক বাণিজ্যের তেমন অধিকার ছিল না। এর পর থেকে ধীরে ধীরে আরও নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে থাকে যার ফলে জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতি প্রায় উন্মুক্ত হয়ে যায়।

রাশিয়া বহুকাল যাবৎই জাপানে প্রবেশের চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো সুযোগ পাচ্ছিল না। কিন্তু পেরির চুক্তির পর আবার অ্যাডমিরাল পুটিয়াটিনের (Admiral Putiatin)-এর নেতৃত্বে তিনটি যুদ্ধজাহাজের এক বাহিনী নাগাসাকি বন্দরে এসে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য—যদি আমেরিকান চুক্তির মতো রাশিয়ার সঙ্গোও কোনো চুক্তি করা যায়। কিন্তু ১৮৫৫-রে পূর্বে রাশিয়া জাপানের সঙ্গো বিশেষ সুবিধাজনক কোনো চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে ব্রিটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষ স্যার জেমস্ স্টারলিং (Sir James Sterling) চারখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে নাগাসাকি বন্দরে আসেন। বহু চেষ্টার পর স্টারলিং জাপান সরকারের সঙ্গো একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এই চুক্তিতে খুব উল্লেখযোগ্য কোনো সুবিধা না থাকলেও তা যে আমেরিকার সঙ্গো চুক্তির পরবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য চুক্তি তাতে সন্দেহ নেই। এটিও মোটামুটিভাবে পেরির চুক্তির মতোই ব্রিটিশ শক্তির জাপানে স্থানলাবের এক নিদর্শন।

তারপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের সঙ্গো জাপানের এক বাণিজ্যচুক্তির পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হয়। জাপানের উদারনীতি এইভাবে ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সকল বিদেশি সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধি জাপানে বসবাসের অধিকার লাভ করেন নি।

৫৫.২.১১ আমেরিকার বিশেষ সুবিধালাভ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি টাউনসেন্ড হ্যারিস (Townsend Harris) জাপানের উন্মুক্ত বন্দরগুলিতে আমেরিকাবাসীদের বসবাস করার বিশেষ অধিকারলাভ করেন। এই সকল বন্দরগুলির সঙ্গো নাগাসাকি বন্দরও নতুনভাবে যুক্ত হল। হ্যারিসের বিশেষ প্রচেষ্টায় জাপানপ্রবাসী আমেরিকানগণ বিদেশও দেশের ন্যায় কতকগুলি বিশেষ অধিকার (Extra Territorial Rights) লাভ করল। এই অধিকারলাভের ফলে জাপানপ্রবাসী আমেরিকান নাগরিকগণ তাদের বাণিজ্যদূতের (Counsul General) অধীনে এবং তাদেরই দেশের আইন অনুসারে বসবাস করার ও চালিত হওয়ার সুবিধালাভ করে। এই সকল বিদেশিদের উপর জাপান সরকারের কোনো আইন বা শাসন প্রযোজ্য ছিল না। বিদেসীদের এই অধিকার-লাভ আমেরিকার পক্ষে বিশেষ গৌরবের এবং জাপানের পক্ষে কিছুটা মর্মবেদনা ও দুঃখের কারণ হয়েছিল।

যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তেমনি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও টাউনসেন্ড হ্যারিস আমেরিকার জন্য বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আদায় করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি চুক্তি সম্পাদনের ফলে আমেরিকার সঙ্গো জাপানের বাণিজ্যের আরও বহুল প্রসারতা লাভ করে। এই চুক্তির সুযোগ-সুবিধাগুলি আমেরিকা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ভোগ করতে পেরেছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে আমদানি রপ্তানি শুল্কের প্রবর্তন এবং তার পরিমাণের হারও নির্দিষ্ট হল। আরও স্থির হল যে, এই শুল্কের হার উভয়পক্ষের সমর্থন ব্যতীত হ্রাসবৃদ্ধি করা চলবে না। উপরন্তু সম্রাটের দরবারে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করার সম্মতিও আদায় করা হল। নাগাসাকি বন্দরকেও এই সকল সুবিধালাভের জন্য আমেরিকাকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টাউনসেন্ড ক্রমে ক্রমে এই সকল চুক্তি দ্বারা সগুন শাসকদের নিকট থেকে যেসকল সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন, তার পেছনে কোনো বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন ছিল না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ভদ্রোচিত অমায়িক ব্যবহার, উভয় দেশের স্বার্থের যুক্তি প্রদর্শন এবং রাজপুরুষোচিত কৌশলের দ্বারাই তিনি সগুনদের মন জয় করতে পেরেছিলেন।

৫৫.২.১২ জাপানের জাতীয় মানসে চুক্তিগুলির প্রতিক্রিয়া

পেরির চুক্তির পর পর যেসকল বাণিজ্যিক বা অন্য রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে থাকল—তাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সংরক্ষণশীল ও জাত্যাভিমানী জাপানকে নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে হল। তাই সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে সম্রাট পর্যন্ত সকলেই বিদেশিদের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তখন দুর্বল সগুন-শাসনের এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। সগুন-শাসকদের উপরও সাধারণের ক্রোধ ছিল।

টাউনসেন্ডের এই চুক্তিতে জাপান বিদেশীদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব হারাল। জাপানের কোনো আইন তাদের উপর প্রযুক্ত হয়ো বন্ধ হল। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণে জাপানের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকল না। এতে জাপানের সম্মান এবং অর্থগত ক্ষতিও হল! এই উভয় প্রকার অবমাননা এবং ক্ষতি জাপান জাতির পক্ষে খুবই মনোবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল।

৫৫.২.১৩ বিশ্বের দরবারে জাপানের প্রবেশ

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আরও বারোটি পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গো জাপানের টাউনসেন্ডের সঙ্গো চুক্তির অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই সময় চীনদেশের সঙ্গো শক্তিশালী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধে চীনের পরাজয় অনুমান করে এবং বহু পাশ্চাত্য জাতির পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তারের আগ্রাসী প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে জাপান শীঘ্রই অপর বিদেশি শক্তিগুলির সঙ্গোও তাদের চুক্তি সম্পাদনকে ত্বরান্বিত করে। এইভাবে বাইপেরর শক্তির চাপে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ সগুন শাসনের দুর্বলতার জন্যই জাপান বাধ্য হয়ে উদারনীতির পথে অগ্রসর হতে সম্মত হয়।

এই সময়েই আমেরিকার সঙ্গো জাপানের চুক্তিগুলিকে চূড়ান্ত সমর্থন ও কার্যকর (ratify) করার জন্য জাপান থেকে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে আমেরিকা প্রেরণ করা হল। আমেরিকাযাত্রী এই প্রতিনিধিমণ্ডলীই হল জাপানে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের সর্বপ্রথম রাজদূত ও রাজপ্রতিনিধি। এইভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রতিনিধি গ্রহণ করে এবং নিজেদের প্রতিনিধিকে বিদেশে পাঠিয়ে জাপান দ্বারমুক্ত দেশে পরিণত হল।

৫৫.৩ জাপানের চিন্তা ও চেতনা

৫৫.৩.১ বৈদেশিক অনুপ্রবেশে জাপানে বিভিন্ন চিন্তা ও চেতনার দ্বন্দ্ব

আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে দেশের শাসনপদ্ধতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে জাপানে পর পর বহু পাশ্চাত্য জাতির আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার প্রতিষ্ঠালাভ করে। রক্ষণশীল এবং অত্যধিক স্বজাত্যভিমানী জাপানের অধিকাংশ লোকই বলপূর্বক বৈদেশিক অনুপ্রবেশকে সমর্থন করেনি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বহির্বিশ্বের সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো কোনো চিন্তাশীল

ব্যক্তি একে জাপানের পক্ষে মঙ্গলকর বলেই মনে করে। কিছু স্বার্থান্বেষী এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ভালোমন্দ বিচার না করেই জাপানকে চিরকাল রুদ্ধদ্বারা করে রাখতে চায়। অপর একদল ছিলেন মধ্যপন্থী।

৫৫.৩.২ বৈদেশিক অনুপ্রবেশকে ঘিরে তিনটি দল

পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিদেশিদের সঙ্গো এই সকল চুক্তি অধিকাংশ জাপানিরই পছন্দ ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে বিদেশিদের অনুপ্রবেশ লাভের পর জাপানের নাগরিকগণ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই তিন দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই দেশের দ্বৈত শাসনের অবসান হয় এবং জাপানের রাজনৈতিক শাসনের কাঠামোর পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রথমদলের মতে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং শাসনপদ্ধতির ঐতিহ্য নিশ্চিতই জাপান এবং যে-কোনো প্রাচ্যদেশ থেকে উন্নততর ছিল। সুতরাং একে অবজ্ঞা করার উপায় নেই—এবং উপেক্ষা না করেই একে গ্রহণ করাই জাতির পক্ষে কল্যাণকর। এদের মতে, পাশ্চাত্য জাতিদের অবাধে জাপানে আসার অনুমতি দেওয়া হোক এবং তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পদ্ধতিকে আয়ত্ত করে এদের সঙ্গো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এদেশ থেকে ক্রমশ তাদের বিদায় করহার চেষ্টা করা হোক। পূর্বেও জাপান নিজেদের চেয়ে উন্নততর চীনজাতির শিক্ষা ও সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিজেদের উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতি চীন থেকে নানাক্ষেত্রে উন্নততর। সুতরাং পাশ্চাত্য জাতিকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। প্রথমে এই দলের লোকের সংখ্যা ছিল পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গো পরিচিত অল্পসংখ্যক কিছু লোক। কিন্তু বছর পনেরোর মধ্যেই এঁদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। এঁরা দুর্বল সগুনদের শাসন বিলোপ করে একমাত্র সম্রাটের শাসনের প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশে রাজভক্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সম্রাটের প্রতিপত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এরাও এই দলের সমর্থন করতে লাগলেন। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, জাপানি পণ্ডিতগণ সগুন-শাসনকে 'অবৈধ শাসন' বলে ঘোষণা করতে লাগলেন। এইভাবে এই দলের স্লোগান হয়ে গেল—'সম্রাটের প্রতিষ্ঠা ও বিদেশির অনুপ্রবেশ চাই।' 'সগুন-শাসন চলবে না।' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দলে ছিলেন সগুন-শাসনের স্বার্থসম্পর্কিত কিছু লোক। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, বিদেশি অনুপ্রবেশ থেকে দেশকে সংরক্ষিত ও রুদ্ধদ্বার করে রাখা প্রায় অসম্ভব। তাঁরা চাইছিলেন যেখানে প্রতিরোধ একেবারে অসম্ভব, সেখানে রয়ে সয়ে যতটা না দিলে না হয়, ততটা অনুপ্রবেশ এবং অধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু কিছুতেই অবাধ অনুপ্রবেশ নয়। তাঁরা সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে বা বিদেশির অবাধ অনুপ্রবেশকে,—কোনটাকেই মনেপ্রাণে চাননি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের দীর্ঘকালব্যাপী স্বার্থকে বাঁচিয়ে রেখে বিদেশির সঙ্গো আপোস করা।

তৃতীয় দলে ছিলেন কিয়োতোর (Kyoto) আশেপাশের সম্রাটের একান্ত অনুগামী কিছু সংখ্যক লোক। তাদের মতো ছিল জাপানের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতিতে অটল থাকা এবং সকল বিদেশিকে দেশ থেকে যে-কোনোভাবে বিতাড়ন করা। কিন্তু এই দলও ছিল ভ্রান্ত এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কিয়োতোর সম্রাট এবং তাঁর পারিষদদের সঙ্গো

বিদেশিদের প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ ছিল না। আবার সময় সময় সম্রাটগণ ক্ষমতাশালী সাৎসুমা ও চো-সুর ন্যায় ক্ষমতাশীল জায়গীরদারদের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকতেন—নিজস্ব কোনো রাজশক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন না।

বিদেশিদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে সগুনদেরই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। ভূম্যধিকারী ক্ষমতাশালী সামুরাই সামন্তগণ সগুনদের প্রাধ্যান্য মোটেও পছন্দ করতেন না এবং বিদেশি অনুপ্রবেশের ফলে তাঁদের স্বার্থ যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা তাঁরা উপলব্ধি করতে লাগলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা সগুনদের বিরুদ্ধাচারণও করলেন না। সম্রাটের অজ্ঞাতে এবং অনুমতি ব্যতীত বিদেশিদের প্রবেশাধিকার দেওয়াকে সামন্তগণ পরোক্ষভাবে রাজশক্তির অবমাননা ও বিরুদ্ধাচরণ বলেও প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা ক্রমশ কিয়োতোর রাজসভা এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সগুনদের আচরণের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। এই সামন্তগণ সম্রাটকে প্ররোচিত করতে থাকলেন যাতে সম্রাট তাঁর রাজশক্রি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সগুন-কর্তৃক অবৈধভাবে বিদেশিদের অনুপ্রবেশের অনুমতিকে পুরোপুরি বাতিল করে দেন। অবশ্য তখন দেশের পরিস্থিতি এতই জটিল ছিল যে সম্রাটের এমন কোনো শক্তি ছিল না যার দ্বারা তিনি পূর্বকৃত সব চুক্তিকে বাতিল করে বিদেশিদের বিতাড়ন করে দিতে পারেন।

৫৫.৫.৩ দলীয় মতভেদ ও দ্বন্দ্বে সগুন-শাসনের অতিষ্ঠ অবস্থা

বিদেশিদের অনুপ্রবেশ দানের চুক্তির ব্যাপারে সগুন-শাসনই পুরাপুরি কর্তৃত্ব করে। বিদেশিরা বহুদিনই বুঝতে পারনে নি কে জাপানের শাসন ব্যাপারে আইনসম্মত অধিকারী। সম্রাটের সঙ্গে বিদেশিদের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেনি। সগুনরাই ছিলেন মধ্যস্থ। কিন্তু সগুন-শাসকগণ অনেকক্ষেত্রে বিদেশিদের সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিলম্ব করতেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশিদের অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়ার ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের জনমত সোচ্চার হয়ে উঠছে।

পরস্পর বিভক্ত তিন জলের সকলেই সগুন শাসনের অবসান চাইছিলেন। সকল দলই সম্রাটের সমর্থন লাভ করে নিজেদের অধিকতর শক্তিশালী করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকেন। এই সকল দলের মধ্যে পশ্চিম জাপানের ভূম্যধিকারী সামুরাইদের প্রভাব ছিল সম্রাটের উপর সবচেয়ে বেশি। একসময় সম্রাট স্বয়ং এঁদের উপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁরা সম্রাটকে নানাভাবে প্ররোচিত করে সগুনের মাধ্যমে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী 'অসভ্য বর্বরদের' জাপান ত্যাগ করে চলে যাবার আদেশ জারি করাতে বাধ্য করেন। কিন্তু সগুন অত সহজে এই আদেশ জারি করতে পারে নি। কারণ, তিনি জানতেন বিদেশিদের গোলাবারুদের ও শক্তিশালী কামানের বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অপরপক্ষে তিনি সম্রাটের আদেশকে অমান্য করকতেও সাহস পেলেন না। কারণ সম্রাটের আদেশ অবমাননা করার অপরাধ যে কত গুরুতর তা তিনি বুঝতেন। সম্রাটের আদেশের অবমাননাকে তাঁর বিরুদ্ধবাদী দলের লোকেরা রাজার প্রতি প্রত্যক্ষ অবমাননা বলে প্রচার করে তাঁর আরও বিশেষ ক্ষতিসাধন করতেন। দ্বিধাগ্রস্ত ও বিপন্ন সগুন শাসক সম্রাটের আদেশকে কার্যকর করতে আরও কিছু সময় বিলম্ব করতে লাগলেন। একদিকে সম্রাটকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে তাঁর আদেশ তিনি পালন করবেন। আবার বিদেশিদের সঙ্গেও তিনি সংযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন। কিন্তু তাদের প্রার্থিত নতুন কোনো

সুযোগসুবিধা দান বিষয়ে অহেতুক বিলম্ব করেই চললেন। এতে সম্রাট পরিষদ এবং বিদেশিগণ উভয় দলই সগুনের উপর বিরক্ত এবং আস্থানহীন হয়ে পড়লেন। বিদেশিরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে করতে লাগলেন—কারণ তারা জানতেন না যে জাপানের আসল শাসক হলেন স্বয়ং সম্রাট। এই অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে সগুন খুবই কষ্টে কালযাপন করতে থাকলেন। কিন্তু দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সগুন-শাসনকে অসহনীয় মনে করে এর পরিসমাপ্তি ঘটাবার পথেই অগ্রসর হতে থাকল।

৫৫.৩.৪ সগুন-শাসনের অবসান

আভ্যন্তরীণ এবং বিদেশিদের চাপে সগুনের অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকল। দিদিন চুক্তিসূত্রে অধিকারপ্রাপ্ত বন্দরগুলিতে বিদেশিদের সংখ্যা বেড়েই যেতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রসারলাভ করতে থাকল। এমনকি বিদেশি ধর্মপ্রচারকগণ ঐসব বন্দরে প্রবেশ করে ধর্মপ্রচার করতেও আরম্ভ করেন—যার বিরুদ্ধে জাপান দীর্ঘকাল প্রতিবাদ ও আপত্তি জানিয়ে এসেছে। প্রতিবাদী সামুরাই এবং জায়গীরদারদের সঙ্গো বিদেশিদের সঙ্ঘাত বেড়েই চলল। কখনো কখনো ক্রুদ্ধ সামুরাইদের হাতে বিদেশিগণ আহত এবং নিহত হতে থাকলেন। সামুরাইগণ 'বর্বর' বিদেশিদের যে-কোনোভাবেই জাপানের 'পবিত্রভূমি' থেকে বিতাড়নের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ব্রিটিশ অধিবাসী রাজপথে সাৎসুমার সম্মানিত শাসকপুরুষের প্রতি অজ্ঞতাবশত যথাযথ সম্মান না দেখানোর জন্য আধিকারিক ও তাঁর অনুগতগণ ক্রুদ্ধ হন। কোনো সামুরাই তাদের আক্রমণ করে একজন ব্রিটিশ নাগরিককে হত্যাও করেন। এই হত্যার ফলে বিদেশিদের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইয়েদোর সগুন-শাসক এই হত্যার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিক্ষোভ শান্ত করার চেষ্টা করেন। অপরাধী সামুরাইকে ব্রিটিশের হাতে দেবার দাবিকে সাৎকুমার শাসক অস্বীকার করেন। সগুনেও এমন ক্ষমতা ছিল না যে অপরাধী সামুরাইকে শাস্তি দিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যু-সুর (Kyusu) অন্তর্গত সাৎসুমা প্রদেশের কাগেসিমা (Kagoshima) নগরকে বোমাদ্বারা আক্রমণ করেন।

৫৫.৩.৫ সাৎসুমার পর চো-শুর (Choshu) সামন্তের বিদ্রোহ

সাৎসুমার সামন্তের ন্যায় চো-শুর জায়গীরদারও 'বিদেশি বর্বর'দের প্রতি খুবই অপ্রসন্ন ছিলেন। একই বছর (১৮৬২ খ্রিঃঠ) সগুনের অজান্তেই সম্রাটের এক আদেশ বলে চো-শুর জায়গিরদার তাঁর শাসন অন্তর্গত শিমনোসেকি (Shimonoseki) সমুদ্র প্রণালীটিতে বিদেশি জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করে দেন। এই প্রণালী দিয়েই ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াত করত। বাণিজ্যের পক্ষে তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি বন্ধ হওয়াতে সকল বিদেশিই ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপমানিত বোধ করল।

উপরন্তু সগুনের অজ্ঞাতসারেই সম্রাট আর একটি জরুরী আদেশ প্রদান করলেন যে, সকল বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরই শীঘ্র জাপান থেকে বিতাড়ন করা হোক। চো-শুর শাসক খুবই আনন্দের সঙ্গো সম্রাটের এই আদেশ পালনে তৎপর হলেন। সমুদ্রপ্রণালীতে সমাগত আমেরিকা, হল্যান্ড এবং ফরাসি দেশের বহু জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করা হল। এই সকল দেশের রাজপ্রতিনিধি এবং ব্রিটিশের

প্রতিনিধি ও সগুনের নিকট এই আক্রমণের প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণ একযোগে দাবি করলেন। তাঁরা আক্রমণকারী ভূমিসামন্তের শাস্তির জন্য চাপ দিতে থাকলেন। চো-শুর শাসক ইয়েদো থেকে পাঠানো রাজদূতকে হত্যাই করে ফেলেন। কিন্তু অসহায় সগুন বা তাঁর কর্মচারীবৃন্দ এর কোনোই প্রতিকার করতে সক্ষম হলেন না।

ক্রুদ্ধ, অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকা, হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন—এই চার দেশের নৌ-সেনাপতিগণ সমবেতভাবে শিমনোসেকির উপর বোমাবর্ষণ করে দুর্গকে ধ্বংস করে দেয়, কয়েকটি জাহাজকেও ডুবিয়ে দেয়। ভীত এবং পরাস্ত হয়ে চো-শুর জায়গিরদার সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে সেখানে আর দুর্গ তৈরি করা হবে না, সমুদ্র উপকূলে জাহাজ চলাচলে কোনো বাধা দেওয়া হবে না এবং তিন লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এইরূপ সন্ধি করে জায়গিরদার কোনও প্রকারে সাময়িক প্রতিকূলতা সামনে নিলেন।

অপরপক্ষে সগুন চো-শুর সামন্তের এই ব্যবহারে এবং তাঁকে অবমাননা করার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে শাস্তিদানের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্বল সগুন শক্তিশালী চো-শুর সামন্তের কিছুই করতে পারলেন না। চো-শুর সামন্ত প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে না পারায় সগুনকেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে হল। দুর্বল সগুন ভয়ে ভয়ে দাবির চেয়ে বরং বেশি ক্ষতিপূরণই আমেরিকার প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন পরে অবশ্য অতিরিক্ত টাকা আমেরিকা জাপানকে ফেরত দেয়।

৫৫.৩.৬ সগুনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিদেশির ভ্রান্তি

সম্রাটই হলেন জাপানের সার্বভৌম অধিপতি। সগুন ছিলেন তার প্রতিনিধিমাত্র। কিন্তু সগুন শাসনের এমনই এক কূটচক্র গড়ে উঠেছিল যে সম্রাটকে লোকচক্ষুর এবং লোকসংযোগের বাইরে রেখে সগুনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকেন। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বিদেশি বণিক, সেনাপতিও রাজপ্রতিনিধিগণ জানতেন না যে সম্রাটই যথার্থ সার্বভৌম কর্তা। তাঁরা ভ্রান্তিবশত সগুনকেই সর্বেসর্বা মনে করে তাঁর সঙ্গেই সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল সম্রাট অনেকটা ধর্মীয় প্রতিনিধিমাত্র। বহু পরে—বিশেষত শিমনোসেকির বোমাবর্ষণের দ্বারা ধ্বংসের পরে তাঁরা সগুন ও সম্রাটের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে, তা বুঝতে পেরেছিলেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার হ্যারি পারকেস্ (Sir Harry Parkes) বুঝতে পারলেন যে সব কয়টি চুক্তিই আইনসম্মতভাবে সম্রাটের সঙ্গেই করতে হবে। অন্যান্য বিদেশিরাও এই সত্য বুঝতে পেরে সকলেই সগুনের পরিবর্তে সরাসরি কিয়োতো-তে সম্রাটের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে তাঁদের দাবি জানাতে থাকেন। তাঁদের দাবি ছিল ওসাকা (Osaka) বন্দরে বিদেশি বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপন এবং কিছু পরিমাণে প্রবেশ-শুল্কের হারের হ্রাস করা। সম্রাটও ভয়ে ভয়েই বিদেশিদের সকল দাবিই মেনে নেন। সগুনও নিষ্ক্রিয় হয়ে সব দেখলেন।

এর পর থেকেই সগুন বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর সম্রাটের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং বিদেশিদেরও 'বর্বর' বিবেচনা করে দেশে অনুপ্রবেশে বাধা দিতে পারলেন না।

সম্রাটরে আদেশ পালনে অক্ষম সগুন নিজের অসহায় অবস্থাকে দেশি বিদেশি কারও কাছেই গোপন রাখতে পারলেন না। বিদেশিরা ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে তাঁরা সম্রাটকে বাদ দিয়ে সগুনকে সার্বভৌম কর্তা মনে করে কতটা ভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এদিকে সম্রাটও বুঝতে পারলেন যে সগুন এখন ক্ষমতাহীন—যদিও সম্রাটের অজান্তে সগুন ক্ষমতার বহু অপব্যবহার করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তগণ তো পূর্বেই সগুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেই ছিলেন। সাধারণ মানুষও সগুনের উপর বিরূপ ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের ভূমিসামন্তদের প্ররোচনায় সম্রাট সগুনের আচরণের জন্য কৈফিয়ত তলব করলেন। দেশের দুরবস্থার জন্য সগুনকেই দায়ী করা হল। বাধ্য হয়ে সগুন পদত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু সম্রাটেরও তখন এমন শক্তি ও সাহস ছিল না যে তিনি সগুনকে বরখাস্ত করে নিজে শাসনকার্য চালাতে পারেন। এদিকে পরাক্রমশীল 'বর্বর' বিদেশিরা জাপানে প্রায় বলপূর্বকই প্রবেশ করে বসে আছে।

৫৫.৩.৭ সগুনের মৃত্যু—নতুন সগুনের শাসনক্ষমতা প্রত্যর্পণ

জাতির ও দেশের এই দুঃসময়ে অল্পবয়স্ক সগুনের হঠাৎ মৃত্যু বয়। তাঁর স্থলবর্তী যিনি সগুন হলেন তিনি ছিলেন খুব বিচক্ষণ ও ধীরস্থির। তিনি পাশ্চাত্যদেশীয় পন্থা অবলম্বন করে তকুগাওয়া সগনুদের নষ্ট ক্ষমতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন। তিনি আবার নতুন করে সৈন্যবাহিনী ও ইয়েদোর শাসনপদ্ধতিকে সাজাতে চেষ্টা করলেন। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি চো-শুর ভূমিসামন্তকে নিজ ক্ষমতাধীন আনার এবং সম্রাটেরও বিশ্বাসভাজন হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি সগুন-শাসনকে পুনঃস্থাপন করতে পারলেন না।

তখন দেশব্যাপী প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল যাতে দুর্বল সগুন তাঁর শাসনক্ষমতাকে মহামান্য সম্রাটের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। বুদ্ধিমান সগুন বুঝতে পারলেন যে জাতীয় দাবি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বৈতশাসন তাঁর পক্ষে এবং দেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হবে। সব বুঝে তিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর সম্রাটের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে পদত্যাগ করলেন। সেই দিনই সম্রাটের এক আদেশ বলে সগুন পদের ও দ্বৈতশাসনের অবসান হল। অবশ্য তকুগাওয়া বংশের কেউ কেউ পাশ্চাত্য জাতির চাপে এইভাবে সগুনের ক্ষমতা বিলোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চেষ্টা করেন—কিন্তু তাও বিফল হয়।

প্রায় সাতশো বছরের প্রাচীন এই সগুন প্রথার অবসান হল। সম্রাট এবার স্বয়ং সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হলেন। সগুন প্রথার অবসানের পর ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাপানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এরপর থেকে জাপানি সম্রাটগণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের পরামর্শমতো পাশ্চাত্য জাতির অনুপ্রবেশকে মেনে নিলেন। তাঁদের সকল চুক্তিকে মর্যাদা দিয়ে বহির্বিশ্বের নিকট জাপানের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। কিন্তু বিদেশিভাবকে প্রশ্রয় দিলেও জাপান তাঁর স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে মোটেও বর্জন করেনি।

সগুন-শাসনের অবসানের পর সম্রাট মেজির শাসন থেকে নব-জাপানের অভ্যুদয় হতে থাকে।

৫৫.৪ সারাংশ

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাপানের রাজকীয় ক্ষমতা সব গিয়ে পড়ে তকুগাওয়া সগুন পরিবারের হাতে। তার পূর্বে ১১৯২ থেকে য়োরিডোমো নিজের বাহুবলে সগুনদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পত্তন করেন। সাতশো বছর এই সগুনরাই ছিলেন বংশপরম্পরায় জাপানের সর্বময় কর্তা। ঠিক যেমন এককালে ছিলো য়ুরোপে ব্যারন, যারা রাজশাসনের তোয়াক্কা করত না। জাপানের সম্রাট বা মিকাডোকে দেবতার আসন দিয়ে লোকালয় থেকে সরিয়ে রেখে শাসনকার্য তারাই চালিয়েছিল। মার্কিনীদের আসার পর থেকেই দেশের মধ্যে সগুনদের বিরুদ্ধে জনমত জাগে। এই সময় মুৎসুহিতো মিকাডো সম্রাট হন, তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দো। এই নতুন সম্রাট সাবালক হয়ে সগুনদের শক্তির অবসান ঘটান। ইনি ১৮৬৭ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত জাপনের সম্রাট ছিলেন। মুৎসুহিতোর শাসনকালকে বলে মেইজি পর্ব। অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে জাপান কীভাবে এশিয়ার একটি নতুন শক্তিরূপে আবির্ভূত হল, তার ইতিহাস উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। ভারত, চীন, বৃহত্তর ভারত, জাপান—সমস্ত দেশে নবজাগরণ আনবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী য়ুরোপীয়রা। প্রাচ্যের মানসমুক্তি এসেছিলো য়ুরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞানিদের ব্যবহার থেকে। তবে জাপান স্বাধীন রাষ্ট্র বলে সে শীঘ্র পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শিল্পাদি আয়ত্ত করে এইশয়ার বাণিজ্য বাজারে স্থান লাভ করে, রণবিদ্যায় অজেয় হয়ে ওঠে। গড়ে উঠে আধুনিক জাপান।

৫৫.৫ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) জাপানের তকুগাওয়া শাসনের প্রধান প্রধান দুর্বলতা কী ছিল ?

(খ) জাপানের সাধারণ মানুষ সম্রাটকেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা চেয়েছিল কেন ?

(গ) জাপানে মার্কিনী অভিযানের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল ?

(ঘ) জাপানের কমোজর পেরির নৌ-অভিযানের বর্ণনা দিন। ঐ অভিযানের ফল কী হয়েছিল ?

(ঙ) বিদেশি অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কীভাবে জাপানি সম্রাট ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) আমেরিকা ছাড়া আর কোন্ পাশ্চাত্য জাতি জাপান অভিযান করেছিল ?

(খ) আমেরিকার নৌ-বিপন্ন নাবিকদের প্রতি জাপান কেমন ব্যবহার করেছিল ?

(গ) কমোডর পেরির মাধ্যমে জাপানের সঙ্গো যে মার্কিনী চুক্তি হয়েছিল তার বিবরণ দিন।

(ঘ) জাপানের কাছ থেকে আমেরিকা কী কী বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) দাইমিও ও সামুরাই কাদের বলা হত?

(খ) জাপানের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রধান প্রধান সামন্তগোষ্ঠীগুলির নাম কী?

(গ) সগুন কাকে বলা হত?

(ঘ) তকুগাওয়া কি কোন বংশের নাম?

(ঙ) ১৮৩৭ সালে কোন্ জাহাজ ইয়োদো উপকূলে এসেছিল?

(চ) কত সালে পেরি জাপান অভিযান করেন?

(ছ) কমোডোর পেরির শর্ত অনুসারে কোন্ কোন্ জাপানী বন্দর বিদেশিদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছিল?

(জ) আমেরিকা ছাড়া কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গো জাপানের চুক্তি হয়েছিল?

(ঝ) টাউনসেন্ড হ্যারিস কোন অধিকার লাভ করেছিলেন?

(ঞ) ১৮৬৩ সালে কেন জাপানি শহর ব্রিটিশদের দ্বারা আক্রান্ত হয়?

৫৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. R. A. Wilson : Genesis of the Meiji Government in Japan, 1868-1941.
2. Vinacke : A History of the Far East in Modern Times.
3. G. L. Bernstein : Japan and the World.
4. Conrad Totman : Early Modern Japan.
5. W. G. Bearsely : The Modern History of Japan.

একক ৫৬ ❒ জাপান ১৮৬৮-১৮৮৯

গঠন

৫৬.০ উদ্দেশ্য

৫৬.১ প্রস্তাবনা

৫৬.২ সগুন শাসনের শেষ পর্যায়

৫৬.৩ মেইজি পুনঃস্থাপন ও তার গুরুত্ব

৫৬.৪ জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশ ও আধুনিকীকরণ

৫৬.৪.১ তাঁতশিল্প

৫৬.৪.২ রেশমশিল্প

৫৬.৪.৩ বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি

৫৬.৪.৪ জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজি শিল্প

৫৬.৪.৫ ব্যাংকিং

৫৬.৪.৬ শিল্পোদ্যোগীদের সামাজিক উৎস

৫৬.৪.৭ অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ

৫৬.৪.৮ মূল্যবোধের পরিবর্তন

৫৬.৫ জাপানের সংবিধান, ১৮৮৯-১৮৯০

৫৬.৬ সারাংশ

৫৬.৭ অনুশীলনী

৫৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককে জাপানের ইতিহাসের যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হল—

- সগুন শাসনের শেষ দিনগুলোতে জাপানে কী ঘটেছিল
- কীভাবে বিদেশি শক্তির চাপে সগুনকে মাথা নামাতে হয়েছিল
- সগুনের দুর্বলতা প্রকট হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের সামন্তগোষ্ঠীগুলো সম্রাটকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে সগুনতন্ত্রের পতন কেমন করে ঘটিয়েছিল

- জাপ-সম্রাটের ক্ষমতায় ফেরা বা মেইজি পুনঃস্থাপনের গুরুত্ব কী ছিল
- মেইজি জাপানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চরিত্র কী ছিল
- সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি জাপানে রাজনৈতিক পরিবর্তন কী কী ঘটেছিল এবং
- ১৮৮৯-এর জাপানি সংবিধানের কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল।

৫৬.১ প্রস্তাবনা

১৬০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তোকুগাওয়া সগুনতন্ত্র প্রথম বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ১৮৫৩ সালে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি কমোডর পেরির জাপান অভিযানের পর। জাপানের অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে সগুন সরকার পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সগুনের আধিপত্য কমে আসে এবং সেই সুযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের কয়েকটি গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৬৮ সালে জাপানের সম্রাটকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে, সগুন শাসনের অবসান হয়। জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা মেইজি পুনঃস্থাপন নামে পরিচিত।

'মেইজি' শব্দের অর্থ সভ্যতা ও জ্ঞানদীপ্তি। সগুন-উত্তর যুগে জাপানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে থাকে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাবে আর দেশজ উদ্যোগের ফলে জাপান ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে। বর্তমান এককে জাপানের এই পরিবর্তনশীলতারই একটি ছবি দেওয়া হয়েছে।

৫৬.২ সগুন-শাসনের শেষ পর্যায় (১৮৫৩-১৮৬৮)

১৬০০ সালের ২১ অক্টোবর সেকিগাহারা (Sekigahara)-র যুদ্ধে বিরোধী দাইমিয়ো গোষ্ঠীকে পরাজিত করে ১৬০৩ সালে আয়েয়াসু তোকুগাওয়া যে সগুনতন্ত্রের সূত্রপাত করেন, অষ্টাদশ শতকে অভ্যন্তরীণ কারণে তা ক্রমশ তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়। জাপানি বণিকশ্রেণীর উদ্ভব, সামন্তব্যবস্থার নানা বিধিনিষেধের কারণে তাদের বেড়ে উঠতে না পারা, কৃষক অসন্তোষ ও আন্দোলন, দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের তোজামা দাইমিওদের সঙ্গে সগুন ও তার অনুগত দাইমিওদের দ্বন্দ্ব-বিরোধ—এসবই সংকটকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৮৫৩ সালের জুলাই-এ মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যুদ্ধজাহাজ সহ কমোডোর পেরির আগমন এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগের দাবি সগুন শাসনযন্ত্র বাকুফু (bakufu)-কে নতুন সংকটের সামনে দাঁড় করিয়েছিল।

পাশ্চাত্য সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব বাকুফুকে উভয়-সংকটে ফেলল। বিগত দু'শতক ধরে তারা বিদেশিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু এখন তারা এমন সামরিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা জাপবাহিনীকে খুব সহজেই ধ্বংস করতে অক্ষম। সগুনতন্ত্রের "বয়োজ্যেষ্ঠদের" মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন আবে মাসাহিরো (Abe Masahiro)। তিনি সমস্যাটা সগুনতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত দাইমিও-র কাছে তুলে ধরে মতামত চাইলেন। বিগত প্রায় আড়াই

শতকব্যাপী সগুন-শাসনের ইতিহাসে এটি ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা। এইভাবে খোলাখুলি আলোচনার দরজা উন্মুক্ত হওয়ায় সগুনতন্ত্রের সমস্ত নীতির সমালোচনা হতে থাকল, যা আগে কখনও ভাবা যায়নি। এর ফলে অনিবার্যভাবে তোকুগাওয়ার সম্মান ও কর্তৃত্ব দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। জাপানের ইতিহাসে এই বছরগুলিকে (১৮৫৩-৬৮) "বাকুমাৎসু" (bakumatsu) বা "সগুনতন্ত্রের অবসান" বলে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু দাইমিওদের কাছে মাসাহিরোর আবেদনের ফলে কোনো জাতীয় ঐক্যে পৌঁছানো গেল না। মতামতগুলি বিদেশি-বিরোধী হলেও অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ছিল না। কারও মতে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানের কিছু সুবিধা দেওয়া উচিত, যাতে সেই বিক্রয়লবদ্ধ লভ্যাংশকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার কাজে লাগানো যায়। কেউ কেউ বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে বিদেশিদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন যাতে করে সেই সময়টা সামরিক প্রস্তুতির কাজে লাগানো যেতে পারে। অপর মত অনুযায়ী, কোনো সুবিধাই দেওয়া উচিত নয়, আর মার্কিনীদের বিতাড়িত করা উচিত। কিন্তু অবশেষে জাপ-সরকার আগ্রাসী পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দুটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়—কানাগাওয়ার চুক্তি (Treaty of Kanagawa) (৩১ মার্চ, ১৮৫৪) ও হ্যারিস চুক্তি (২৯ জুলাই, ১৮৫৮)। এইভাবে বিদেশি পুঁজিপতিদের কাঝে জাপান উন্মুক্ত হল।

এর ফলে জাপানের অভ্যন্তরীণ সংকট বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। তোকুগাওয়া পরিবারের সঙ্গে যুক্ত দাইমিওদের একটা অংশ জাপানের অভ্যন্তরে বিদেশি মিশনের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারছিল না। জাপ-সম্রাটও এর বিরোধী ছিলেন। ইতিমধ্যে কিয়োটো শহরের অভিজাতরা সগুনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

বস্তুত তোকুগাওয়া সরকারের তখন শাঁখের করাতের অবস্থা। রাদজনীতিগতভাবে বিদেশিদের এইসব সুযোগ-সুবিধা দেয়োর পক্ষে যুক্তি দেখাতে হলে তাদের এটাই বলতে হত যে, সামরিক দিক থেকে জাপান পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল। কিন্তু সেটা বলার অর্থ নিজের সামরিক দুর্বলতাকে স্বীকার করা, যা আবার সগুন-বিরোধী বিদ্রোহের সূচনা করবে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকটও ছিল গভীর। জাপানের বিচ্ছিন্নতার আকস্মিক অবসানের ফলে সগুনের অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। তোকুগাওয়া মুদ্রার মূল্যমান সেইসময় যা ছিল, মুদ্রার অভ্যন্তরে ধাতুর পরিমাণ ছিল তা থেকে কম। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের রৌপ্য মুদ্রার মূল্যমান মানতে রাজি ছিল না। তারা দাবি করল জাপ-সরকার যেন ধাতুর পরিমাণের সঙ্গে সংগতি রেখে মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করে এবং কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বেশকিছু দ্রব্যের—রেশম, চা ও তুলার চাহিদা বিদেশের বাজারে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জাপানের ভেতরে জিনিসপত্রের দাম বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রামে ও শহরে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের সাতসুমা, চো-শু তোসা, সাগা গোষ্ঠীগুলি সগুনকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করতে থাকে। সাতসুমার নিয়ন্ত্রণে যেমন জাপানের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সামুরাই বাহিনী ছিল, চো-শু নেতৃবৃন্দ সগুনের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের সমাবেশিত করে। জাপানের মানুষ তখন পরিবর্তন

চাইছেন, আসন্ন গৃহযুদ্ধে কিছুসংখ্যক চোনিন (Chonin) ব্যাংকার প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। এই সমস্ত বিরোধী শক্তি মিকাডো (সম্রাট)-র সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হল। সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা সগুনতন্ত্র দখল করেছে, তাই এই সরকারকে উৎখাত করে সম্রাটের প্রকৃত শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৮৬৭ সালে সাতসুমা বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে কিয়োতো দখল করে নেয়। ১৮৬৮ সালের শুরুতে সম্রাট মেইজি (যিনি ১৮৬৭ সালে সম্রাট কোমাই-এর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন) সগুনতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করেন। তদানীন্তন সগুন তোকুকাগা কাইকি ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও তার অনুগত বাহিনীর সঙ্গে ১৮৬৮-র জানুয়ারির শেষে তোবা ও ফুশিমি শহরে বিরোধী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিন দিনের যুদ্ধ হয়। সগুন-বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সগুনতন্ত্রের পতন জাপানের সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচনা করল। এই ঘটনা জাপানের ইতিহাসে মেইজি পুনঃস্থাপন নামে পরিচিত।

৫৬.৩ মেইজি পুনঃস্থাপন (১৮৬৮) ও তার গুরুত্ব

মেইজি পুনঃস্থাপন নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা গবেষণাগ্রন্থ লিখেছেন তাঁদের কারোর পক্ষেই এই ঘটনার কারণ ও চরিত্র সহজে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে গবেষকেরা জাপানী পুঁজিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করকতে চেয়েছেন ; একই সঙ্গে মেইজি পুনঃস্থাপনের ঘটনায় কোনো বিপ্লবী তাৎপর্য ছিল কিনা সেটাও ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী আমরা পাই—একটি কোজা হা (Koza ha), অপরটি রোনো হা (Rono ha)। কোজা হা গোষ্ঠীর মতে এই পুনঃস্থাপনের মধ্যে বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। এই গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা ঘটনাটির অনেক বড় সমালোচক ; তাঁদের মতে এটি রাজনৈতিক একনায়কত্বের ধারাকেই পুষ্ট করেছিল, এটা নতুন মোড়কে জাপানের পুনঃসামন্তীকরণ। এই চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা তোয়ামা (Toyama)। অন্যদিকে রোনো হা গোষ্ঠীর মতে এটা হল জাপানের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত। এই গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক উয়েয়ামা (Uyeama)-র মতে এই পুনঃস্থাপন ছিল জাপানের আধুনিকীকরণের প্রথম ধাপ এবং একই সঙ্গে জাপানের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবের খুব কাছাকাছি একটি ঘটনা।

ঐতিহাসিক হারুতুনিয়ান অবশ্য বিষয়টি অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, কোনো প্রতিক্রিয়াশীল উত্থান কিংবা বুর্জোয়া বিপ্লব—কোনোটাই নয়। তা সত্ত্বেও আমরা যদি এটা মনে রাখি যে, তৎকালীন লেখক ও কর্মীরা অতীতের ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহাসিক ও নৈতিক উপাদান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন, তবে আমরা ঘটনাটিকে বিপ্লবী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারব। যদিও তাঁরা দেশের পুরোনো ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং মায়াময় অতীতের উপর নির্ভর করেছেন, তবুও সম্রাটের শাসনের পুনঃস্থাপনার জন্য তাঁদের মতে একটি বিপ্লবী তাগিদ অবশ্যই কাজ করেছিল। এটা মনে রাখা দরকার যে, পুনঃস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিকট অতীতকে ধ্বংস করা। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর একটি নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং "পুরোনো মূল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে"

চেয়েছিলেন। হারুতুনিয়ানের মতে, নিকটবর্তী অতীতকে উৎখাত করার জন্য সুদূর অতীত বা ঐতিহ্যের কাছে তাঁদের যে আবেদন তার উদ্দেশ্য এমন সব পরিকল্পনা নেওয়া যা একেবারেই সাবেকী নয়। বস্তুত, যেসব মানুষেরা পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন তারা কিন্তু ঐতিহ্য দ্বারা বাঁধা ছিলেন না।

আর এক গবেষক হোরি (Y. Horie)-র মতে, মেইজি পুনঃস্থাপন এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অপর এক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, আবার শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সংঘটিত কোনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও নয়। বস্তুত এই পুনঃস্থাপনের সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার জড়িত। রাজনৈতিক পরিবর্তন দিয়ে শুরু হলেও তা কিন্তু ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নানাধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছিল এবং এইভাবে এক আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

বস্তুত সংস্কার আন্দোলনের দুটি মূল স্লোগান ছিল : প্রথম, "সম্রাটের হাতে সার্বভৌমত্ব প্রত্যর্পণ", দ্বিতীয়, "সার্বিক পুনর্গঠন (মানুষের ধ্যানধারণা ও দর্শন সহ সমস্ত ব্যবস্থা ও কাঠামো)।" এই দুটি স্লোগান ছিল পরস্পরের পরিপূরক, প্রথমটি ছিল দ্বিতীয়টি অর্জন করার হাতিয়ার।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বাকুফুকে উৎখাত করা। মেইজি পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রথমে সগুনকে সাধারণ দাইমিও-র পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় এবং তারপরে ১৮৭১ সালে অন্যান্য দাইমিওদের সঙ্গে পুরোপুরি উৎখাত করা হয়। এর অর্থ সামন্ত 'হান' (han) এলাকাগুলির অবলুপ্তি আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে সমগ্র দেশে একটিমাত্র শাসন প্রতিষ্ঠা। নতুন সরকার ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সামুরাই ও দাইমিওদের ভাতা দিতে থাকে ; কিন্তু সেই ব্যবস্থা বন্ধ করার আগে ১৮৭১ সালে সামুরাইদের যে কোনো জীবিকা বেছে নেয়োর অধিকার দেওয়া হল, এবং ১৮৭৪ সালে তাদের মধ্যে যাঁরা ভাতার উপর নির্ভর না করে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে ঢুকতে চায়, তাদের ব্যবসা শুরু করার জন্য সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কৃষিক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১৮৭২ সাল থেকে কৃষকদের যে-কোনো ধরনের চাকরিতে ঢোকার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তারা নিজেদের জমি ইচ্ছামতো হাতবদল করতে পারে। দ্রব্যে দেয় ফসল-করের বদলে অর্থে দেয় রাজস্ব-কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সামন্তবিরোধী এইসব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার পুঁজিবাদের বিকাশের পথকেও সুগম করে। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শিল্প, ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে জাপানের অর্থনীতি এক সুদৃঢ় শিল্প-বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবেষক টি. এম. হুবার মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্রের উপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, এটি একটি সামাজিক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের মূল নেতৃত্ব এসেছিল জাপানের উচ্চশিক্ষিত বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আর এই বিদ্রোহের লক্ষ্যবস্তু ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের নিপীড়ন ও মান্ধাতা আমলের সামাজিক ব্যবস্থার অবসান। অপর এক গবেষক জন হল (John Hall) দু'ধরনের সামুরাই-এর কথা উল্লেখ করেছেন : এক, যারা বংশপরম্পরায় সামন্তকাঠামোর ওপরের দিকে স্থান পেয়েছেন, যাঁদের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন "legitimising families" হিসাবে ; আর দ্বিতীয়, বিভিন্ন সংস্থার কর্মরত পরিবারগুলি ("service families"), চাকরির নিরাপত্তা যাদের অনেক কম ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi) একইভাবে

সামুরাই শ্রেণীকে উচ্চ সামুরাই ("upper samurai") ও নিম্ন সামুরাই ("lower samurai") এই দুইভাবে ভাগ করেছেন। হুবারের মতে, মেইজি পুনঃস্থাপনের সামাজিক পরিচয় বোঝার চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে সামুরাইয়ের মধ্যেকার এই বিভাজনের মধ্যে। হুবার লিখেছেন, উচ্চ সামুরাইদের রীতিনীতি, পোশাক, হাবভাব, সম্পদ, প্রভাব সবকিছুই ছিল নিম্ন সামুরাইদের থেকে আলাদা। তারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এক সামাজিক গোষ্ঠী। নিম্ন সামুরাইরা সমস্ত ধরনের পরিশ্রম করতো, আর উচ্চ সামুরাইরা শুধুমাত্র আয়েসি জীবন কাটাতো। একজন শ্রম দিতো, আর আরেকজন সেই শ্রমের ফল আত্মসাৎ করত। বস্তুত এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে পুনঃস্থাপনের তাৎপয।

৫৬.৪ জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশ ও আধুনিকীকরণ

১৮৬৮ সালে মেইজি পুনঃস্থাপন দীর্ঘ সগুন শাসনের অবসান ঘটানোর সঙ্গো সঙ্গো জাপানে সামন্ত শাসনেরও অবসান ঘটালো। বস্তুত জাপানের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গো ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

তোকুগাওয়া শাসনাধীন জাপানের শেষ পর্যায়ে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তা অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না। যদিও তত্ত্বগতভাবে সমস্ত জাতির উন্নতির জন্য দায়বন্ধতা ছিল বাকুফুর, তবুও বাস্তব হল এই যে, দেশের সামগ্রিক রাজত্বের মাত্র একটি ছোট অংশের উপরই তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। রাজস্বের বেশিরভাগ অংশ ভাগবাঁটোয়ারা হত দাইমিও পরিচালিত প্রায় ৩০০টি হান (han) ভূখণ্ডের মধ্যে। প্রয়োজনের তুলনায় সগুনের হাতে অর্থ অনেক কম থাকায় বিদেশি আক্রমণের মোকাবিলা করার মতো সামরিক প্রস্তুতিও তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত ১৮৫০ সাল নাগাদই লোকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছিল। কিন্তু এর উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসেনি। তা এসেছিল তার বিরোধী দক্ষিণ-পশ্চিমের দাইমিওদের কাছ থেকে। যে বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত ছিলেন, তা হল, দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী হতে হবে ; কিন্তু কীভাবে তা আসবে সে বিষয়ে কোনো ঐকমত্য ছিল না।

সামন্তব্যবস্থাধীন জাপানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি মনোভাব মোটেই অনুকূল ছিল না। একে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যকে নষ্ট করতে না পারে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল এই যে জাপানের অর্থনৈতিক বিকাশ ক্রমাগত এইসব বিধিনিষেধকে আঘাত করছিল এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশি বেশি মানুষ অনুভব করছিলেন। তবুও মেইজি পুনঃস্থাপনের আগে পর্যন্ত এই বিশয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি গ্রহণ করা যায়নি। ই. এস. ক্রকোর (E. S. Crawcour)-এর মতে, জাপানে সনাতনী অর্থনীতির বিকাশ সরাসরি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি। কিন্তু আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হলে যাতে তা প্রয়োগ করা যায় তাকে নিশ্চিত করেছিল এই অর্থনৈতিক বিকাশ।

ঐতিহাসিক কামেকিচি তাকাহাশি (Kamekichi Takahashi) জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গো ইউরোপের পুঁজিবাদের বিকাশের তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপে সামন্তব্যবস্থার অবসান ও

ধ্বংস এসেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে। কিন্তু জাপানে পুনঃস্থাপনের পরে এই কাজটা করতে সময় লাগে মাত্র ৮ বা ৯ বছর, এবং তা শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছিল। যে কেউ এই যুক্তি দিতেই পারেন যে তৎকালীন জাপানের পরিস্থিতি ছিল একদম আলাদা, কারণ একদিকে ছিল পাশ্চাত্যের আক্রমণের আশঙ্কা আর অন্যদিকে সগুন শাসনের অবসানের দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তেজনা। তাকাহাশির মতে, তা সত্ত্বেও যে সামুরাই শ্রেণী সামন্তব্যবস্থার দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল, সেই শ্রেণীই এই সামন্তব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। এটাই বুঝিয়ে দেয় কীভাবে অপেক্ষাকৃত এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে এই মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

বস্তুত মেইজি পুনঃস্থাপনের পরবর্তী ৪ বছর সামন্ত রাজনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করা হয় আর তারপরের ৫ বছর সামুরাই শ্রেণীর সমস্ত বিশেষ সুবিধাকে উচ্ছেদ করা হয়। প্রথমত, ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সগুন-বিরোধী বাহিনী ইডো (Edo) দুর্গ দখল করে তোকুগাওয়া সগুনতন্ত্রকে উৎখাত করে মেইজি সরকার স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, ১৮৬৯ সালের জুন মাসে সমস্ত গোষ্ঠীগুলি (clan) গোষ্ঠী জনগণনা পুস্তক (census books)-সমূহ সম্রাটের হাতে তুলে দেয়। এটা ছিল সামন্তব্যবস্থা অবসানের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক একটি ধাপ। এর অর্থ গোষ্ঠীর নেতারা আর গোষ্ঠীর শাসক থাকবে না, তারা হবেন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত গোষ্ঠীশাসক। গোষ্ঠীর রাজস্ব হল রাষ্ট্রীয় রাজস্ব। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিভিন্ন সামরিক স্তরের অবসান ঘটাল, যাদের প্রত্যেককেই সামুরাই নামে অভিহিত করা হত। তৃতীয়ত, ১৮৭০ সালে জুন মাসে জারি করা ডিক্রি অনুযায়ী গোষ্ঠীগুলির সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চতুর্থত, ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে ওঠে ; এর ফলে সামন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। পঞ্চমত, ১৮৭৬ সালের আগস্ট মাসে সরকারি বন্দ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামুরাইদের পরিবার ভাতা (family pension) প্রথার বিলোপ ঘটল।

অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সামন্তপ্রথা বিলোপ সাধনের ফলে পুঁজিবাদের অগ্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশের মতো জাপানেও পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ—উভয়ের ভূমিকা ছিল। বস্তুত জাপানে আধুনিকীকরণ ছিল রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল। কিন্তু কিছু শিল্পের আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

৫৬.৪.১ তাঁতশিল্প

তোকুগাওয়া শাসনের শেষ পর্যায়ে তোকুগাওয়া সগুনতন্ত্র এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ হান সরকার নতুন ধরনের শিল্পস্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এসবের মধ্যে কিছু শিল্প, যেমন জাহাজ নির্মাণ ও কামান নির্মাণের পিছনে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন সাতসুমা হান-এর তাঁতশিল্প—শিল্প স্থাপিত হয়েছিল সামন্ত ভূখণ্ডগুলির জন্য বাড়তি রাজস্বের প্রয়োজনে।

সাতসুমার সুতা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল ইশিকাওয়া মাসাতাৎসু (Ishikawa Masatatsu)-র উদ্যোগে টোকিও-র বণিক কাশিমা মাম্পাই (Kashima Mampei) নামে। অপর এক শিল্পোদ্যোগী এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭২ সালে তাঁর স্থাপিত কারখানাটি সাফল্যের মুখ

দেখেছিল। সরকারি উদ্যোগে আরও অনেক কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম দিকের শিল্পোদ্যোগীরা এসেছিলেন ভূস্বামী, বণিক প্রভৃতি পরিবার থেকে। উদাহরণস্বরূপ, ফুতামাতা সুতো তৈরির কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ওকাদা রিওইচিরো (Okada Ryoichiro) ছিলেন এক ধনী ভূস্বামীর পুত্র, যে ভূস্বামী গ্রামের কর্তা ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে আন্দোলন সংগঠিত করেন। কৃষির উন্নতির জন্য তাঁর নানাবিধ পরিকল্পনা ছিল, যেমন রেশম চাষের জন্য সামুরাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত তাঁতের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি আর বিভিন্ন জেলার তাঁতিদের বেশি পরিমাণে সুতো জোগান দেওয়া। গবেষক ডেন্ডা (I. Denda)-র মতে, যদিও এইসব উদ্যোগীর সামাজিক উৎস ছিল আলাদা, তবুও তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও ছিল। যেমন, তারা প্রত্যেকেই ছিল সংগতিপূর্ণ ; তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফার কথা ভাবত না। একই সঙ্গে তারা নিজেদের জেলার উন্নতির কথাও ভাবত ; তারা প্রত্যেকেই ছিল শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত।

১৮৮২ সালে প্রথম বড় আকারের সুতো তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগীর নাম শিবুসায়ো এইচি (Shibusawa Eiichi), আর কোম্পানির নাম 'ওসাকা কটন স্পিনিং কোং'। কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার যাঁরা কিনেছিলেন তাঁরা হলেন টোকিও ও ওসাকার ভূতপূর্ব ভূস্বামী ও ধনী বণিকেরা। এটি ছিল অন্যতম সফল উদ্যোগ। শিবুসাওয়া শুধুমাত্র তাঁতশিল্প নয়, রেলওয়ে, ব্যাংক প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সামাজিক উৎসের দিক থেকে তিনি ছিলেন এক ধনী কৃষকের পুত্র। বস্তুত ১৮৮০-র দশকে সোকা শহরে বহুসংখ্যক বড় আকারের কারখানা গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রাক্তন সামুরাই ও ধনী বণিকেরা।

৫৬.৪.২ রেশম শিল্প

তুলা থেকে সুতো তৈরির ক্ষেত্রে যেমন, সাতসুমা হান উদ্যোগ নিয়েছিল, তেমনি গুটিপোকা থেকে রেশম সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল মিবাশি হান (Maebashi)। তাদের কাছে এটি ছিল রাজস্ব বৃদ্ধির একটি উপায়। হায়ামি কেনসো (Hayami Kenso)-র পরিচালনায় ১৮৭০ সালে পাশ্চাত্যের আদলের একটি রেশম ফিলেচার (filature) প্রস্তুত করা হয়। ১৮৭১ সালের হান ভূখণ্ডের অবসানের পরে হায়ামি 'নিহোন্মাৎসু সিল্ক রিলিং কোম্পানি'-তে উপদেষ্টার ভূমিকা নেন। মিবাশি হানের এই উদ্যোগের পরে টোকিওতে গড়ে 'ওনো কোম্পানি' (Ono co.)-র 'সুকিজি মিল' (Tsukiji mill)। এখানে উদ্যোগী ছিলেন কিয়োতো (Kyoto)-র প্রসিদ্ধ রেশম-বণিক ফুরুকাওয়া (Furukawa), যাঁর সম্পদের পরিমাণ মিৎসুইদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। ওনোদের তৈরি এই মিলের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত মুনাফা আহরণ করা। পরবর্তীকালে ফুরুকাওয়া খনিশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করেন এবং জাপানের অন্যতম তামা ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

মিবাশি ও সুকিজি মিল দুটি এবং অন্য অনেক মিল সরকারি মালিকানায় আসে, এবং সেগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে। এইসব মিলের ম্যানেজার ও দক্ষ শ্রমিকেরা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিলেন এবং শিল্পের বিস্তারের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিদেশি বাণিজ্যের ফলে জাপান উন্মুক্ত হওয়ায় বহির্বিশ্বের বাজারে জাপানী দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। কারিগরি ও যন্ত্রের ক্ষেত্রে ছোটখাটো

পরিবর্তন আনায় গুণগত পরিবর্তন হয় অনেক বেশি। বিদেশি বাজারের বিস্তারের ফলে সমস্ত ধরনের ও আকারের রেশম ফিলেচার বর্ষার পরে সারা দেশে ব্যাং-এর ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে থাকে।

৫৬.৪.৩ বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি

শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদন। এক্ষেত্রে দুটি কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রথমটি 'তানাকা ওয়ার্কস' (Tanaka Works), পরবর্তী যা 'শিবোউরা সাইসাকুশো ইলেকট্রিক ওয়ার্কস' নামে পরিচিত। ১৮৭৫ সালে হস্তশিল্পী পরিবারের তানাকা হাসাশিগে (Tanaka Hasshige) একটি প্রতিষ্ঠা করেন। মেইজি পুনঃস্থাপনের আগে তিনি সাগা হান-এর সঙ্গে কামান নির্মাণের উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। পুনঃস্থাপনের পরে তিনি ৭৪ বছর বয়সে টোকিও শহরে এসে ব্যবসাকেন্দ্র খোলেন এবং তার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে থাকেন। তাঁর পুত্র একই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিশেষত নৌ-বাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেন।

১৮৯০ সাল হাকুনেৎসুশা (Hakunetsusha) নামে একটি কোম্পানি গড়ে ওঠে। এটি শ্বেত আলোকদায়ক লণ্ঠন (incandescent lamp) প্রস্তুত করত। এটির প্রস্তুতকারকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফুজিওকা ইচিসুগে (Fujioka Ichisuge), যিনি ছিলেন মাঝারি মাপের এক সামুরাই।

৫৬.৪.৪ জাহাজ-নির্মাণ ও জাহাজি শিল্প

জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের বিস্তারের জন্য সরকারের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল অনেক বেশি জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং লাভজনক বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা নেন কাওসাকি শোজো (Kawasaki Shozo), যিনি ছিলেন এক প্রাক্তন সামুরাই-এর পুত্র। সামুরাইটি পরে বণিকের জীবিকা গ্রহণ করেন। তিনি গড়ে তোলেন 'কাওয়াসাকি শিপবিল্ডিং ইয়ার্ড'।

একই সঙ্গে জাহাজি শিল্পের ক্ষেত্রেও সরকারের দৃষ্টি ছিল। সাবেকী ধরনের জাহাজের বিকাশ ধীরে ধীরে হচ্ছিল, আর সেটা ছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল। কয়েক বছর ধরে জাপানের উপকূলবর্তী সমুদ্র এলাকায় বিদেশি জাহাজের প্রাধান্য ছিল, আর জাপানেরও সেই পরিমাণ অর্থ ছিল না যার সাহায্যে আধুনিকীকরণ করা সম্ভব। অবশেষে 'মিৎসুমিশি কোম্পানি' এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াসাকি ইয়াতারা (Iwasaki Yatara), যিনি সামুরাই পরিবার থেকে এসেছিলেন। তিনি সরকারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পান এবং ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেন।

৫৬.৪.৫ ব্যাংকিং

তোকুগাওয়া আমলে বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত বণিকেরা অর্থ ধার দিয়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করে এবং অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের সহেগ যুক্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। মেইজি পুনঃস্থাপনের পরে প্রথম দিকে সরকার এইসব সংস্থাগুলিকে যৌথ কোম্পানি গড়ে তোলার দিকে উৎসাহ দিয়েছিল। এই ধরনের প্রথম যৌথ কোম্পানি ছিল 'কাওয়াসে কাইসা' (Kawase

Kaisha) বা বিনিময় ব্যাংক। এর অর্থ এসেছিল সরকারের তহবিল এবং পরিচালকদের তহবিল থেকে।

এর কিছু পরেই ১৮৭২ সালে আমেরিকার মডেলে জাতীয় ব্যাংক গড়ে ওঠে। প্রথম চারটি ব্যাংকের প্রাথমিক পুঁজি জোগান দেয় মিৎসুই (Mitsui), ওনো (Ono) ও ইচিজিমা-তোকুজিরো (Ichijima-Tokujiro)-র মতো সম্পদশালী বণিক পরিবারগুলি। জাতীয় ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পিছনে ভূতপূর্ব দাইমিও ও সামুরাইদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

৫৬.৪.৬ শিল্পোদ্যোগীদের সামাজিক উৎস

নব্য শিল্পোদ্যোগীদের নানারকমের সামাজিক উৎস ছিল। কেউ বণিক, কেউ হস্তশিল্পী, কেউ দাইমিও, কেউ সামুরাই। যদিও সবচেয়ে বড় ভূমিকা সামুরাইরা পালন করেছিল। হোরি-র (Horie) মতে, পুনঃস্থাপনের পরে প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ীরা এসেছিল সাধারণ পরিবার থেকে। এখানে সামুরাইদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারাই ছিল তোকুগাওয়া শাসনাধীন জাপানের শিক্ষিত অংশ। প্রথমদিকে তাদের পরিচয় ছিল যোদ্ধা হিসাবে ; কিন্তু তোকুগাওয়া আমলের দীর্ঘদিনের শান্তি তাদের মধ্যেকার যোদ্ধার মানসিকতাকে অনেকাংশে দুর্বল করে দেয়। তারা নিজেদের যোদ্ধা হিসাবে নয়, বরং সংস্কৃতিবান শ্রেণী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। তা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে তারা ছিল গরিব এবং তাদের অনেকেই বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়। তাদের মধ্যেকার অপর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে থাকে। সামুরাইদের এই অংশটাই, বিশেষত যাদের স্থান ছিল নীচের দিকে, মেইজি পুনঃস্থাপনের জন্য দায়ী, এবং এরপর থেকে তারা ব্যবসাসহ সমস্ত ধরনের নতুন উদ্যোগে অংশ নিতে থাকে।

সামুরাইদের কর্মোদ্যোগের পিছনে আর একটি কারণ ছিল। তোকুগাওয়া জাপানের সামন্ত সমাজের চেহারা এমনই ছিল যে সেখানে সম্পদ ও সামাজিক পদ কখনই সংগতিপূর্ণ ছিল না। সামন্ত অভিজাতদের জন্য সেখানে সুনির্দিষ্ট চাউল-ভাতার ব্যবস্থা ছিল, যা তারা নিজেদের পদ অনুযায়ী পেত। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনী বণিক ও কৃষকদের উপার্জন বাড়লেও সামুরাইদের, বিশেষত নীচুতলার সামুরাইদের ভাতা যেহেতু নির্দিষ্ট, তাই তার পরিমাণ একই থাকল, ফলে তারা অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়লো। এই পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থাই সামুরাইদের দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আনতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

৫৬.৪.৭ অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ

জাপানের আধুনিকীকরণ শুধুমাত্র কৃষি কিংবা শিল্পক্ষেত্রে নয়, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রেও এসেছিল। সেনাবাহিনীতে তা এসেছিল জার্মানির অনুকরণে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই আধুনিকীকরণ ছিল খুব স্পষ্ট। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানকে ৮টি শিক্ষা এলাকায় ভাগ করা হয়। এই ৮টির প্রতিটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩২টি উচ্চবিদ্যালয় থাকবে। প্রতিটি উচ্চবিদ্যালয়ে থাকবে ২১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়—প্রতি ৬০০ জনে একটি বিদ্যালয়—যেখানে ৬ বছর বয়স হওয়ার পরে প্রতিটি শিশু ১৬ মাসের বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভ করবে।

৫৬.৪.৮ মূল্যবোধের পরিবর্তন

জাপানের আধুনিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং নতুন আধুনিক পুঁজিবাদী মূল্যবোধের আগমন। প্রথমত, সামন্তসমাজে গোষ্ঠী (clan)-র স্থান ছিল সবচেয়ে উপরে ; আর পুঁজিবাদী জাপানে জাপানি জাতির স্থান হল সবচেয়ে উপরে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামাজিক পদমর্যাদা ও অবস্থান, নতুন সমাজে মানুষের গুণগত মান ছিল সবচেয়ে উপরে। তৃতীয়ত, পুরোনো সমাজ শিল্প ও বাণিজ্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত ; নতুন সমাজে সেগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং কাজে লাগানো হত। চতুর্থত, পুরোনো সমাজে চাল উৎড়পাদনের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি আর অর্থ ও মুনাফা উপার্জনকে ঘৃণার চোখে দেখা হত ; নতুন সমাজে মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর্থব্যবস্থাকে সম্মান জানানো হত।

৫৬.৫ জাপানের সংবিধান (১৮৮৯-৯০)

১৮৬৮ সালে যে মেইজি যুগের সূচনা হয়েছিল তা শুধু জাপানকে সামন্তশাসনের জোয়াল থেকে মুক্তি দেয় তাই নয়, একই সঙ্গো ধনতান্ত্রিক পথে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশকেও পরিচালিত করে। অর্থনৈতিক ভিতের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে প্রয়োজন হল উপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার। জাপানের সংবিধান ছিল উপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গা। এই সংবিধান পরবর্তী ৫৫ বছর ধরে জাপ-সরকারের আইনগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সংবিধান অবিকৃতভাবেই থাকে।

১৮৮১ সালে সম্রাটের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, ১৮৯০ সালে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হবে। ইউরোপের দেশসমূহের সংবিধান কেমন তা জানার জন্য ১৮৮২ সালে ইতো হিরোবুমি (Ito Hirobumi) নামে নিম্ন সামুরাইভুক্ত একজনকে পাঠানো হয়। প্রাশিয়ার সংবিধান তাঁকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়, তাই প্রাশিয়ার রাজতান্ত্রিক সংবিধানের আদলে তিনি জাপানি সংবিদানের খসড়া তৈরি করেন। তাঁর সুপারিশ করা খসড়ার প্রায় পুরোটাই মেইজি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮৯ সালে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৮৯০ সালে তা চালু করা হয়।

বিসলের (W. G. Beasley) মতে, এই সংবিধানের মতাদর্শগত ভিত্তি হল লোরেন্জ্ ফন স্টাইনের (Lorenz Von Stein) 'সামাজিক রাজতন্ত্রে'র তত্ত্ব, যা সমাজের ভিতরকার বিভিন্ন প্রতিযোগী স্বার্থের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করবে, শ্রেণীসংগ্রামের ঊর্ধ্বে থাকবে এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রাখবে। সংবিধান প্রস্তুতকারকদের মতে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করার অর্থ রাজদ্রোহ, কারণ তা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে। জাতীয় শক্তির স্বার্থেই এটা দূর করা দরকার। ইতোর মতে, জাপানের অন্যতম দুর্বলতার দিক হল তার ছোট আকার এবং সীমিত জনসংখ্যা ; এই উভয় দুর্বলতা দূর করতে হলে সংগঠনকে অনেক সংহত করা দরকার।

সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টটি হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (Diet)। উচ্চকক্ষ গঠিত হবে উচ্চ অভিজাতদের

দ্বারা, যারা নীচু পদের অধিকারী এবং সম্রাট নিযুক্ত কিছুসংখ্যক ব্যক্তির প্রতিনিধি। নিম্ন কক্ষের প্রতিনিধিদের যারা নির্বাচিত করবেন তাঁরা হলেন সেইসব পুরুষেরা যাঁরা ১৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে সরকারকে কর দিয়ে আসছেন। ১৮৯০ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। যে-কোনো বিল আইনে পরিণত হতে গেলে উভয় কক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। সংবিধান জনসাধারণকেও নানারকমের অধিকার দিয়েছিল, যেমন ধর্ম, মতপ্রকাশ, প্রকাশনা, জনসভা ও সংগঠন করা, সম্পত্তির উপর অধিকার—এসব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

রিওসুকে ইশি (Ryosuke Ishii)-র মতো গবেষকেরা এই সংবিধানকে কিছুটা নমনীয়তা বিশিষ্ট একটি রাজতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সংবিধান সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতা এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তির (Oligarchy) ক্ষমতা বজায় রেখেছে। বস্তুত সংবিধানটি এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যেন এটি জাপানিদের কাছে সম্রাটের দেওয়া উপহার, এবং এই সংবিধান পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে প্রাথমিক পদক্ষেপ তা নেওয়ার অধিকার একমাত্র সম্রাটেরই আছে। সংবিধানে লিখিত আছে যে জাপানি সাম্রাজ্য সম্রাটের দ্বারা বংশপরম্পরায় শাসিত হবে। রাজকীয় ডায়েটের (Diet) সম্মতি নিয়ে সম্রাট সমস্ত প্রশাসনিক ও আইনগত কর্তৃত্বের অধিকারী থাকবেন। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান সম্রাট নিজে। প্রত্যেক মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজের জন্য সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সম্রাটের পরিবারের ভরণপোষণ সংক্রান্ত বাজেটের উপর ডায়েটের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

বস্তুত সংবিধানের মধ্যে নানাধরনের পরস্পরবিরোধী দিক থাকা সত্ত্বেও সেইসময়ে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রাখার ক্ষেত্রে এটি সফল হয়েছিল। কোনো কোনো গবেষকের মতে এই সংবিধানে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফেয়ারব্যাংক (Fairbank) এবং অন্যান্য গবেষকেরা বলেন যে, এই ধারণাটা এসেছে পরবর্তী যুগে। সেইসময় পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়েই নানাধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল। যদি আমরা সেইসময় ক্ষমতাসীন লোকেদের সামন্ত অতীত ও কর্তৃত্বমূলক অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় জাপানের নাগরিকদের পরিচয় না থাকার কথা মাথায় রাখি, তবে এটাকে একটা উদারনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। বিরোধী পক্ষ এই সংবিধানে সন্তুষ্ট না হলেও তাদের ন্যূনতম দাবি তা মিটিয়েছিল এবং তাদের এই ছাড় দিতে গিয়ে সংবিধান নির্মাতারা রক্ষণশীল শক্তিকেও পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দেননি। এই ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সংবিধানটি সম্রাটের পেশ করা বলে তার সঙ্গে পবিত্রতা জড়িয়ে ছিল। এইসব কারণে কোনো পক্ষই কঠোরভাবে এর সমালোচনা করতে পারেনি।

সংবিধানটিকে অন্যদিক থেকেও সমালোচনা করা যায়। সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে কিছু দ্ব্যর্থকতা ছিল। একদিকে যেমন মনে হত যে সর্বক্ষেত্রে সম্রাটের কর্তৃত্ব বিরাজমান, অন্যদিকে বাস্তব হল এই যে, সম্রাট ছিলেন এক প্রতীকমাত্র। যতক্ষণ 'Oligarch'-রা সম্রাটের নামে কাজ করতেন ততক্ষণ তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সংবিধানের কোথাও এই ছোট Oligarch গোষ্ঠীর উল্লেখ ছিল না। এই লোকগুলি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরে যাওয়ার পরে জটিলতা দেখা দিল। এটা স্পষ্ট ছিল না যে, সরকারের কোন্ কোন্ অঙ্গ সম্রাটের নামে শাসন করবে। উদাহরণস্বরূপ, 'Oligarch'-রা না থাকলে কারা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবে ?

ঐতিহাসিক ম্যাকলারেন (W. W. McLaren)-এর মতানুযায়ী সাংবিধানিক রাজতন্ত্র আসলে চূড়ান্ত রাজতন্ত্র (absolute monarchy) থেকে সীমিত রাজতন্ত্রে (limited monarchy) পরিবর্তনকেই বোঝায়। কিন্তু এই মতামত থেকে এটা বোঝা যায় না যে, মেইজি যুগে জাপানি সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সঙ্গো সম্পৃক্ত যে সামন্তব্যবস্থা তার স্থলে এসেছিল নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা যা মূলত ছিল পুঁজিবাদী চরিত্রের।

৫৬.৬ সারাংশ

১৮৬৮ সালে মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। এর ছাপ পড়ে জাপানের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির ওপর। সামন্তপ্রভুদের দিন শেষ হয়ে যায়, দাইমিও-সামুরাইদের এতদিনকার বনেদি আধিপত্যের অবসান ঘটে। সম্রাটের প্রকৃত বা প্রতীকী পৌরোহিত্যে বেশ কিছু জাপানি নেতা কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠেন। তাদের লক্ষ্য ছিল জাপানের অর্থনীতি ও সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। তারা বুঝতে পেরেছিলেনত্ত—সমাজ, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নত য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গো পাল্লা দেয়োর একমাত্র উপায় হল জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। এর অন্যতম ফল ছিল সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অবসান ও পুঁজিবাদী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল ১৮৮৯ সালে গৃহীত জাপানের সংবিধানে। এই সংবিধান জাপানে সামাজিক রাজতন্ত্র, সাংবিধানিক গণতন্ত্র না সীমিত রাজতন্ত্রের সূচনা করেছিল—এই নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সঙ্গো সম্পৃক্ত সামন্তব্যবস্থার জায়গায় অবশ্যই জাপানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি হয়েছিল ১৮৮৯-এর সংবিধানের মাধ্যমে।

৫৬.৭ অনুশীলনী

১। সগুনতন্ত্রের পতনের জন্য কমোডোর পেরির আগমন কতটা দায়ী বলে আপনার মনে হয়?

২। ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনঃস্থাপনের চরিত্র ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে মেইজি পুনঃস্থাপনের কোনো ভূমিকা আছে কি?

৪। জাপানের আধুনিকীকরণ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল?

৫। জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গো আধুনিকীকরমের সম্পর্ক কী?

৬। জাপানে সামন্তব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব ছিল কি?

৭। জাপানি সংবিধানের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

টীকা লিখুন :

১। বাকুফু ২। মেইজি শাসনাধীন জাপানের তাঁতশিল্প ৩। সামুরাই ৪। মেইজি শাসনে শিল্পোদ্যোগীদের সামাজিক উৎস। ৫। জাপানি সংবিধানের চরিত্র।

৫৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। সিদ্ধার্থ গুহরায় : চীন ও জাপানের ইতিহাস।

২। দেবপ্রসাদ চৌধুরী : দূরপ্রাচ্যের ইতিহাস।

৩। Richard Storry : A History of Modern Japan.

৪। K. Takahashi : The rise and development of Japan's Modern economy.

৫। W. W. Lockwood (ed) : The state and economic enterprise in Japan.

৬। T. M. Huber : The revolutionary origins of modern Japan.

৭। W. G. Beasley : The Modern history of Japan.

৮। Perry Anderson : Lineages of the absolutist state.

একক ৫৭ ❒ চীনে সংস্কার আন্দোলন থেকে অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (১৮৯৮-১৯১১)

গঠন

৫৭.০ উদ্দেশ্য
৫৭.১ প্রস্তাবনা
৫৭.২ ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন
৫৭.৩ সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা ও প্রভাব
৫৭.৪ ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহই হো-তুয়ান বিদ্রোহ
    ৫৭.৪.১ বক্সারক বিদ্রোহের কারণ
    ৫৭.৪.২ বক্সার বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য
    ৫৭.৪.৩ বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতি
    ৫৭.৪.৪ বক্সার বিদ্রোহের লক্ষ্য ও সাফল্য
৫৭.৫ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (১৮৬৬-১৯২৫) ও ১৯১১ সালের অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব
    ৫৭.৫.১ বিপ্লবের পটভূমি
    ৫৭.৫.২ বিপ্লবের প্রস্তুতি
    ৫৭.৫.৩ সান-ইয়াৎ-সেনের রাজনৈতিক আদর্শ
    ৫৭.৫.৪ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা
৫৭.৬ উপসংহার
৫৭.৭ সারাংশ
৫৭.৮ অনুশীলনী
৫৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যয়ন করার পর আপনি যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন তা হল—

- পশ্চিমী শক্তির চীনে অনুপ্রবেশের পর চীনা জনগণের প্রতিক্রিয়া।
- বিদেশি প্রভাব বিস্তার রোধ করার জন্য চীন দেশে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস।
- পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে চীনাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যা বক্সার আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।
- ১৯১১ সালে বিপ্লবী নায়ক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

৫৭.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চীনের দুর্বল মাঞ্চু রাজতন্ত্র রাষ্ট্রকে সক্রিয় নেতৃত্বদানে অপারগ হয়ে পড়ে। জরাগ্রস্থ এই রাজতন্ত্র পশ্চিমী আগ্রাসনকে রোধ করতে পারেনি। ইঙ্গো-চীনা অহিফেন যুদ্ধের পর ১৮৪২ সালে সম্পাদিত নানকিং-এর সন্ধি মাঞ্চু রাজতন্ত্রের জয়প্রিয়তা অনেকটাই হ্রাস করেছিল। এই সময় স্থানে স্থানে বিদ্রোহের মাধ্যমে গণ-অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে। এই বিদ্রোহ তরঙ্গের চরম পরিণতি ছিল তাইপিং বিদ্রোহ। চীনা সরকারের এই দুর্দিনে পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি নিজ সুবিধার্থে অনেক অন্যায় সুবিধা আদায় করে নেয়। চীনা জনগণ নিজ বাসভূমিতে কোনো প্রকার সুবিধা, সুবিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। চীনা সমাজ-ব্যবস্থার কৃষকশ্রেণী ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত শ্রেণী। রাজস্ব ব্যবস্থার অরাজকতা, কৃষিযোগ্য জমির অপ্রতুলতার জন্য কৃষকশ্রেণী প্রায় অর্ধদাসে পরিণত হয়েছিল। সরকারি পক্ষ থেকে কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এই সময় যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হল তাতেও জনসমর্থনের বিষয়টি অবহেলিত ছিল। তাই জনসমর্থনে অভাবে সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

এরপর চীন বক্সার বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই বিদ্রোহ গুপ্ত সমিতি দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল বিদেশিরা। নানা কারণে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বিদেশি নিষ্পেষণ আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকের সূচনায় চীনা জনসংখ্যা বিস্ফোরক হারে বৃদ্ধি পায় (১৮৮৫-১৯১০ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩০ মিলিয়ান), খাদ্যাভাব দেখা দেয়, জমির উপর চাপ পড়তে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ক্ষতিপূরণদানের সমস্যা। চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির অর্থ দিতে গিয়ে মাঞ্চু রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। এই অর্থাভাব মেটাতে গিয়ে সরকার বাড়তি করের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেন ফলে জন-অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এই সময় বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিন-পাও (Min-Pao) সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে। সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে টুং-মেং-হুই বা সম্মিলিত দল ছিল বিপ্লবের কর্ণধার। তিনিই জাতীয়তাবাদী সংগঠিত করে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১১ সালে চীনে স্থাপিত হয় প্রজাতন্ত্র। এই জন্য সান-ইয়াৎ-সেনকে আধুনিক চীনের জনক বলা হয়।

৫৭.২ ১৮৯৮-এর সংস্কার আন্দোলন

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রথমে ইংলন্ড এবং পরে অন্যান্য পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী শক্তির হাতে চীনের মাঞ্চু সকরারের উপর্যুপরি পরাজয় এবং একটির পর একটি অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে চীন দেশের সামগ্রিক চরিত্রে পরিবর্তন আসে। দেশটি সমস্ত অবস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশে পরিণত হয়। চীনা ভূস্বামী, মুৎসুদ্দি, বমিক পুঁজিপতি এবং পরে শিল্প পুঁজিপতি ও অন্যান্য সহযোগী গোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার-শাসিত রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম ও মেইজী পুনঃস্থাপন পরবর্তী জাপান চীনের সুবিশাল

ভূখণ্ডকে তরমুজের মতো নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ-বাটোয়ারা করতে শুরু করে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজদেশের সর্বক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রিণ ক্রমশ সংহত হতে থাকে। চীনের ৮২টি সমুদ্র তীরবর্তী ও আভ্যন্তরীণ বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করতে চীন সরকারকে তারা বাধ্য করে এবং সেগুলির মধ্যে ১৬টি শহকরে তারা "Concession" এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে। চীনের অভ্যন্তরে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের আর্থিক মূল্য ২০০ কোটি রৌপ্য ডলার ছাড়িয়ে যায়, যা ছিল চীনের জাতীয় পুঁজিপতিদের মোট বিনিযোগের ১০ ভাগ বেশি। এইভাবে বিদেশি পুঁজিপতিরা চীনের ভাষা শিল্প, যাতাযাত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পণ্যের বাজারের ৮০ থেকে ৯০ ভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ কামেয় করতে সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে শিল্পপুঁজি লগ্নী পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে বিদেশি পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পরে ১৮৯৭ সালে শিমোনোসেকির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে শুধু জাপান নয়, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশসমূহও চীনের অভ্যন্তরে কারখানা স্থাপন, রেলপথ নির্মাণ, খনি উন্মোচন এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অধিকার আদায় করে। সেইসঙ্গে প্রচুর অর্থ ধার দেওয়া ও পুঁজি রপ্তানির অধিকারও কায়েম করে। এর ফলে চীনের অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের রক্ষাকবচগুলি ধ্বংসপ্রাপ্তক হয় এবং বিদেশি অনুপ্রবেশের পথ আরও বেশি সুগম হয়। এখানেই শেয় নয়। বিদেশি মিশনারিরা ছলে, বলে, কৌশলে বহুসংখ্যক চীনাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করায় শুধু যে চীনা ভূখণ্ডে ভাহন দেখা দেয় তাই নয়, চীনের জাতীয়তাবোধও ধাক্কায় খায়। বিদেশি যুদ্ধজাহাজগুলিও একই সঙ্গে চীনের আভ্যন্তরীণ জলপথে প্রবশে করে এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রিণ কায়েম করতে থাকে।

বিদেশি পুঁজির এই বাধাহীন অনুপ্রবেশ চীনের অভ্যন্তরে সামাজিক দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। সামন্ত শাসকশ্রেণী ও বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধসংগ্রাম ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাইপিং বিদ্রোহ দমন করা হলেও চীনা জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম কখনও বন্ধ করা যায়নি। ১৮৭০ এবং ১৮৮০ এর দশকে গুপ্ত সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং সেগুলির নেতৃত্বে দেশের সর্বত্র গণসংগ্রাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৯০-এর দশকে নানা ধরনের কর চাপানোর বিরুদ্ধে শহুরে গরিব মানুষ ও কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং চীনের কিয়াংসি, কিয়াংসু, কেকিয়াং, আনহোয়েই, হুনান এবং অন্যান্য প্রদেশে বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারি, চার্চ ও চীনা-খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে। এই সময়ে ১৮৮০-এর দশক থেকে কেক বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই আন্দোলন রসদ পেয়েছিল চীনে জাতীয় পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ থাকে। এই নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ভূস্বামীশ্রেণী থেকে আসা কিছুসংখ্যক অফিসার এবং বুদ্ধিজীবীরাও যোগ দিয়েছিলেন। এই নতুন আন্দোলনের উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন পুরোনো কুনফুসীয় শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর অনুসন্ধান এবং পাশ্চাত্যের পৃথিবী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তাঁদের মতে, এইভাবেই চীনের সমস্যাবলির সমাধান এবং সামাজিক দ্বন্দ্ববিরোধকেও প্রশমিত করা যাবে। ১৮৯৮-এর এই আন্দোলন সংস্কারবাদী আন্দোলন বা একশত দিনের সংস্কার নামে পরিচিত। বস্তুত একশত দিনের সংস্কার নামে পরিচিত হলেও, এর মোট সময়কাল ছিল ১০৩ দিলেন (১১ জুন ১৮৯৮—১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)। এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন কাং ইউ ওয়েই।

১৮৯৫ সালের মে মাসে ১৩০০ জন বুদ্ধিজীবী সম্রাটের কাছে একটি দাবিসনদ পাঠান। সনদটি কাং ইউ-ওয়েই-এর লেখা। তাঁদের দাবিগুলি ছিল এইরকম ঃ শিমোনোসেকির চুক্তি কার্যকরী করা চলবে না, এই চুক্তি স্বাক্ষর করার দায়ী ব্যক্তিদের সরিয়ে দিতে হবে, সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং নানাবিধ সংস্কার করতে হবে। এই সংস্কারগুলির মধ্যে ছিল আর্থিক, ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত ও ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংস্কার, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি উৎসাহপ্রদান ; কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে সরকারি সাহায্য প্রদান, নতুন নতুন বিদ্যালয় ও পাঠাগারক স্থাপন, পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রভৃতি।

ভৌগোলিকভাবে এই আন্দোলন যেভাবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় এলাকাগুলি ছিল নিম্ন ইয়াংসি অর্থাৎ কিয়াংসু, কিয়াংসি, চেকিয়াং প্রভৃতি এলাকা, কোয়াংটুং, হুনান ও চিলি (হোপেই)। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।

নিম্ন ইয়াংসি এলাকার প্রদেশগুলিতে শিল্পায়ন বেশ দ্রুততালে অগ্রসর হচ্ছিল এবং সেখানে সংস্কারবাদী অংশ গড়ে উঠেছিল। মূলত ব্যবসায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবী ও অফিসারদের নিয়ে। এইসব এলাকায় মূল দৃষ্টি ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকে। এই সমস্ত মানুষেরা সাধারণভাবে মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন। অন্যদিকে কোয়াংটুং প্রদেশের গোষ্ঠীভুক্ত সংস্কাবাদীরা যুক্ত ছিলেন বিদেশে বসবাসকারী ধনী বণিকদের সঙ্গে এবং আমলাতন্ত্রের মধ্য থেকে আসা সদস্যের সংখ্যা বেশ কম ছিল। তাই এই অংশ দাবিদাওয়া নিয়ে অনেক বেশি সরব ছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে জঙ্গি অবস্থান গ্রহণ করেন। সংস্কার আন্দোলনের অপর কেন্দ্র হুনান প্রদেশে মূল শক্তি ছিলেন অফিসারেরা। তাঁরা মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোর দিতেন এবং তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে জঙ্গি অংশ। হুনানের ভূস্বামীরা ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নীচু তলার মানুষদের বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে. এই শ্রেণীর একটি অংশ সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন জানান। নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী এই আন্দোলনের অংশীদার হয়েছিল। কারণ পুরোনো সামন্ত সমাজের অস্তিত্ব তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত করছিল। কিন্তু ভূস্বামীদের এই অংশটির সমর্থনের কারণ ছিল এই যে শিমোনোসেকিন চুক্তি, মাঞ্চু শাসকদের ভূমিকা চীনে এক জাতীয় সংকট এনেছিল। সম্ভবত এইজন্য হুনানের সংস্কাবাদীরা মতাদর্শগতভাবে বিষয়টিকে দেখার উপর জোর দিতেন।

সংস্কার আন্দোলন যখন বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, যখন কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ্ এর মতাদর্শভিত্তিক গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁদের অন্যতম কাং ইউ-ওয়েই। কোয়াংটুং প্রদেশের এক ভূস্বামী আমলা পরিবারে জন্ম হয়। ১৮৯১ সালে ক্যান্টনে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে তিনি কনফুসীয় মতাদর্শের নতুন ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা শিক্ষা দিতেন। কনফুসিয়াসের রচনা অধ্যয়নের সাথে সাথে তিনি সেইসব রচনার উপর গং ইয়াং-এর টীকাও অধ্যয়ন করতেন। কাং তাঁর লেখা দুটি প্রধান নিবন্ধে নিজের ব্যাখ্যার উপস্থাপনা করেন। তার একটি ‘চিরায়ত সাহিত্যের পর্যালোচনা’, অপরটি ‘সংস্কারক কনফুসিয়াস।’ তাঁর চিন্তায় মানবসভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগতি তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রথমটি ‘বিশৃঙ্খলা’র যুগ, দ্বিতীয়টি ‘আসন্ন শান্তির যুগ’ আর তৃতীয়টি ‘মহান শান্তি’

(তাইপিং)-র যুগ, যে যুগে 'মহান ঐক্য' গড়ে ওঠে। তৃতীয় যুগে সমস্ত অসাম্য দূর হয়, সরকারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় আর মানুষেরা সুখে, শান্তিতে, সহমর্মিতায় বসবাস করে।

কাং ছাড়া অন্য যেসব চিন্তাবিদ্ চীনের ইতিহাসে একই ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা হলেন ইয়ান ফু, তান সি-তুং, লিয়াং চি-চাও এবং আরও অনেকে।

সংস্কারবাদীদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তার ফলে একটি সাধারণ কর্মসূচী গড়ে তুলতে তারা সক্ষম হন। এই কর্মসূচী ধীরে ধীরে বিভিন্ন নিবন্ধে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে একটি স্পষ্ট চেহারা নেয়। দর্শন, রাজনীতি, শিক্ষা এবং অর্থনীতি ছিল এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।

রক্ষণশীলদের মতে, প্রচলিত ব্যবস্থা স্বর্গের ইচ্ছায় হয়েছে, আর তাই স্বর্গের মতো এটি অপরিবর্তনশীল। আইন পরিবর্তন করা অর্থহীন, কারণ আইন নয়, বরং সম্রাটই সুষ্ঠু সরকার গড়ে তুলছেন। অন্যদিকে, সংস্কারবাদীরা ছিলেন বিবর্তন ও নিরন্তর অগ্রগতির ধারণার প্রবক্তা, যে ধারণা চীনদেশের চিন্তাজগতে প্রায় অজানা ছিল। রক্ষণশীলরা ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং সম্রাটের পবিত্র ক্ষমতার সমর্থক। অন্যদিকে সংস্কারবাদীরা গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন না ; তাঁর ছিলেন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রবক্তা, যেখানে একটি উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠী জাতীয় পার্লামেন্ট ও আঞ্চলিক সভার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হবে না।

উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠীর বিস্তার এবং জাতির শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংস্কারবাদীরা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় উৎসাহ দিতেন এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলির উপর থেকে বিধিনিষেধ দূর করার কথা বলতেন, যাতে সেগলি বাধাহীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। তারা সেইসব বিদ্যালয় চালু করার পক্ষপাতি ছিলেন যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং বিজ্ঞান যেখানে বাড়তি গুরুত্ব পাবে।

সংস্কারবাদীদের চিন্তাক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা ছিল, তা হলো সামাজিক মিশ্রতার প্রতিফলন। এই আন্দোলনের জন্ম এক সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। সেইসময় যে নতুন শিল্পপুঁজির জন্ম হচ্ছিল, অংশত সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে এর সূত্রপাত, কিন্তু আন্দোলন একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পরে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা প্রথম থেকেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেও এর সদস্যদের সংখ্যাগুরু অংশই ছিল স্কলার-বুদ্ধিজীবী ও অফিসাররা। সাবেকী শিক্ষিত লোকেরা সংস্কাবাদী চিন্তাকে আত্মস্থ করেন এবং তাঁদের অনেকেই আধুনিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে শুরু করেন।

এইভাবে সাবেকী শিক্ষিতশ্রেণীর রূপান্তর শুরু হয়। বণিক ক্রমেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল। অফিসাররা জমির সঙ্গো সঙ্গো শিল্প ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করা শুরু করল। গ্রাম্য স্কলার-বুদ্ধিজীবী শহুরে বুদ্ধিজীবীর চরিত্র পেল। কিন্তু চীনের জনজীবনে পুরোনো সামন্ত শাসনের প্রাধান্য বজায় থাকল। প্রতিটি মানুষই পারিপারিক, ব্যক্তিগত, কর্মজগতের এমন এক পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, যেখানে সনাতনী নীতির সঙ্গো আধুনিক যুগের নীতিও যুগপৎ অবস্থান করত।

১৮৯৭ সালের শেষভাগে সংস্কারবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি তীব্র আকার ধারণ করে। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে কাং সম্রাটের কাছে পঞ্চম দাবিসনদ পেশ করেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরেন, কারণ তাঁর মতে সেইটাই ছিল দেশ ও ক্ষমতাসীন মাঞ্চু বংশকে আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে গড়ে ওঠে "জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতি", যা ছিল রাজনৈতিক দলের ভ্রূণের মতো। ১৮৯৮ সালের ১১ জুন সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত অনুশাসন (edict) দ্বারা "জাতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত'২ প্রকাশিত হয়। এটাই ছিল একশত দিনের সংস্কার আন্দোলনের সূচনা, যা ১০৩ দিন পরে ১৬ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়।

১৮৯৮-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী বহুসংখ্যক অনুশাসন ঘোষিত হয়। এগুলির লক্ষ্য ছিল প্রশাসন, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন। বহুসংখ্যক অপ্রয়োজনীয় অফিস ও পদ অবলুপ্ত করা হয়। মাঞ্চুদের যে সব ভাতা দেওয়া হত, সেগুলি বন্ধ করা হল। সমস্ত অফিসার ও প্রজাদের সরাসরি সম্রাটের কাছে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সমস্ত পুরানো শিক্ষায়তন এবং মন্দির, যেগুলি আর ব্যবহার করা হয় না, সেসব বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান ও রাজনীতি শিক্ষা চালু করা হয় এবং সেগুলি পরীক্ষার বিষয়ভুক্ত হয়। অধ্যয়ন সমিতি ও পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। সেইসঙ্গো সরকারি বাজেট প্রস্তুত করা এবং সরকারের আর্থিক বিবৃতি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়। শিল্পসংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিদের ও অস্ত্রকারখানা স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এই একশ' দিন ধরে ভূতপূর্ব সম্রাটের বিধবাপ্নী সম্রাজ্ঞী জু সি বর্তমান সম্রাট কুয়াং সু-এর সংস্কারমূলক অনুশাসনে কোনোপ্রকার বাধা দেননি। তার কারণ, মাঞ্চু-বিরোধী গণ-বিস্ফোরণকে প্রতিহত করতে গেলে তাছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তিনি গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে সম্রাট তাঁকে হত্যা করতে চান এবং বিদেশি শক্তিবর্গ যেকোন সময়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে তিনি সম্রাট কুয়াং সু-কে বন্দি করলেন এবং সংস্কারবাদী নেতাদের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হল। একই সঙ্গো পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অনুশাসন ছাড়া অন্য সমস্ত অনুশাসনই বাতিল বলে ঘোষণা করা হল।

৫৭.৩ সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা ও প্রভাব

সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা গণ-সহানুভূতির সৃষ্টি করলেও সমাজের মধ্যে এর সমর্থন খুব কমই ছিল। সমর্থন আরও কমে যায় এই কারণে যে সংস্কারবাদীরা বহুসংখ্যক স্কলার-বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। তাছাড়া সংস্কার-কর্মসূচীতে কৃষিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করা হয়েছিল, যদিও তা দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গো মূলগতভাবে জড়িয়ে ছিল। সংস্কার আন্দোলনের নজর ছিল উঁচুতলার মানুষদের স্বার্থরক্ষার প্রতি। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সংস্কারবাদীরা ক্ষমতায় আসার

ফলে চীনের অভ্যন্তরে সুযোগসুবিধা আদায় করা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়নি। সংস্কারবাদীদের ঘোষিত বিদেশি অনুপ্রবেশের বিরোধিতার নীতি আর একই সঙ্গো তাঁদের পশ্চিমীকরমের পক্ষে বক্তব্য জনগণের কাছে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়েছিল। চীনা কমিউনিস্ট গবেষকদের মতে, যেহেতু এই আন্দোলন শক্তিশালী গণআন্দোলনের উপর ভিত্তি করেনি, তাই তার ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। ডবলিউ ফ্যাংক-এর মতে গণ-সমর্থন ছাড়াও এই আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল, যদি আন্দোলনের নেতারা আরও বেশি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নিয়ে সাম্রাজ্ঞীকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করতেন। কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকদের মতে, সংস্কার চারিত্রিক দিক দিয়েই প্রতিক্রিয়াশীল ; এটা শুধু যে সামাজিক বিপ্লবের বিরোধী তাই নয়, এর উদ্দেশ্য হল কিছু সুযোগসুবিধা নিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাং ও লিয়াং তাইপিং বিদ্রোহের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে সেটা একটা শিক্ষার মতো, আর বর্তমানে প্রতিনিয়ত চীনদেশে যেসব গণবিক্ষোভ আন্দোলন চলছে, সেসবই সাবধানবাণীর মতো। এই ধরনের মনোভাব ও বক্তব্য সংস্কারবাদীদের জনগণের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, যার ফলে তাঁরা পুরোনো শক্তিগুলিকে হারাবার মতো কোনো সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু খুঁজে পায়নি।

সংস্কার আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও, দেশের উপর তা একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, কারণ তা শিক্ষিত চীনাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং নতুন ধ্যানধারণার সঙ্গো পরিচিত হতে সাহায্য করে। তাঁদের অধিকাংশই ধীরে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং সীমিত লক্ষ্যের দিকে নজর দেন, যা সরকারের হস্তক্ষেপ বদলে ব্যক্তির ভূমিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসব লক্ষ্যের মধ্যে ছিল আধুনিক ব্যবসা বা বিদ্যালয় স্থাপন, কিংবা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রভৃতি। কিন্তু সংস্কারবাদীদের মধ্যে অপর এক অংশ ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ব্যর্থ হতে বাধ্য ; এই অংশ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এঁদের নেতা ছিলেন সাং-ইয়াৎ-সেন।

৫৭.৪ ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ/ই হো-তুয়ান বিদ্রোহ

চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পরে চীনের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ আরও বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে চীনা জনগণের প্রতিরোধও তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের পূর্ববর্তী সংস্কার আন্দোলনের মতো কোনো উচ্চশ্রেণীর 'এলিট' চরিত্র ছিল না। এর নেতৃত্বে ছিল গুপ্ত সমিতিগুলি। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে এটি ছিল কৃষক আন্দোলন, যার সঙ্গো চীনের কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একই সঙ্গো এটি বিদেশি মিশনারি এবং চীনা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও ছিল।

৫৭.৪.১ বক্সার বিদ্রোহের কারণ

ঊনবিংশ শতকে বিদেশি বাহিনীর বিরুদ্ধে যেসব কৃষক প্রতিরোধ দেখা যায় তা সবই ছিল বিক্ষিপ্ত চরিত্রের। এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের কার্যকারিতা খুব অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৮৪১ সালে ক্যান্টনের নিকটবর্তী এলাকায় ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলকে কৃষকবাহিনী উৎখাত করে।

১৮৮৪-৮৫ সালে টংকিং ও দক্ষিণ চীনের সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষ্ণপতাকা গোষ্ঠী ফরাসি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই সমিতির সদস্যরা ছিল অংশত কৃষক, অংশত ভাড়াটে বাহিনী ; কিন্তু এক ধরনের প্রাক্-জাতীয়তাবোধ তাদের এই প্রতিরোধ-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮৯০-এর দশকের শেষভাগে মাঞ্চুরিয়া সংযোগকারী রেলপথ নির্মাণের সময় রুশ আধিপত্যবাদীরা মাঞ্চুরিয়ার লাল দাড়ি গোষ্ঠীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। এই সবই ছিল বিচ্ছিন্ন, ছড়ানো-ছিটোনো ঘটনা।

পশ্চিমী কারিগরি জ্ঞান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কৃষক বিরোধিতার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিক্ষিপ্ত চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে যে 'লাডাইট' আন্দোলন বা যন্ত্রপাতি ভাঙার আন্দোলন দেখতে পাওয়া যায়, সেই একই জিনিস চীনেও ঘটেছিল। তবে চীনের সঙ্গো ব্রিটেনের এক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। চীনের 'লাডাইট' আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে ঘটেনি ; এর পিছনে একই সঙ্গো জাতীয়তাবোধের রাজনৈতিক তাগিদও কাজ করেছিল। আধুনিক কারিগরি কৌশল বাতিল করা হয় শুধুমাত্র এইজন্য যে সেগুলি বেকারির কারণ ; সেটা আরও এইজন্য যে সেগুলি বিদেশি। ক্যান্টনের বন্দরের নিকটবর্তী গ্রামীণ জেলাগুলির পশম বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি ১৮৮০-এর দশকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। শহরাঞ্চলের চেহারাও ছিল একই রকম। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে কারখানা ভেঙে ফেলার নানা ঘটনা ঘটতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের প্রভাব চীনের মানুষের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তীব্র হলেও পরোক্ষ ছিল। যেক্ষেত্রে চীনা কৃষেকরা সরাসরি পাশ্চাত্যের সঙ্গো যুক্ত ছিল তা হল বিদেশি খ্রিস্টান মিশনের সঙ্গো। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা বহু সংখ্যক চীনাকে ধর্মান্তরিত করেছিল। ধর্মান্তরিত চীনাদের কাছে খ্রিস্টধর্মমত গ্রহণ করার পিছনে যেসব আকর্ষণ কাজ করেছিল, তার মধ্যে ছিল পুলিশের সঙ্গো ঝামেলা বাধলে নিরাপত্তা পাওয়া, দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ইত্যাদি। বিদেশি মিশনগুলি বহুক্ষেত্রেই জোর করে চীনা শিশুদের নিয়ে এসে ধর্মান্তরিত করত। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।

১৮৬০ সালের পর থেকে মিশনারি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। মিশন ভবনগুলি আক্রান্ত হয়, চার্চ ধ্বংস হয়, চীনা খ্রিস্টানদের আক্রমণ করা এই ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৯১ সালে ইয়াংসি উপত্যকার ছোট ছোট শহর ও গ্রামীণ বাজার এলাকায় খ্রিস্টান-বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এই আন্দোলনগুলিকে মূলত কৃষক ও শহুরে গরিব মানুষেরা অংশ নিলেও আঞ্চলিক ভূস্বামী-জেন্ট্রি শ্রেণীর লোকেরাও বিদেশিদের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্ররোচিত করতে থাকে, তারা কৃষকদের অস্ত্র সরবরাহ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুপ্তসমিতিগুলিও সক্রিয়ভাবে খ্রিস্টান-বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ নেয়।

এইসমস্ত ধরনের ঘটনাবলির ফলশ্রুতি বক্সার অভ্যুত্থান। ধর্মীয় কারণে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অসন্তোষ, প্রাক্-জাতীয়তাবাদী মনোভাব, গুপ্তসমিতির সক্রিয় ভূমিকা, আধুনিক কারিগরি কৌশলের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 'লাডাইট' ধাঁচের যন্ত্র ধ্বংস করার আন্দোলন এবং আঞ্চলিক ভূস্বামীদের সনাতনী, পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাব—এই সবই এই অভ্যুত্থানকে সম্ভব করে তুলেছিল।

৫৭.৪.২ বক্সার বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

১৮৯৫ সালের মে মাসে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বিদেশিরা সিচুয়ান আক্রমণ করতে চলেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে চেংদু ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। ফুজিয়ান, হুনান, হুপেই, সিচুয়ান, কিয়াংসি, কিয়াংসু ও শান্টুং-এ মিশনারিদের উপর আক্রমণ এবং তাদের হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে। এইসময়ে শান্টুং-এ দুর্জন জার্মান মিশনারি নিহত হন ; এই হত্যাকাণ্ডকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করে জার্মান সেনাবাহিনী শান্টুং আক্রমণ করে। এর ফলে চীনের বিভিন্ন এলাকা বৃহৎ বিদেশি শক্তিবর্গের হস্তগত হয়।

বস্তুত ১৮৯৫ ও ১৮৯৯ সালের মধ্যবর্তী সময় ছিল গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন হিংসাত্মক বিক্ষোভের সময়। আর মিশনভবনের উপর আক্রমণ ছিল তার অন্যতম রূপ। অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট তখন এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে ডাকাতি, অনাহারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, করের বোঝা চাপানো ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শ্রম আদায় করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এসবই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এসব ছিল চীন-জাপান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। এই যুদ্ধ একদিকে উত্তর চীনে সাধারণ মানুষের জীবনে সার্বিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে নতুন করে চাপানো করের বোঝা সেই বিপর্যয়কে তীব্রতর করে তুলেছিল। এই নতুন সংকট যুক্ত হয়েছিল সামন্ত চীনের সামগ্রিক কৃষি সংকটের সঙ্গে।

সংকটের চেহারা কেমন ছিল, তা আর একটি বিস্তারিতভাবে বোঝা দরকার। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই একশো বছর ধরে চীনের জনসংখ্যা ১৮ কোটি থেকে ৪৩ কোটিতে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ রুদ্ধ হয় ১৮৫০-১৮৭৭ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে। এই সময় সংঘটিত তাইপিং, নিয়েন সহ অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয় চীনের জনসংখ্যার বৃদ্ধির গতি রোধ করে। অবশ্য শতাব্দীর শেষভাগে আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিক ফুয়ারওয়ার্কারের (A. Feuerwerker) পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৭৩-৯৩ সালে চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ৮ ভাগ, সেখানে চাষযোগ্য ভূখণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১ ভাগ। কৃষিজমি মূলত ভূস্বামীদের হাতে থাকলেও, একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন জমি এবং কৃষকদের চাষ করা জোতের পরিমাণ অনেক কমে। কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক পশ্চাদপদতা এবং পুঁজির অভাবের কারণে সার, নতুন কৃষি উপকরণ, প্রভৃতি নানাবিধ কারিগরি উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ফলে কৃষকরা দেনার দায়ে ডুবতে থাকে এবং ভূমিহীন কৃষক, ভবঘুরে, ভিক্ষুক প্রভৃতি সর্বহারা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম হল অন্য এলাকায় অভিপ্রয়াণ। অভিপ্রয়াণের ক্ষেত্রে উদ্যোগ তাঁরাই নেন যারা শক্তিশালী, কর্মোদ্যোগী এবং সাহসী। তার ফলে যেসমস্ত গ্রাম ছেড়ে তাঁরা চলে যান, সেইসব গ্রামের অবক্ষয় আরও দ্রুত ঘটতে থাকে। হোপেই, হুনান, শান্‌সি, শানটুং, শেন্‌সি, কোয়াংসি ও উনান প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই ছিল পরিস্থিতি। সংকট আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল একটির পর একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, যা প্রতিনিয়িত বিস্তীর্ণ এলাকাকে ধ্বংসের

মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। বস্তুত ১৮৮৬ ও ১৮৯৭ সালে প্রতিবছর বন্যা, খরা, মহামারি ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে ৬০টি জেলা বিপর্যস্ত হতে থাকে।

এই পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজকে নাড়া দিয়েছিল, কোনো সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে যে বহির্বাণিজ্য ও শিল্পের আবির্ভাব, সেটাও চীনের সামাজিক জীবনে বিষময় প্রভাব ফেলেছিল। কোনো কোনো এলাকায় সুতা ও তাঁতবস্ত্র আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হস্তশিল্পী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইসঙ্গে বাষ্পীয় জলযানের বিকাশ এবং রেলপথ স্থাপন অসংখ্যক মুটে, নৌকাচালক ও সরাইখানার মালিককে দারিদ্র্যের গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

কিছুসংখ্যক চীনা কৃষিজাত দ্রব্য এইসময়ে বিদেশে রপ্তানি হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু বিদেশিরা আমদানি শুল্কের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল, তাই বিদেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যের তুলনায় রপ্তানি করা চীনা দ্রব্যের দাম ধীরগতিতে বাড়তে থাকে। তাছাড়া চীনের বাজার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বের বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার দরে ওঠানামার শিকার হয় চীনের কৃষকেরা। ১৮৮৫-১৯০০ পর্যায়ে চীনের চা-উৎপাদকেরা আন্তর্জাতিক বাজার সংক্রান্ত ঘটনাবলির শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা ও জাভাতে চা-বাগিচা বিকাশলাভ করার ফলে চীনা চায়ের দাম বিশ্বের বাজারে অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে শানটুং প্রদেশে গণ-অসন্তোষ ও রোষ বিস্ফোরণের চেহারা নেয়। ১৮৮০ সাল থেকে এই প্রদেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় শানটুং-এর বহুসংখ্যক গ্রামবাসীকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৯৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে যে, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিবছর আরও ৯০ হাজার টেইল (এক আউন্স রৌপ্যমুদ্রা) কর বাবদ দিতে হবে। একই সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ জাপানকে দেওয়ার জন্য দেশের অভ্যন্তর থেকে ১০ কোটি টেইল ধার হিসাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হয়।

শানটুং প্রদেশে বিদেশি মিশনারি ও ধর্মান্তরিত চীনা খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৮০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা বিভিন্ন এলাকার জমি জোর করে দখল করত, ব্যবসা ও মহাজনি কারবারে নিযুক্ত থাকত, 'অপরাধীদের' চীনা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করত, অখ্রিস্টানদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা—কোনোকিছুই বাদ যেত না। তাই শানটুং-এর মানুষের কাছে এই মিশনগুলিই ছিল সমস্ত নষ্টের মূলে।

১৮৯৬-৯৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ শানটুং-এ মিশনসমূহের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। এইসব বিক্ষোভ আন্দোলনে গুপ্তসমিতিসমূহ নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময়ে একটি নতুন সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এর সদস্যরা মুষ্টিযুদ্ধ করতেন। এর নাম ছিল ই হো তুয়ান বা সত্যনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মিলিশিয়া ; এরা কেন্দ্রীভূত ছিল চিলি ও শানটুং প্রদেশে। এই আন্দোলন চরিত্রগতভাবে ছিল বিদেশি-বিরোধী ও মাঞ্চু-বিরোধী। এরা যেমন বিদেশি আধিপত্যের

প্রতীক মিশনভবনগুলিকে আক্রমণ করত। ঠিক একই সঙ্গো তারা মিং বংশের জয়গান করার মধ্য দিয়ে তাদের মাঞ্চু শাসন-বিরোধিতারও পরিচয়ও রাখত।

এই বিদ্রোহের আর একটি বৈশিষ্ট্য এটিও ধর্মীয় চরিত্র। সংগঠনের সদস্যরা শপথ বাক্য পাঠ করতেন, মুষ্টিযুদ্ধ করতেন এবং বিভিন্ন টোটকা ওষধি পান করতেন, যা নাকি তাদের অপরিমেয় শক্তি জোগাত। এতৎসত্ত্বেও আন্দোলনটির সবচেয়ে বড় চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। প্রাক্-জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের মধ্যে কাজ করত। 'বিদেশিদের উৎখাত কর'—তাদের পতাকায় এই স্লোগান লেখা থাকত। অর্থনীতির সঙ্গো সম্পর্ক ছিল তাদের কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ, যেমন রেলপথ, ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থা খনি প্রভৃতি।

মুষ্টিযোদ্ধারা তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এখানে তাইপিং বিদ্রোহীদের থেকে তারা ছিল পৃথক। তাইপিংদের একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল, এবং একজন সর্বোচ্চ নেতা (হাং সিউ-চুয়ান) থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত ছিল বিভিন্ন স্তর। এই স্থায়ী স্তরবিন্যাস পরবর্তীকালে তাইপিং বিদ্রোহে বিভাজন নিয়ে আসে এবং তাকে দুর্বল করে দেয়। মুষ্টিযোদ্ধাদের সাংগঠনিক কাঠামো কিন্তু সেরকম ছিল না। তাদের কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ছিল না, এবং নেতৃত্বের কোনো স্থায়ী স্তরবিন্যাসও ছিল না। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে তাদের সংগঠনে একটি আঞ্চলিক নেতৃত্বের কাঠামো দিতে চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, শানটুং-এর নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্লাস্টার-বিক্রেতা ঝু ও যাজক বেন মিং ; চিলিতে ছিলেন ভূতপূর্ব নৌকাচালক ঝাং এবং আরও অনেকে।

বক্সার বিদ্রোহে চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা বিভিন্নভাবে অংশ নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের ৭০ভাগ ছিলেন কৃষকশ্রেণী থেকে আসা মানুষেরা। এছাড়া ছিলেন নৌকাচালক, মুটে, যাজক, স্কুল শিক্ষক, ছোট দোকানদার, নিঃস্ব হস্তশিল্পী, ভবঘুরে বিক্রেতা এবং অন্যান্যরা, অফিসার ও জেন্ট্রীর একটি অংশও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বক্সার বিদ্রোহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চীনা মহিলাদের অংশগ্রহণ। বস্তুত সামন্ত চীনা সমাজ ও তার মতাদর্শগত ভিত্তি কনফুসিয় নারী-বিরোধী অনুশাসনের বিরুদ্ধে চীনের শোষিত মহিলারা বিভিন্ন সময়ে কৃষক বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। বক্সার বিদ্রোহে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা যোগ দেন এবং তাঁদের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন ১২ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েরা ছিলেন 'লালা লণ্ঠন' গোষ্ঠীভুক্ত, মধ্যবর্তী বয়সের স্ত্রীরা 'নীল লণ্ঠন' গোষ্ঠীভুক্ত আরও বয়স্ক স্ত্রীরা 'কালো লণ্ঠন' গোষ্ঠীভুক্ত। ঐতিহাসিক জ্যঁ শোনো'র (Jean Chesneaux) মতে চীনা গুপ্তসমিতিগুলিতে মহিলা ব্যাপক উপস্থিতি দেখিয়ে দেয় যে সামাজিক সংকটের তীব্রতা ও গ্রামাঞ্চলে চীনা পরিবারের ভাঙন কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল।

৫৭.৩.৩ বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতি

প্রথম দিকে মনে করা হত যে বক্সারদের বুঝি আত্মরক্ষামূলক চরিত্রই আছে যার তরফ থেকে আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু অতি দ্রুত এই আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তিত হল এবং এটি মাঞ্চুবংশ-বিরোধী ও বিদেশি-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করল। বক্সারদের প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা ওঠে ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে গুয়ানজিয়ানে। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমিত হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই

এর আগুন অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০০ সালের মার্চ মাস নাগাদ সমগ্র বাওদিং-তিয়েনসিন এলাকা বক্সারদের করায়ত্ত হয়। শীঘ্রই পিকিং শহর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এবং তিয়েনসিন, হুনান, শান্‌সি, অন্তঃমঙ্গোলিয়া ও উত্তর-পূর্ব চীন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিভিন্ন গুপ্তসমিতি ইয়াংসি উপত্যকায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ চীনে পুনলায় কৃষক বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে এবং এইভাবে সমগ্র চীনদেশে প্রতিবাদী আন্দোলন মুখ্য বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

চীনের অভ্যন্তরে এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ বিদেশি শক্তিগুলিকে শঙ্কিত করে তোলে। তাদের দিক থেকে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল যে বিগত অর্ধশতক ধরে যে প্রভূত পরিমাণ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশ, লুণ্ঠন ও আধিপত্য তারা চীনের উপর চালিয়েছে তা বুঝি এই বিদ্রোহের ঘূর্ণীবাত্যায় হাতছাড়া হয়ে যাবে। ১৯০০ সালের আগস্ট মাসের প্রথম থেকে বিদেশি সৈন্যবাহনী গড়ে উঠেছিল ব্রিটেন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালির অংশগ্রহণের ফলে। বিদ্রোহী এলাকাগুলিতে নৃশংস হত্যালীলা ও লুণ্ঠনের দ্বারা বিদেশি বাহিনী এই বিদ্রোহকে দমন করতে সক্ষম হয়।

১৯০১ সালের ১৬ জানুয়ারি সাম্রাজ্ঞী জু সি ও তাঁর প্রতিনিধি লি বিদেশিশক্তিবর্গের সমস্ত দাবি মেনে নেন এবং ১৯০১ সালের চুক্তি (Protocol of 1901) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি শর্তানুযায়ী মূল 'অপরাধীদের' হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, নতুবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। স্কলার-বুদ্ধিজীবীদের ৪৫টি জেলায়, যেখানে বক্সাররা সক্রিয় ছিলেন, ৫ বছরের জন্য সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিদেশি-বিরোধী সমস্ত সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশিদের ৪৫ কোটি টেইল ক্ষতিপূরণ দিতে চীনা সরকার রাজি হয়। পিকিং শহর এবং সমুদ্রতীরে মধ্যবর্তী এলাকার সমস্ত দুর্গ ভেঙে ফেলা হয় এবং বিদেশ থেকে আগামী ২ বছর কোনরকম অস্ত্র আমদানি করার অধিকার চীনা সরকার হারায়।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, চুক্তির শর্তাবলির অর্থ হল চীনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদেশিদের এক নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ। এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফলে জাতীয় সম্পদের যে নিষ্কাশন ঘটল তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। একই সঙ্গে বিদেশি কূটনৈতিক মহল মাঞ্চু রাজসভার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করে সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করতে থাকে।

৫৭.৪.৪ বক্সার বিদ্রোহের লক্ষ্য ও সাফল্য

তাইপিং বিদ্রোহের তুলনায় বক্সার বিদ্রোহ ছিল অনেক স্বল্পস্থায়ী। তাই তাদের পক্ষে কোনো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বক্সারদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল বিদেশিরা ; অবশ্য সেইসঙ্গে মাঞ্চুদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা যায়। তাদের একটা অংশ মাঞ্চুদের সমর্থন করলেও অপর অংশ তাদের পুরোপুরি বিরোধিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্বেতপদ্মসমিতির সঙ্গে যুক্ত কিছু গোষ্ঠী মাঞ্চুদের উৎখাত করার কথা বলত। বিভিন্ন ধরনের মতামতের অস্তিত্ব থাকায় কোনো কোনো সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটত। কিন্তু ১৯০০ সালের আগস্ট মাসের পরেও যাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যায় তাঁরা প্রত্যেকেই মাঞ্চুশাসন উৎখাত করার বিষয়ে দৃশ ছিলেন। হু শেং-এর

মতে, চীনের সামন্ত-অভিজাত শাসকেরা জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সত্যিকারের কোনো সমর্থন জানান নি, আর বক্সাররা বিদেশি-বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন মাঞ্চুশাসকদের সাথে ঐক্যের সম্পর্ক তো দূরের কথা, বরং শত্রুতার সম্পর্কই ছিল।

বক্সারদের সামাজিক কর্মসূচীতেও আপাতদৃষ্টিতে ধনীর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা সম্পদ গরিবদের মধ্যে বন্টন করা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। মাঞ্চুদের সাথে বক্সারদের ঐক্য নিশ্চয়ই তাদের সামাজিক দাবি প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কোনো চীনা ঐতিহাসিকের মতে সেই সময়কার মূল দ্বন্দ্ব ছিল চীনা জাতি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ; তাই বক্সাররা উভয়ের মূল শত্রু বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনে অন্যান্য শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

জি. ডুন্‌স্‌থাইমার (G. Dunstheimer)-এর মতে, বক্সার আন্দোলন দুটি ঐতিহাসিক যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিল ; তার একটি মধ্যযুগীয় অর্থাৎ প্রাক্‌-শিল্পসমাজ চীন, আর অপরটি আধুনিক চীন। বক্সাররা ধর্ম, যাদুবিদ্যা, শপথ গ্রহণ সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র চালনায় বিশ্বাস করত ; আর তাই তাদের মানসিকতা ছিল মধ্যযুগীয়। তারা যখন আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তা করতে গিয়ে পুরোনো সমাজের সাধারণ ধারণাগুলি গ্রহণ করছেন, তখন তারা সেই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্মতি পাচ্ছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, যে আধুনিকতার বিরুদ্ধে বক্সাররা বিদ্রোহ করেন, সেই আধুনিকতা বিদেশি শত্রুদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক শ্যেনোর মতে, বিশ শতকের জন্মলগ্নে সংঘটিত বক্সার আন্দোলন ছিল আধুনিক উপনিবেশকদের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মাপের আন্দোলন। চীনা জনগণের জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব ও শক্তি এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ চীনা ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার সিদ্ধান্ত বর্জন করতে বাধ্য হয়।

৫৭.৫ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (১৮৬৬-১৯২৫) ও ১৯১১ সালের অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

১৯১১ সালে সংঘটিত চীনের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রজাতান্ত্রিক চীনা সরকার গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত। এটা ছিল মাঞ্চু শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলশ্রুতি। চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা। চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকে দুর্বল ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে এর দ্বন্দ্ব থাকলেও শত্রুর সঙ্গে সমঝোতার ঝোঁক এর একই সঙ্গে ছিল। তাই এই বিপ্লবের সাফল্যের সীমারেখা সীমিত এবং শেষে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

১৯১১ সালের বিপ্লবকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তর : ১৮৯৪-১৯০৪ ; দ্বিতীয় স্তর : ১৯০৫-১৯০৮ ; আর তৃতীয় স্তর : ১৯০৯-১৯১১। এই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন শক্তি,

নানাভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নতুন জেন্ট্রি, পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, সংস্কারবাদী, চিং (অর্থাৎ মাঞ্চু) রাজত্বের শেষভাগের সংস্কার, সংবিধানপন্থীরা, গুপ্তসমিতি, খেটে-খাওয়া মানুষ বিদেশে পাঠরত চীনা ছাত্ররা এবং সর্বোপরি সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীরা। যেহেতু সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন এই বিপ্লবের কেন্দ্রীয়, তাই আলোচনার স্বার্থে তাঁকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে বসিয়ে তাঁর এবং অন্যান্য শক্তির ভূমিকা আলোচনা করব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুবই সংক্ষেপে আমরা তাঁর প্রথম জীবনের কথা বলব।

১৮৬৬ সালে কোয়াংটুং প্রদেশে সিয়াং-শান জেলার চোয়হাং গ্রামে এক কৃষক পরিবারে সান-ইয়াৎ-সেনের জন্ম। এই জেলা এমন অনেক চীনা চিন্তাবিদ্‌দের জন্ম দেয় যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারা চীনে ছড়ানোর ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। বাল্যকালে সান বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সনাতনী চীনা শিক্ষালাভ করেন। তেরো বছর বয়সে তিনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে তাঁর অগ্রজের কাছে যান এবং ইংরেজি মাধ্যম বিশিষ্ট সেখানকার মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর মানসিক জগতে পরিবর্তন এনেছে, তিনিও আর তাঁর গ্রামের সীমাবন্ধ জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। ১৮৮৩ সালে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং-এর গিয়ে তাঁর ইংরেজি শিক্ষা চালিয়ে যান এবং পরের বছর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ক্যান্টন হাসপাতালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

৫৭.৫.১ বিপ্লবের পটভূমি

১৮৯০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবাধীন বন্দরশহরগুলির পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কর্মজীবী এবং বণিকদের মধ্যে সংস্কারবাদী মতাদর্শ ক্রমশ আসন গেড়ে বসেছিল। ১৮৯০-৯২ সালে অন্যদের সঙ্গে সান-ইয়াৎ-সেন প্রগতিশীল সরকারি অফিসারদের কাছে সংস্কার-সম্পর্কিত কিছু কিছু প্রস্তাব দেন, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা তাঁকে বাধ্য করে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে। এই উদ্দেশ্য হনলুলুতে ১৮৯৪ সালে তিনি 'পুনরুজ্জীবিত চীমা সমাজ' (সিং-চুং-হুই) গড়ে তোলেন। সমাজের যে সমস্ত স্তরের মানুষের সমর্থনের উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন মুটে-মজুর, ব্যবসায়ী, অফিস-করণকি, দোকান-কর্মচারী, বিদেশি বসবাসকারী ধনী চীনা এবং কিছুসংখ্যক বিদেশি সামরিক প্রশিক্ষক। সরকারি অফিসার, ছাত্র ও শিক্ষক, চিং রাজকীয় বাহিনী, গুপ্তসমিতি এবং "গ্রীণউড" (Greenwood) গোষ্ঠীর কৃষকদের মধ্যে সান-ইয়াৎ-সেন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যান। ১৮৯৫ সালে ক্যান্টনে তিনি প্রথম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন ; কিন্তু এই পরিকল্পনা গোপন থাকে না, ফলে তাঁকে পলাতকের জীবনযাপন করতে হয়।

চীন থেকে গোপনে বেরিয়ে তিনি প্রথমে ইংল্যান্ডে যান এবং ১৮৯৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সেখানে অতিবাহিত করেন। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি কার্ল মার্ক্স, জে. এস. মিল, স্পেনসার, অ্যাডাম স্মিথ, ইয়েন ফু প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর চিন্তাজগতে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। ইংল্যান্ড ছাড়াও

তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সেসবের বিবরণ তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন। সেইসব পুঁজিবাদী দেশের বস্তিএলাকা, শ্রমিক ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ, ধর্মঘট ও সমাজ-সম্পর্কিত আইনের তিনি ছিলেন এক আগ্রহী পর্যবেক্ষক। তাঁর পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা কঠিন হয়নি যে, ক্ষমতা, সম্পদ ও গণতান্ত্রিক সরকার থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের মানুষেরা সুখী নন এবং তাঁদের মধ্যেকার প্রগতিশীল ও অগ্রগামী অংশ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার কথা চিন্তা করছিলেন। ঐতিহাসিক লিও শারম্যান-এর মতে, সান-ইয়াৎ-সেনের চিন্তাজগতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা ভালোভাবে শিকড় গেড়ে বসার আগেই সমাজতন্ত্রের চিন্তা যুক্ত হয়েছিল। ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম দানা বাঁধতে বেশ কয়েক প্রজন্ম লেগে গিয়েছিল, তারপর একটা পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের সূচনা ঘটে। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন এমন একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এসেছিলেন যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উভয় ধারণাই তাঁর কাছে নতুন। শারম্যান-এর মতে, সান-ইয়াৎ-সেন চীনদেশে সামাজিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করতেন।

সান-ইয়াৎ-সেন প্রতিষ্ঠিত 'সিং-চুং-হুই' সমিতি ছাড়াও আরও অনেক বিপ্লবীগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'কুয়াং ফু-হুই' (চীনের পুনঃস্থাপন সমিতি) এবং 'হুয়া সিং-হুই' (চীনা জাতির পুনরুজ্জীবন সমিতি)। ঐতিহাসিক শিফ্‌রিন-এর মতে, সান-ইয়াৎ-সেন শহুরে সমস্যা নিয়ে এত বেশি মনোযোগী ছিলেন যে চীনের গ্রামীণ দারিদ্র্যের সমাধান নিয়ে তিনি একেবারেই সময় দিতে পারতেন না।

১৮৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় "পশ্চাত্যকরণ" কিংবা "বিদেশিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর" এই আন্দোলনের দেউলিয়াপনাই প্রমাণ করল। এই সময় থেকেই বুর্জোয়া-সংস্কারবাদ গতি পায়। পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালের সংস্কার-আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, চীনের সমস্যার কোনোপ্রকার স্থায়ী সমাধান সংস্কারের মাধ্যম হবে না। ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিপ্লবীদের পক্ষে জাপানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালানো সহজতর হয়। ১৮৯৯-এর জুলাই-এর আসে অন্যান্য বিদেশি শক্তির সঙ্গো সঙ্গো মাঞ্চু সরকারও জাপানে অতি-রাষ্ট্রিক সুবিধা ভোগ করত। এই অধিকার ভোগ করার সুবাদে কোনো চীনা নাগরিক জাপানে মাঞ্চু সরকার-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গো যুক্ত থাকলে জাপ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে চীনা-কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকত। ফলে মাঞ্চুবিরোধী চীনা বিপ্লবীদের জাপানের অভ্যন্তরে কাজকর্ম গোপনে চালাতে হত। কিন্তু ১৮৯৯ সালের জুলাই মাস থেকে জাপানি সরকার বিদেশি রাষ্ট্রগুলির এই অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার বাতিল ঘোষণা করে। এর ফলে চীনের মাঞ্চুশাসকদের অসুবিধা বাড়ল, আর মাঞ্চু-বিরোধী শক্তিগুলির সুবিধা হল। এর ফলে চীনা সরকারের প্রতিনিধিদের পক্ষে আর চীনা নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে জাপান থেকে চীনে পাঠানো সম্ভব হল না। সেইসময় জাপানে চীনা নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের মতো। সান-ইয়াৎ-সেন তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

ইতিমধ্যে চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি ক্রমশই জাতীয় সংকটের চেহারা নিচ্ছিল। বিদেশি শক্তিবর্গের আগ্রাসী হস্তক্ষেপ ঠেকানোর কোন প্রচেষ্টা মাঞ্চুশাসকদের তরফ থেকে ছিল না। রেলপথ এবং খনি

অঞ্চলের উপর বিদেশিদের সুবিধাভোগের কোন অন্ত ছিল না। ১৯৮৬ সালে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া-সাইবেরিয়া রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করল। জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামও একইভাবে রেলপথ সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। চীনের আভ্যন্তরীণ বিদেশি শক্তিবর্গের এই দ্রুতলয়ে অনুপ্রবেশ চীনা জনসাধারণের জীবনযাত্রা একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়। পরিস্থিতি ক্রমশ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অনুকূল হয়ে ওঠে। বিপ্লবের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে বক্সারদের হাতে, "বিদেশিদের নির্মূল করে" ছিল যাদের অন্যতম শ্লোগান। যুদ্ধে জাপানের হাতে পরাজয়ের ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ চীন সরকারকে দিয়ে হয় তা ছিল চীনা জনগণের কাছে শাস্তির মতো। চীনের অগ্রণী মানুষের কাছে তাঁদের মাতৃভূমি অপমানের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে।

সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং বিদেশি শক্তিবর্গের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে সান-ইয়াৎ-সেন এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ছাড়া মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। ১৯০০-০১ সাল নাগাদ "গ্রীণউড" গোষ্ঠী ' 'ট্রায়াড সমিতি'র সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি হুইচাও-এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পুর্ববর্তী অভ্যুত্থানগুলির মতো এটিও ব্যর্থ হয়।

ফলে নতুন শতকের শুরুতে দেখা গেল যে পরিবর্তন আনার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সংস্কারবাদীরা পরাজিত হয়েছেন, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, অন্যদের নির্বাসিত করা হয়। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, বিপ্লবীদের কেউ কেউ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, কাউকে নির্বাসিত করা হয়েছে। বক্সার আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা রাজধানী থেকে ভবঘুরে জীবনযাপন করছেন। কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনসমূহের কোনোটাই থেমে থাকেনি।

১৯৩০ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন ক্রমশ এমন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে যে তাকে অস্বীকার করা আর সম্ভব ছিল না। ১৮৯৮ সালে যেসব সংস্কার বাতিল হয়ে যায়, নতুন শতাব্দীর শুরুতে তা আবার পুনর্বিবেচনার দাবি জানায়। পশ্চিমী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার যে দাবি উঠতে থাকে মাঞ্চু-শাসকবর্গে তার প্রতি পূর্বের অপেক্ষা কম নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। মাঞ্চু-শাসনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সম্রাজ্ঞী জু-শী'র কাছে এছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। চিং রাজত্বের শেষভাগের সংস্কারগুলির মধ্যে ছিল রেলপথ নির্মাণে ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগের অধিকার। ক্রমশ এই আন্দোলন সাংবিধানিক পার্লামেন্ট গঠনের দিকে নিয়ে যায়। এরই পরিণতি হিসাবে মাঞ্চু সরকার ১৯০৮ সালের ২৭ আগস্ট সাংবিধানিক সংস্কারের নয় বছরের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

৫৭.৫.২ বিপ্লবের প্রস্তুতি

চীন বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের সূত্রপাত ১৯০৫ সালে। এই সময়কার পটপরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক। সান-ইয়াৎ-সেন সেই সময়ে জাপানে ছিলেন। জাপান তখন সবেমাত্র যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। এশিয়ার অন্যতম ছোট্ট দেশ যদি পাশ্চাত্যের বড় দেশ রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারে, তবে তো জাপানের হাতে ১৮৯৫ সালে চীনের পরাজয়ে অগৌরবের তত কিছু নেই। শার্মানের মতে, এইসব কারণে রাশিয়ার পরাজয় চীনের মনে নতুন আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিল। আধুনিকীকরণই যদি জাপানের বিজয়ের কারণ হয় তবে চীনের সামনেও আধুনিকীকরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। অন্যদিকে,

বক্সার আন্দোলনের পরাজয়ের পরে স্বাক্ষরিত ১৯০১-এর চুক্তির অর্থ ছিল দেশকে বিদেশিদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া আর তাই চিং বংশের শাসনের অবসানের দাবি ধূমায়িত হচ্ছিল দেশের সর্বত্র। এই নতুন বাস্তব অবস্থার উপযোগী একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, যে পার্টি জাতীয় স্তরে এক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। এরই ফলশ্রুতি সান-ইয়াৎ-সেন প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'তুং মেং হুই' (বিপ্লবী লিগ)। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন বিপ্লবী আন্দোলনকে নতুন স্তরে উন্নীত করল।

ঐতিহাসিক শিফ্‌রিনের মতে, সান-এর মূল লক্ষ্য ছিল মাঞ্চু-বিরোধী সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবন্ধ করা। যদি প্রাদেশিক গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ এলাকায় অভ্যুত্থান ঘটায় তবে শুধু যে চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে তাই নয়, একই সঙ্গো সেই বিশৃংখল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশি শক্তিগুলি চীনে হস্তক্ষেপ করবে এবং তাকে ভাগবাটোয়ারা করে নেবে। ছাত্রদের বিচারবিবেচনায় সান-ইয়াৎ-সেনে একটি গুণ ছিল যা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা শুধু যে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করছিল তাই নয়, একই সঙ্গো তারা বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ ঠেকাতেও চাইছিল। কাজেই যে বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল, বিপ্লবী আন্দোলন যেন বিদেশিদের চোখে সম্ভ্রম জাগায়, তা যেন এমন স্বচ্ছন্দভাবে অগ্রসর হয় যে বিদেশিরা হস্তক্ষেপের কোন সুযোগই না পায়। ছাত্রদের সঙ্গো সান-ইয়াৎ-সেনের আলোচনা এই খাতেই বয়েছিল। এদের নিয়েই প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল 'তুং মেং হুই'। এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'মিন পাও' (জনশক্তি)।

এই নতুন সংগঠন পূর্বেকার যে-কোনো সংগঠন থেকে পৃথক ছিল। পূর্বেকার বিপ্লবী সংগঠনগুলি অনেকটাই ছিল পুরোনো গুপ্তসমিতির ধাঁচের এবং চরিত্রগত দিক থেকে আঞ্চলিক। সংগঠনগতভাবে, 'তুং মেং-হুই' ছিল আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভৌগোলিকভাবে, বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু বন্দর এলাকা ও বিদেশি বসবাসকারী চীনাদের কাছ থেকে সরে চীনের অভ্যন্তরে চলে আসে। পুরোনো সংগঠন 'সিং-চুং-হুই' ছিল মূলত ক্যান্টন বন্দরকেন্দ্রিক, অন্যদিকে নতুন সংগঠনটি ছিল অনেক বেশি ব্যাপক, তা বিভিন্ন প্রদেশ ও জাতির সমর্থনের উপর দাঁড়িয়েছিল। চীনা ঐতিহাসিকদের মতে, এই বিপ্লবী ছিল বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লবী এবং ভূস্বামীশ্রেণীর মাঞ্চু-বিরোধী অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা এক দুর্বল ঐক্য। একই সঙ্গো ছিলেন নয়া বুদ্ধিজীবী, অনাবাসী চীনা, গুপ্তসমিতির সদস্যরা এবং বিশেষত সাংহাইয়ে কর্মরত চীনা ব্যবসায়ীদের একটি অংশ।

৫৭.৫.৩ সান-ইয়াৎ-সেনের রাজনৈতিক আদর্শ

সান-ইয়াৎ-সেনের আর্দশের মর্মবস্তু নিহিত ছিল এই স্লোগানের মধ্যে : "মাঞ্চুদের বিতাড়িত কর, চীনা জনগণের শাসন ফিরিয়ে আন, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং ভূমির উপর অধিকারের সমতা স্থাপন কর।" এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল তার '**তিনটি জননীতি**'। সেগুলি হল : 'জনগণের জাতীয়তাবাদ', 'জনগণের গণতন্ত্র' বেং 'জনগণের জীবিকা'। কারও কারও মতে তৃতীয় জননীতি প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেহেতু এই নীতি ভূস্বামীর জোয়াল থেকে কৃষককে মুক্তি দিয়ে চেয়েছিল, তাই সামন্তব্যবস্থার বিরোধিতায় এটি

অবশ্যই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু এটি কি সমাজতন্ত্রের সঙ্গো সমার্থক ? ঐতিহাসিক ইস্রায়েল এপ্‌স্‌টাইনের মতে, এটি ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী, একে সমাজতন্ত্রের অলংকারে ভূষিত করা ঠিক নয়। প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর কোনো স্থান এখানে নেই। দ্বিতীয়ত, যদিও মাঞ্চু-স্বৈরতন্ত্র ছিল এর আক্রমণের লক্ষ্য তবুও চীনের সামন্তব্যবস্থার সঙ্গো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজস উল্লেখই করা হয়নি।

'জনগণের জাতীয়তাবাদ' এই জননীতির অর্থ বিদেশি মাঞ্চু-বংশের উৎখাত, মাঞ্চু ও চীনাদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যেকার সম্পর্কের অসাম্য দূর করা এবং এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীনের বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে মাঞ্চু-শাসকদের উৎখাত করার সংগ্রাম একই সঙ্গো যুক্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশকে ঠেকানো ও চীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠারক সংগ্রামের সঙ্গো। বিপ্লবী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট বা বিনন্ধে এবং কোনো কোনো নেতার বেসরকারি প্রতিবেদন থেকে এই সম্পর্কটা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করার কোন কথা সরকারি নথিপত্রে থাকত না ; কারণ এই আশঙ্কা বরাবরই ছল যে সেক্ষেত্রে বিদেশি শক্তিবর্গ মাঞ্চুদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সেইজন্যই 'বিদেশি শক্তিবর্গের প্রতি আবেদনে' বলা হয়েছিল যে নয়া বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ সমস্ত পুরানো অসম চুক্তি বজায় রাখবে এবং বিদেশিদের সম্পত্তি ও অধিকারভোগের নিরাপত্তা প্রদান করবে। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গো লড়াই চালাবার কোনো কর্মসূচী না থাকা ছিল সংগঠনের অন্যতম সীমাবদ্ধতা যা বহুসংখ্যক দেশপ্রেমী মানুষকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

সান-ইয়াৎ-সেন ও 'বিপ্লবী লিগ'কে সংস্কাবাদী চিন্তার সঙ্গো মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। সংস্কারবাদীদের অন্যতম নেতা লিয়াং চি-চাও বিশ্বাস করতেন যে বিকাশের একটা ধারাবাহিকতা আছে ; এর মধ্যে কোনোরকম মোচড় নেই। পরবর্তী চিং শাসকদের প্রস্তাবিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তিনি ছিলেন সমর্থক, তাঁর মতে এই রাজতন্ত্র নতুন যুগে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থিতিশীলতার জন্ম দেবে। অন্যদিকে সান-ইয়াৎ-সেন বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মোচড় বা উল্লম্ফনে বিশ্বাস করতেন ; তার চিন্তাভাবনায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কোনো স্থান ছিল না। তিনি বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন-স্তর-কর্মসূচী উপস্থিত করলেন। প্রথম স্তরের মেয়াদ তিন বছরের। একটি গণসমর্থনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামরিক সরকারের শাসন। এই সরকারের কাজ হবে অতীতের সমস্ত অনাচার অবিচারের মূলোৎপাটন করা। দ্বিতীয় স্তরের সময়সীমা ছয় বছরের। এই সময়ে নির্বাচনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক কাউন্সিল একটি অস্থায়ী সরকার গড়ে উঠবে। তৃতীয় ও শেষ স্তরে সামরিক সরকার পদত্যাগ করবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত গবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, যা নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে অসামরিক সরকার গড়ে তুলবে।

নতুন সংবিধানের চেহারা কেমন হবে, সে বিষয়ে সান-ইয়াৎ-সেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের আইন বিভাগ, শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ও বিচারবিভাগ—এই তিনট বিভাগের সঙ্গো তিনি দুটি চীনা বিভাগ যুক্ত করেন। সেগুলি পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিভাগ এবং অনুমোদন বিভাগ।

'জনগণের গণতন্ত্র'—এই জননীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সান বলেন, যে সমস্ত মানুষেরা সমতা ও স্বাধীনতাকে সবচেয়ে উপরে স্থান দেন, তাঁরা কখনই স্বৈরাচারী শাসনকে মেনে নেবেন না। তিনি মনে করতেন 'জাতীয় বিপ্লবের' সাথে এক 'রাজনৈতিক বিপ্লব'ও সংগঠিত করতে হবে। চিং-শাসন উৎখাত করার পরে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলির অনুকরণে তিনি এক গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর এই কর্মসূচী চরমমনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সমর্থন লাভ করেছিল। সান-এর এই জননীতি সম্পর্কে লেনিনের উঁচু ধারণা ছিল। একে তিনি 'সম্পূর্ণ গণতন্ত্র' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

'জনগণের জীবিকা'— এই জননীতি কর্মসূচীর সামাজিক দিক প্রতিফলিত করেছিল এবং জমির উপর সমানাধিকারের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে জমির জাতীয়করণের কথাই প্রচার করেছিল। বিপ্লবোত্তর চীনে ''সভ্যতার অগ্রগতির সাথে জমির মূল্যও বৃদ্ধি পাবে'' এই কথা বলে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল, পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে জমির অর্থমূল্যও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। যদি ''জমির মালিকানাক্ষেত্রে সমতার নীতি'' অনুসরণ করা হয়, তবে জমির বর্ধিত মূল্য থেকে প্রাপ্য মুনাফা ভূস্বামীরা আত্মসাৎ করতে পারবে না। এটা পুঁজিবাদের বিকাশকেই সহায়তা করবে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক চীনের জাতীয় জীবনে এক বিপর্যয় নিয়ে আসে। বিদেশি শক্তিবর্গের কাছে চিং সরকারের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ চীনের সংকটে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। মূল্যবৃদ্ধি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস—এসব কিছু শিল্পের সামগ্রিক বিকাশকে ভীষণভাবে ব্যাহত করছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চীনের অবস্থান ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। জাপান-মার্কিন দ্বন্দ্ব প্রাচ্য দুনিয়ায় শক্তিবর্গের মধ্যে নতুন ধরনের বোঝাপড়ার সূচনা করে। ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'নিরপেক্ষকরণ পরিকল্পনা' উপস্থাপনা করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চীনের উত্তর-পূর্ব প্রদেশগলির রেলপথ ছয়টি দেশের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া হবে, সেই দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানি। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ১৯১০-এর জুলাই মাসে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যার শর্ত অনুযায়ী রাশিয়ার জার সরকার জাপানকে কোরিয়া অধিকার করতে দেয় এবং প্রতিদানে মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে রাশিয়ার আগ্রাসী অনুপ্রবেশকে জাপান সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

মাঞ্চু সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ চীনা জনগণের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার জন্ম দেয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এইসব স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ গিয়েছিলেন। বস্তুত ১৯০৫-১৯১১ সালের মধ্যে চীনের বিভিন্ন এলাকায় কর-বিরোধী বিক্ষোভ এবং বিপ্লবী অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 'হুং ফু হুই' সমিতির নেতৃত্বে হুনানের লিউইয়াং কাউন্টির বিদ্রোহ, অ্যানিউয়ানের কয়লাখনি শ্রমিকদের বিদ্রোহ, সানের নেতৃত্বে কোয়াংটুং প্রদেশ চাওচৌ, হুইচৌ, চিনচৌ ও লিয়েনচৌ-এর কোয়াংসি প্রদেশে চেন্নানকুয়ানের বিদ্রোহ, 'কুয়াং ফু হুই' সমিতির নেতৃত্বে আন ওয়েই প্রদেশের রাজধানী আনকিং-এর সৈন্যবিদ্রোহ, নি ইং-তিয়েনের নেতৃত্বে ক্যান্টনের অভ্যুত্থান প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহই ব্যর্থ হয়েছিল। গবেষক তাং লিয়াং লি'র মতে, ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই

অভ্যুত্থানসমূহ সংগ্রামী মানুষের মনে বিপ্লবী চিন্তা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল এবং হাজার হাজার মানুষকে বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

৫৭.৫.৪ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা

আন্দোলনের তৃতীয় ধাপের সূত্রপাত ১৯০৯ সালে। এর পূর্ববর্তী বছরে মাঞ্চু সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য নয় বছরের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনকে ভোঁতা করে দিয়ে সংস্কারের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া ; অপর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। এই কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ সংকটকে ঘনীভূত করে। এটি রেলপথ সংক্রান্ত।

পিকিং সরকারের নীতি ছিল সমস্ত প্রাদেশিক রেলব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবশেষে সেগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রদেশ এই নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করে। এই আন্দোলন 'অধিকার ফিরে পাওয়ার আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের মাঞ্চু-বিরোধিতার স্থান ছিল দুটি। প্রথম, যেভাবে যে শর্তে বিদেশিদের কাছ থেকে ঋণ করে রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে ; আর দ্বিতীয়, ঋণ নেওয়ার পুরো বিষয়টা, যা চীনের স্বাধীনতাকে বিদেশিদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। এই ঋণ নেওয়ার ফলে চীনা বুর্জোয়াদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ভিত্তিতেই মাঞ্চুশাসনের বিরোধিতায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পুঁজি বিনিয়োগকারীরা 'রেলপথ নিরাপত্তা লিগ' গড়ে তোলেন এবং রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব তাঁদের হাতে না দিলে কর দিতে অস্বীকার করেন। সরকার এর বদলা হিসাবে দুজন লিগ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে সমগ্র সিচুয়ানে বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে গড়ে।

মাঞ্চুশাসনের সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকল। সংস্কাবাদীদের চাপ ছিল প্রত্যক্ষ। তাঁরা একইসঙ্গে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ-মুখাপেক্ষী নীতি ও প্রাদেশিকতা-বিরোধী সংস্কার বন্ধ করার মাঞ্চু শাসকগোষ্ঠীর উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদিকে সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে তুং মেং-হুই-এর সদস্যরা গোপনে সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে শেষ লড়াই লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের সংগঠিত করা, সম্রাটের বাহিনীর একটি অংশকে পক্ষে টানা, গুপ্তসমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলা এবং তাদের শক্তির উপর নির্ভর করা, জনসাধারণের কর-বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে মাঞ্চু-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ দেওয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর এক অংশের সমর্থন আদায় করা—এই সবই করে তুলতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯১১ সালের বিপ্লবের সূত্রপাত সেপ্টেম্বর মাসে সিচুয়ানে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ৯ অক্টোবর তারিখে হ্যাংকাও-এর একটি গোপন অস্ত্রভাণ্ডারে আকস্মিক বিস্ফোরণ। এর ফলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাটি আর গোপন থাকে না। এরপর উচাং-এর গোলন্দাজ বাহিনী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে ভাইসরয় পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ১১ অক্টোবর বিপ্লবীরা উচাং-এর দখল নেয়। মাত্র এক মাসের মধ্যেই ১৩টি প্রদেশ বিপ্লবীদের দখলে আসে। এইসময় যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাই-কে পরাজিত মাঞ্চুশাসকেরা প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেয় এবং অবশেষে তাঁর সঙ্গে সান-ইয়াৎ-সেনের শান্তি অধিবেশন

হয়। এর ফলে সুদীর্ঘ মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটল এবং গড়ে উঠল প্রজাতান্ত্রিক চীন সরকার। ১১১২ সালের ১ জানুয়ারি নানকিং সাং-ইয়াৎ সেন চীনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ইউয়ান শি-কাই-এর সঙ্গো এই শান্তিচুক্তির ফলে দক্ষিণ চীনের নিয়ন্ত্রণ থাকে প্রজাতন্ত্রীদের হাতে, তাদের রাজধানী হয় নানকিং। আর উত্তর চীনের নিয়ন্ত্রণ থাকে ইউয়ান-এর বাহিনীর হাতে, তাদের রাজধানী হয় পিকিং।

১৯১১ সালের বিপ্লবকে চীনের ইতিহাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তত একটি অংশ এই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সাংহাইয়ের বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষভাবে রএই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক লি শু-এর মতে, সাংহাই চেম্বার অব কমার্স শহরের অস্ত্রাগারের উপর আক্রমণের পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল। উহানের তিনটি শহরের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থক। সিচুয়ান সামরিক সরকারের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার অর্থ সংগ্রহ করে চোং কিং চেম্বার অব কমার্স। ঝেজিয়াং, ফুজিয়াং, গুয়াং ডং, কোয়াংসি ও আনহুই প্রদেশের রাজধানী-সমূহের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার মনোভাবও ছিল তাই। তাদের পক্ষে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা, তাই রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

৫৭.৬ উপসংহার

১৯১১-এর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পিছনে অনেকগুলি উপাদানের ভূমিকা ছিল। চীনে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও ১৮৩৯-৪২ সালে আফিং যুদ্ধের পরে একাধিক অসম চুক্তি স্বাক্ষর, সামন্ত মাঞ্চুশাসনের ছোট-বড় মাপের কৃষক বিদ্রোহ, গুপ্ত সমিতি, বিদেশে বসবাসকারী চীনা নাগরিক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী মানুষ, বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি অংশ—এইসব উপাদান সম্মিলিতভাবে গণবিপ্লবী জোয়ার ডেকে এনেছিল। এর অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই বিপ্লব চেয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা হিংসার বিরোধী ছিলেন, তারা এই বিপ্লবী জোয়ারের শরিক হয়েছিলেন এই কারণে যে চিং শাসকদের শেষ বছরগুলিতে গৃহীত নীতিগুলি তাঁদের সামনে অন্য সমস্ত পথই বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্য সমস্ত বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে সান-ইয়াৎ-সেনই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি 'তুং মেং হুই' প্রতিষ্ঠা করেন, জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী উপস্থিত করেন, বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের সংগঠিত করেন, বিভিন্ন সূত্র থেকে বিপ্লবের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করেন, গুপ্তসমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন এবং জাপানে সামরিক বিষয়ে পাঠরত চীনা ছাত্রদের বিপ্লবী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটায় এবং একই সঙ্গো প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রগতিশীল চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এই বিপ্লবের কিছু কিছু বড় মাপের সীমাবদ্ধতা ছিল। 'তং মেং হুই'-পার্টির কর্মসূচীতে চীনের অভ্যন্তরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য ছিল না, বরং তাদের ভোগ করা সুযোগসুবিধাগুলি স্বীকার করা হয়েছিল। এই বিপ্লব সম্রাটকে উৎখাত করলেও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিভিন্ন সামাজিক শক্তির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। চীনে

যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ এবং সামন্ত শাসনের অবসান ঘটেনি, তাই মাঞ্চুশাসনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও সমাজের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, ইউয়ান শি-কাই-এর একনায়কত্বের চরিত্রও একই থেকে যায়। তাই ১৯১১-এর চীন বিপ্লব ছিল অসমাপ্ত চরিত্রের এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সান-ইয়াৎ-সেনের তিন জননীতির বিপ্লবী মর্মবস্তুকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ১৯৪৯ সালের সফল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (যা 'নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব' নামে পরিচিত) নেতৃত্ব দেন।

৫৭.৭ সারাংশ

বিদ্রোহকে চীনদেশের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার দৈব নির্দেশের তত্ত্বের মধ্যে নিহিত ছিল এবং তা কনফুসিয় দর্শন দ্বারা সমর্থিত ছিল। চীনে পশ্চিমী শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মাঞ্চু সরকারের দুর্নীতির এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে একের পর এক চীন লাভ করেছিল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা। তাইপিং বিপ্লব, বক্সার বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে ১৯১১ সালের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব যার ফলে চীন লাভ করে প্রজাতন্ত্র। তবে ১৯১১ সালের বিপ্লব ছিল অসম্পূর্ণ, কারণ চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এই বিপ্লবের ফলে দূরীভূত হয়নি। যদিও মাঞ্চুবংশের পতন হয়ে প্রজাতন্ত্রের পতন হল কিন্তু তা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণে এনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কারণ চীনে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ দূরীভূত হয়নি, নিশ্চিহ্ন হয়নি সামন্তবাদ, তাই প্রকৃত প্রজাতন্ত্র ১৯১১ সালের বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই কারণে বিপ্লবটি ছিল অসম্পূর্ণ বিপ্লব। সান-ইয়াৎ-সেন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে উয়ান-শি-কাই নামক মাঞ্চু রাজবংশের এক প্রভাবশালী সেনাপতির পক্ষে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করেন। কিন্তু চীনের নতুন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি উয়ান-শি-কাই গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপ্লবীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সান-ইয়াৎ-সেনের গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উয়ান-শি-কাই-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটি বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হয়। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য সান-ইয়াৎ-সেন কুয়ো মিন তাং বা চীনা জনগণের দল নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দল দক্ষিণ চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করে। এই সময় সান-ইয়াৎ-সেন পশ্চিমী রাষ্ট্রের শোষণমূলক চুক্তিগুলি নাকচ করার চেষ্টা করেন। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর কার্য অসমাপ্ত রয়ে যায়। পরে তাঁর সফল উত্তরাধিকারী মাও-জে-ডং-এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করে।

৫৭.৮ অনুশীলনী

১। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :**

(ক) ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করুন।

(খ) সংস্কারবাদীদের সামাজিক ভিত্তি কী ছিল? তাঁরা চীনে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে চাইতেন পর্যালোচনা করুন।

(গ) সংস্কার আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন।

(ঘ) বক্সার বা 'ই হো-তুয়ান' আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত কী?

(ঙ) বক্সার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কী কী?

(চ) বক্সার আন্দোলনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করুন।

(ছ) সান-ইয়াৎ-সেন পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি কী ছিল?

(জ) সংস্কার-আন্দোলনের ব্যর্থতা কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিল, তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) সান-ইয়াৎ-সেনের 'তিন জননীতি' কী ব্যাখ্যা করুন।

(ঞ) চীন বিপ্লবের তিনটি স্তর কী কী? সেগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ট) ১৯১১-এর চীন বিপ্লব কী অসম্পূর্ণ ছিল?

২। টীকা লেখো :

(ক) কাং-ইউ-ওয়েই ; (খ) সংস্কার সম্বন্ধীয় অনুশাসন ; (গ) বক্সার আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ; (ঘ) ১৯০১-এর চক্তি ; (ঙ) 'সিং-চুং-হুই' ; (চ) 'তুং মেং হুই', (ছ) পরবর্তী চিং-শাসকদের সংস্কার ; (জ) চীন বিপ্লবে গুপ্তসমিতিসমূহের ভূমিকা ; (ঝ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষকরণ পরিকল্পনা' ; (ঞ) 'অধিকার ফিরে পাওয়ার আন্দোলন' (ট) ইউয়ান সি-কাই।

৫৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। সিদ্ধার্থ গুহ রায় : চীন ও জাপানের ইতিহাস (প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স)।

২। দেবপ্রসাদ চৌধুরী : দূরপ্রাচ্যের ইতিহাস (রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)।

৩। Isreal Epstein : From Opium War to Liberation.

৪। Peking series : The Reform Movement of 1898.

৫। Peking series : The Yi Ho Tuan Movement of 1900.

৬। Peking series : The Revolution of 1911.

৭। Jean Chesmeaux : From the Opium War to the 1911 Revolution.

৮। W. Franke : A Centuary of the Chienese Revolution.

৯। Lyon Sharman : Sun Yat-Sen.

১০। H. Z. Sehiffrin : Sun Yat-Sen and The Origins of the Chinese Revolution.

একক ৫৮ ❒ চীন ভূখণ্ডে নতুন শক্তির বিকাশ এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯১১-১৯২১)

গঠন

৫৮.০ উদ্দেশ্য

৫৮.১ প্রস্তাবনা

৫৮.২ নতুন শক্তির বিকাশ (১৯১২-১৯১৮)

৫৮.৩ সমরনায়কদের যুগ

৫৮.৪ চীনের শিল্পায়ন

৫৮.৫ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন

৫৮.৬ ৪ঠা মে (১৯১৯) আন্দোলন—গোড়ার কথা

৫৮.৬.১ প্রেক্ষাপট

৫৮.৬.২ আশু কারণ

৫৮.৬.৩ আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রসার

৫৮.৬.৪ আন্দোলনের গুরুত্ব

৫৮.৬.৫ আন্দোলনের সাফল্য

৫৮.৬.৬ আন্দোলনের সীমাবন্ধতা

৫৮.৬.৭ আন্দোলনের মূল্যায়ন

৫৮.৭ চীনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম (১৯২১)

৫৮.৮ সারাংশ

৫৮.৯ অনুশীলনী

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৮.০ উদ্দেশ্য

১৯১১ সালের চীনের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় থেকে ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস এই এককের আলোচ্য। এই এককে আছে—

- কীভাবে ইউয়ান-শি-কাই চীনে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।
- এই প্রচেষ্টার বিরুধ্বে জাতীয়তাবাদী নেতা সান-ইয়াং-সেন কীভাবে বিপ্লবী প্রয়াস চালান।

- চীনে সমরনায়কদের যুগের সূচনা কেমন করে হয়।
- চীনের অর্থনীতি, শিল্প ও সমাজ-সংস্কৃতিতে কী কী পরিবর্তন আসে।
- ১৯১৯-এর ৪ঠা মে-র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য কী ছিল।
- ৪ঠা মে-র আন্দোলনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব ও তার মূল্যায়ন।
- চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।

৫৮.১ প্রস্তাবনা

১৯১১ সালে চীনে একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়। মাঞ্চু-শাসনেরও অবসান ঘটে। কিন্তু চীনা নেতা সান-ইয়াৎ-সেন চীনে গৃহযুদ্ধ এড়াতে ইউয়ান-শি-কাইয়ের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ইউয়ান-শি-কাই এই সুযোগে চীনে তার একচ্ছত্র সামরিক শাসন স্থাপন করেন এবং সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তার স্বপ্ন সফল হয়নি। ১৯১৬ সালে তার মৃত্যু হয়। এরপর দশবছর চীনে তুচুন বা প্রদেশপাল সমরনায়কদের শাসন চীনে বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইতিমধ্যে শিল্প, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন সাং-ইয়াৎ-সেন। ১৯১৯ সালের ৪ঠ মে-র আন্দোলন চীনে বিরাট রাজনৈতিক পালাবদল ঘটায়। ক্রমশ চীনের রাজনীতিতে মার্ক্সবাদীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯১১ থেকে ১৯২১ এই দশবছরের চীনের রোমাঞ্চকর ইতিহাসই বর্তমান এককে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা থেকে চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রটিও পাওয়া যাবে।

৫৮.২ নতুন শক্তির বিকাশ (১৯১২-১৯১৮)

১৯১১ সালের অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সান-ইয়াৎ-সেন পরিচালিত তুং মেং-হুই পার্টির নামকরণ হয় 'কুওমিন্‌টাং'। এটা শুধুমাত্র একটা নামের পরিবর্তন ছিল না, একই সঙ্গে চরিত্রেরও পরিবর্তন বটে। পুরোনো সংগঠনটি ছিল অনেক বেশি বৈপ্লবিক ; কিন্তু নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী, অবিপ্লবী নানা ধরনের মানুষকে নিয়ে।

১৯১১ সালে মাঞ্চুশাসনের অবসান সত্ত্বেও সান-ইয়াৎ-সেন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। তাই ১৯১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি উয়ান শি-কাই-এর পক্ষে রাষ্ট্রপতির অবস্থান থেকে পদত্যাগ করেন। যেসব কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন সেগুলি হলে : তিনি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চান, ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের ছত্রছায়ায় চীনের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান, এবং নতুন চীনা রাষ্ট্রের বিদেশি স্বীকৃতি ও দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বিদেশি ঋণ চান। বিদেশি শক্তিগুলি এই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে একমাত্র উয়ান-শি-কাই রাষ্ট্রপতি হলেই তারা সেসব দিতে প্রস্তুত আছে। পরে অবশ্য সান-ইয়াৎ-সেনকে এই কাজের জন্য অনুশোচনা করতে হয়। এর ফলে ঐক্য, শান্তি বা প্রগতি কিছুই আসেনি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকেই উয়ান-শি-কাই চীনে এক সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। একটা সময় এল যখন তাঁর পক্ষে এজন্য কোনো সাংবিধানিক মুখোশ পরার

প্রয়োজন রইল না। সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পদদলিত করে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন সেইসব শর্তে অর্থ ধার নেওয়ার জন্য, যা মাঞ্চুরা ইতিপূর্বে করেছিল এবং যা চীনের জনগণ কখনই মেনে নেননি। যারা এর বিরোধিতা করেন, তাদের হত্যা করা হয়। প্রথম পার্লামেন্টে কুও মিন্টাং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছিল, এবং সুং চিয়াও-জেন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। কিন্তু ঘাতকের বুলেটে তিনি নিহত হওয়ায় কুও মিন্টাং-এর সরকার গঠন করার আশা চুরমার হয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে প্রমাণ করে যে, উয়ান-শি-কাই বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ; তাই ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান ও জাপানি ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে উয়ানের সরকারকে ২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ হিসাবে দেয়। মার্কিন সংবাদপত্রে 'শক্তপোক্ত লোক' উয়ানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

১৯১৩ সালে যখন উয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না, তখন সান-ইয়াৎ-সেন এই একনায়কের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' ডাক দেন এবং এই যুদ্ধে তিনি দক্ষিণ চীনের সেনাবাহিনীকে সমাবেশিত করতে পেরেছিলেন। কয়েক মাস যুদ্ধ চলার পর উয়ানের বাহিনী এই অভ্যুত্থানকে দমন করে। বিপ্লবী শক্তির বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হল কৃষি সমস্যাকে তারা সামনে আনতে পারেননি, ফলে কৃষকেরা এই আন্দোলনে যোগ দেননি। যুদ্ধে জয়লাভ করে উয়ান কুওমিন্টাং-কে বেআইনি ঘোষণা করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে চীন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়। জাপানিরা মিত্রপক্ষে যোগদান করে। জার্মানবাহিনীর সঙ্গে তাদের একটিমাত্র যুদ্ধ যা হয় তা চীনা ভূখণ্ডের শান্টুং প্রদেশে, যে যুদ্ধে জার্মানবাহিনী জাপবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি তখন এমন যে চীনের অভ্যন্তরে তাদের বিরোধিতা করার মতো কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নেই। জাপানের সামনে সুযোগ এল সমগ্র চীনকে উপনিবেশে পরিণত করার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৫ সালের ১৮ জানুয়ারিতে জাপানি রাষ্ট্রদূত হিওকি একি গোপন রাষ্ট্রপতি উয়ান-শি-কাই-এর হাতে 'একুশ দফা দাবি" পেশ করেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার অর্থ হল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জাপানের উপনিবেশে পরিণত হওয়া। জাপ সরকারের চাপে চীন সরকার সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে যে বিপুল জনরোষের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯১৯-এর ৪ঠা মে আন্দোলনের জন্ম দেয়।

৫৮.৩ সমরনায়কদের যুগ

মার্কিন অধ্যাপক গুডনাও (Goodnow)-এর কথায় উয়ান-শী-কাই চীনের 'সম্রাট' হবেন বলে মনস্থির করলেন। দিনটি ঠিক হয় ১৯১৬-এর ১ জানুয়ারি। কিন্তু এর ঠিক এক সপ্তাহ আগে সাই আও (Tsai Ao), চু তে (Chu Teh) পরবর্তীকালে মাও-পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং আরও কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার উনান প্রদেশে বিদ্রোহ করেন। স্বৈরাচারী উয়ান-শী-কাই লোকচক্ষে এত বেশি হেয় প্রতিপন্ন হন, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণা এত বেশি তীব্র ছিল যে উয়ান-শী-কাই-এর ক্ষমতা চুরমার হয়ে যায়। উয়ান অবশেষে সম্রাট হওয়ার বাসনা বাতিল করতে বাধ্য হন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিস্থিতি তখন এমন যে পিকিং সরকার তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শুধুমাত্র নামে ; আর কখনই তা সারা দেশে ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেনি। ইতিমধ্যে উয়ানের সামরিক বাহিনী তখন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রপতির পদ ও রাজধানীর নিয়ন্ত্রণও পালা করে দুদলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। একদিকে ছিল আনহোয়েই (Anhwei) প্রদেশের গোষ্ঠী, যারা ছিল জাপানি মদতপুষ্ট। আর অন্যদিকে ছিল হোপেই (Hopei) প্রদেশগোষ্ঠী, যারা ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকার মদতপুষ্ট। কিছুকাল পরে অপর একটি জাপ মদতপুষ্ট গোষ্ঠী—মাঞ্চুরিয়ান বা ফেংতিয়ান গোষ্ঠী মাথাচাড়া দেয়, যারা প্রত্যেকেই চীনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস চালাচ্ছিল। এই সময়টাকে চীনের ইতিহাসে 'সমরনায়ক যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এইসব চীনা সশস্ত্র যুদ্ধবাজদের অর্থ ও অস্ত্র জোগানের মাধ্যমে চীনের অভ্যন্তরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত।

এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম যারা পিকিং-এর গদিতে বসে তারা হল জাপ মদতপুষ্ট আনহোয়েই গোষ্ঠী যার নেতা ছিল তুয়ান চি-যুই (Tuan Chi-jui)। ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা জাপানের কাছ থেকে ২০০ মিলিয়ন ইয়েন ঋণ নেয়, যা 'নিশিহারা ঋণ' (Nishihara loan) নামে পরিচিত। ১৯১৭-এর আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরেই এই গোষ্ঠী চীনকে বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সঙ্গী বলে ঘোষণা করে। অধিকাংশ চীনা নাগরিকের মতে, এই কাজের সঙ্গে চীনের প্রকৃত স্বার্থের কোনো যোগ ছিল না। চীনা পার্লামেন্টে প্রথম এই যুদ্ধে যোগদানের বিষয়টার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু সমরনায়ক গোষ্ঠীটি কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধিকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে, আর অন্যদের হিংস্রভাবে অত্যাচার করে, ভয় দেখিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

উয়ান-শী-কাই-এর মৃত্যুর পরে সান-ইয়াৎ-সেন চীনে ফিরে আসেন। বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তিনি ঘোষণা করেন যে, একমাত্র যে ধরনের যুদ্ধে চীন যোগ দিতে পারে তা হল চীনের উপর সমস্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে তিনি ক্যান্টনে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে তিনি চীনের একমাত্র আইনি সরকার বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সরকার গঠন প্রায় কোনোরকমের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছাড়াই হওয়ায় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

৫৮.৪ চীনের শিল্পায়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চীনের অভ্যন্তরে আধুনিক শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বিদেশি বাণিজ্য সংগঠনসমূহের কর্মচারীদের একটি বড় অংশকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় ; বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি াদের বাড়তি কর্মচারীদের দেশে পাঠিয়ে দেয়, অনেক কোম্পানি হয় তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, কিংবা তাদের কাজের পরিধি অনেকাংশে কমিয়ে আনে। এইসব কারণে চীনের জাতীয় শিল্পের বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়, যা ঊনবিংশ শতকের অসম চুক্তির বছরগুলিতে দেখা সম্ভব হয়নি।

চীনের শিল্পায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতকের শিল্পায়নের থেকে এই শিল্পায়ন ছিল মূলগতভাবে আলাদা। পূর্বেকার শিল্পায়ন ছিল উপর থেকে চাপানো,

যেখানে রাজকীয় মাঞ্চু সরকার তার অবক্ষয়ের শেষ বছরগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু বিশ শতকের শিল্পায়ন উপর থেকে চাপানো ছিল না ; তা ছিল সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে তলা থেকে উদ্ভূত। এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র উদ্যোগী শিল্পপতির নয়, একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ এবং আমলারাও যোগ দিয়েছিলেন। পূর্বেকার শিল্পায়নের মূল জোর ছিল শাসকশ্রেণীর সামরিক প্রয়োজন মেটানোর দিকে, সেখানে জোর ছিল ভারী শিল্পের বিকাশের উপর ; অন্যদিকে নতুন পর্যায়ে জোর পরে দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন হালকা শিল্পের বিকাশের উপর। তাই হালকা শিল্পের সঙ্গে ছোট ও মাঝারি ব্যবসারও বিস্তার ঘটেছিল। নতুন শিল্পের মধ্যে ছিল বস্ত্রশিল্প, খাদ্যদ্রব্য, সিগারেট, চিনি, টুপি, সাবান, কাগজ, কাচনির্মিত দ্রব্য, ন্যাপকিন, কার্পেট, সেলাই মেশিন, মদ প্রভৃতি। বস্তুত এই সময়টা ছিল চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের সময়। সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চীনের অর্থনীতির উপর জাপানের নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। তাই চীনের অর্থনীতি কখনই আধা-উপনিবেশের সীমারেখা ভেঙে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে যেতে পারেনি। তাই নবোদ্ভূত জাতীয় বুর্জোয়ার পক্ষে এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না।

৫৮.৫ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন

এই ধরনের পরিস্থিতির অন্যতম প্রকাশ ছিল যুদ্ধকালীন চীনের অভ্যন্তরে অভূতপূর্ব বৌদ্ধিক বিকাশ। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'নব্য যুগ' প্রত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধের মাধ্যমে কনফুসিয় নীতিকথা, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা, সামন্ত চীনের সমস্ত ধরনের সামাজিক ও দার্শনিক উপরিকাঠামোকে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে 'রেনেসাঁস' আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল কথ্য ভাষায় ('pai hua') গদ্য লেখার রীতির প্রবর্তন। সেইসময় সব ধরনের লেখা, এমনকি দৈনিক পত্রিকাতেও যে ভাষায় লেখা হত তা হল সনাতনী চীনা ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে চীনের কথ্য ভাষার সম্পর্ক অনেকটা লাতিন ভাষার সঙ্গে আধুনিক ইতালীয় ভাষার মতো। ফলে বিশেষ শিক্ষা না থাকলে সাধারণ চীনের পক্ষে কখনই সেই সেই ভাষা পড়া বা বোঝা সম্ভব ছিল না। যাঁরা লেখার ভাষায় মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে লু সুন ও মাও তুন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন পরবর্তী ৪ঠা মে আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৫৮.৬ ৪ঠা মে (১৯১৯) আন্দোলন—গোড়ার কথা

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে পিকিং-এর ছাত্ররা চীনের প্রতি জাপ সরকারের অপমানজনক দাবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র যুবছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা ক্রমশই একটা সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিপ্লবের রূপ নেয়। এই অন্দোলন চীনের ইতিহাসে ৪ঠা মে-র আন্দোলন নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই আরও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে ; তা শুধু একটিমাত্র বছরে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত, ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যার সূত্রপাত পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সভ্যতার সঙ্গে চীনের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার দিন থেকে। এই আন্দোলন হল সেই প্রক্রিয়ারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এই প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা দরকার। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে চীনে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় ; সামন্ত চীনা সমাজ সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হয়। যদিও ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে চীনে কলকারখানা গড়ে উঠতে তাকে, তবুও সেসবের বিস্তারলাভের বিশেষ সুযোগ সেখানে ছিল না, কারণ কমদামি ও উন্নতমানের বিদেশি দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না। একমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যখন যুদ্ধের কারণে বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি প্রচুর পরিমাণে কমে যায়, তখনই চীনের জাতীয় শিল্প কিছুটা বিস্তারলাভ করার সুযোগ পায়। বড় বড় শহরে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবুও সমগ্র দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই বিকাশ ছিল নিতান্তই নগণ্য। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে চীনের অভ্যন্তরে জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তির বৃদ্ধিক ঘটে, এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলি চীনের অভ্যন্তরের বাজার আবার দখল করে নেওয়ার ফলে চীনের সদ্যোজাত শিল্পগুলি বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চীনা সমাজ এতাবৎকাল এক ধরনের সামাজিক শক্তির ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকে ছিল রাজকীয় শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক গোষ্ঠী ; অন্যদিকে ভূস্বামীশ্রেণী, আর তাদের মাঝে ছিল জেন্ট্রিশ্রেণী। নতুন অবস্থায় এই সামাজিক ভারসাম্য আর রইল না। শহরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল নতুন সামাজিক শ্রেণী—নতুন বণিক, শিল্পপতি ও শহুরে শ্রমিকশ্রেণী। সামন্ত অর্থনীতির ভাঙনের ফলে জন্ম নিল বিরাট সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক। এদের অনেকেই নিজেদের গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, কেউ হত ভাড়াটে সৈন্য, কেউ ডাকাত, কেউ বা ভবঘুরে। বাস্তুহারা, ভবঘুরে এই যে বিশাল জনতা, তারাই ছিল সামন্ত 'সমরনায়কদের' (warlords) ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রধান অবলম্বন। ৪ঠা মে আন্দোলনের আগেকার বছরগুলিতে এই যুদ্ধবাজদের শক্তিসঞ্চয় ঘটেছিল। একই সঙ্গে পুরোনো ভূস্বামী ও জেন্ট্রিস ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। এই শ্রেণী ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তারা ক্রমশই চীনের সনাতনী মতাদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। 'চীন বাঁচাতে' স্লোগানের পতাকাতলে তারা অন্যান্য লোকদের ঐক্যবদ্ধ করে বস্তুত ৪ঠা মে আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে এই সমস্ত সামাজিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

৫৮.৬.১ প্রেক্ষাপট

যদিও চীনদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলনের বহু নজির পাওয়া যায়, তবুও কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ও গুরত্বের গভীরতার দিক থেকে দেখতে গেলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ৪ঠা মে'র বুদ্ধিজীবীরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, চীনকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিদেশি আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর থেকে 'জাতিকে বাঁচাও' এই স্লোগান বুদ্ধিজীবীরা বিশেষভাবে ব্যবহার করতে থাকেন। এটি ক্রমশই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিষময় প্রভাব যে চীনের পক্ষে নিদারুণ বিপর্যয় ডেকে আনছে, তা চীনের মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারেন। ১৯১৫ সালে চীনা সরকারের কাছে জাপ সরকারের ২১-দফা দাবি একটি গণ-জাগরণের সৃষ্টি করে।

১৯১৫ সালের ১৮ জানুয়ারি চীনে নিযুক্ত জাপ সরকারের মন্ত্রী হিওকি একি (Hioki Eki) চীনা রাষ্ট্রপতি উয়ান শি-কাই-এর কাছে 'একুশ-দফা দাবি' পেশ করেন। এই দাবিগুলি মানার অর্থ হল মাঞ্চুরিয়া, অন্তঃ-মঙ্গোলিয়া, শান্টুং, চীনের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকা এবং ইয়াংসি উপত্যকায় জাপানি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়া। এই দাবিগুলি মানার অর্থ এইসব এলাকায় জাপানের উপনিবেশ স্থাপন এবং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনকি নিয়ন্ত্রণ জাপ সাম্রাজ্যবাদের হাতে চলে যাওয়া। 'একুশ-দফা দাবি' সনদে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দাবিগুলি হল চীনের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী জাপানি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, জাপানি হাসপাতাল, চার্চস স্কুল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চীনা ভূখণ্ডে জাপ মালিকানা স্থাপনের অধিকার প্রভৃতি। এই দাবিদাওয়া নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন এইসব তথ্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে গণ-অসন্তোষ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিবাদের ধ্বনি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চার মাস ব্যাপী উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চলার পর জাপ সরকার ৭মে তারিখে চীনের কাছে হুমকি দেয়। সেই হুমকির কাছে নতিস্বীকার করে রাষ্ট্রপতি উয়ান-শি-কাই ৯মে সমস্ত দাবি মেনে নেন। এর অনিবার্য ফসস্বরূপ বিক্ষোভ আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আর শক্তি সঞ্চয় করে। ৭মে ও ৯মে তারিখ দুটি চীনা জাতির অপমানের দিন হিসাবে ধিকৃত হয়। ঐতিহাসিক চাও সে-সুং (Chow Ise-tsung)-এর মতে, 'একুশ দফা দাবি'র পেশের দুটি ফলাফল খুব স্পষ্ট। প্রথমত, এক নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়। অনেকেই উপলব্ধি করেন যে চীনা জাতিকে বেঁতে থাকতে হলে বিদেশি আগ্রাসনকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। স্কট নিয়ারিং (Scott Nearing)-এর মতে, এই উবলব্ধি পরবর্তীকালে ৪ঠা মে আন্দোলন চলাকালীন যে স্লোগানের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় তা হল "বৈদেশিক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গকে প্রতিহত করো" ('ওয়াই কাং চিয়াং-চুয়ান')। দ্বিতীয়ত, চীনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহির্দেশের এই যে চাপ, তা অল্প সময়ের জন্য হলেও চীনের ভেতরে এক জাতীয় ঐক্যের মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও পার্টি বিশেষত কুয়োমিন্টাং উয়ান-শি-কাই-এর সমর্থনে সমবেত হয়।

বস্তুত সেই সময় জাপ-বিরোধী গণআন্দোলনের বিকাশের পেছনে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল। ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'একুশ-দফা-দাবি'র বিরোধিতা করার জন্য গড়ে 'নাগরিকদের দেশপ্রেমী সমিতি।' ১৯১৫ সালের ১৮ মার্চ তারিখে সাংহাই শহরে প্রতিষ্ঠিত 'জাপ-বিরোধী কমরেডদের জাতীয় সমিতি' জাপানি জিনিসপত্র বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাংহাই শহরের সীমারেখা ছাড়িে এই বয়কট আন্দোলন অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি জাপানি দ্রব্য কেনাবেচা করে এমন বণিকরাও এই আন্দোলনে সামিল হয়। বয়কট আন্দোলন জাপানকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। জাপ সরকারের চাপে ২৫ মার্চ উয়ান-শি-কাই সরকার বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করার নির্দেশ জারি করে। সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করে বয়কট আন্দোলন বছরের শেষপর্যন্ত গড়ায়। এর ফলে একদিকে যেমন জাপানের বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরদিকে চীনের দেশি শিল্প বিকশিত হওয়ার কিছুটা সুযোগ পায়।

আধুনিক চীনের সংস্কার আন্দোলন বিদেশে শিক্ষালাভ করার পরে দেশে ফিরে আসা চীনা ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট হয়। যে সমস্ত দেশে চীনা ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলেন, সেগুলি হল আমেরিকা, জাপান ও ফ্রান্স।' 'একুশ-দফা-দাবি'র সংবাদ আমেরিকায় পাঠরত চীনা ছাত্রদের কাছে পৌঁছানোর পর সেখানে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চীনের এই জাতীয় সংকটের সময় চীনা

ছাত্রদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক বসে। কোনো কোনো ছাত্রদের মতে চীনা সরকারের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। আমেরিকায় পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হুশী। তিনি বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন না ; তাঁর মতে নতুন চীন গড়তে হলে শিক্ষাই তার ভিত্তি হওয়া উচিত। হুশী-র মতে 'সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের' প্রয়োজন, যার অর্থে 'পদ্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব'। এই বিপ্লবের অর্থ হল গদ্যের ভাষায় পদ্য লেখা। চীনের সাহিত্যক্ষেত্রে এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক ধারণা, যা সম্ভবত এসেছিল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আমেরিকার সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবে।

আমেরিকায় পাঠরত চীনা ছাত্ররা যেখানে সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক সমস্যা নিয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামাতেন, জাপানে পাঠরত ছাত্রদের দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। মূলত এইসব ছাত্ররাই ৪ঠা মে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ; আন্দোলনের জঙ্গি অংশ, নতুন সাহিত্যের অধিকাংশ সৃজনশীল লেখক এবং অনেক চরমপন্থী বিপ্লবী ছিলেন এই অংশের প্রতিনিধি। লু শুন-এর মতো সৃজনশীল বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী জাপানে অধ্যয়ন করেন। শুধু আমেরিকা কিংবা জাপান নয়, চীনের উপর ফ্রান্সের প্রভাবও নেহাত কম ছিল না। ফরাসি বিপ্লব লিয়াং চি-চাও, চেন তু-সিউ-এর মতো বেশকিছু চীনা বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাকে প্রভাবিত করেছিল। চেন তু-সিউ-এর চীনা সাহিত্যে বিপ্লবের ধারণা এসেছিল ফরাসি সাহিত্য পাঠ থেকে। বস্তুত, ৪ঠা মে আন্দোলনকে পরবর্তীকালে কখনও কখনও চীনের 'ফরাসি আলোকবর্তিতা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৯১৫ সালে জাপ সরকার কর্তৃক 'একুশ-দফা দাবি' পেশ করার পরে বেশকিছু সংখ্যক চীনা ছাত্র জাপান থেকে দেশে ফিরে আসেন। চেন তু-সিউ ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি 'নব্য যুবা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা ৪ঠা মে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যেহেতু সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল জটিল, তাই তিনি পত্রিকার মাধ্যমে কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন। পত্রিকাটির বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্য ছিল যুব সমাজের চিন্তা ও ব্যবহারের সংস্কার সাধন। হুশী-র মতো চেনও মনে করতেন যে চীনের রাজনৈতিক সমস্যার উৎস রয়েছে অনেক গভীরে। কিন্তু তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রও ছিল। হুশী যেমন জোর দিয়েছিলেন মূলত পাঠ্যক্রম, শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে, চেনের জোর পড়েছিল সনাতনী ঐতিহ্যের ভাঙন এবং চীনা যুব-সমাজের মতাদর্শগত পুনরুজ্জীবনের উপর।

১৯১৭ সালে শুরু থেকে সাহিত্যক্ষেত্রের বিপ্লব দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর নতুন বুদ্ধিজীবীদের নেতা সাই উয়ান-পাই (Tsai Yuan-Pei) পিকিং জীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার পদে যোগ দেন। সাই-এর ছত্রছায়ায় নব্য বুদ্ধিজীবীরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হন এবং সেই সময় থেকেই সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। নতুন চ্যান্সেলার আসার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাই-এর তত্ত্বাবধানে যেসব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী মতবাদের সহাবস্থান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যদিও সাই উয়ান পাই নিজে ছিলেন সান-ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী সংগঠন তুং মেং-হুই-এর প্রথম সদস্যদের অন্যতম, তবুও তিনি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজের রাজনৈতিক মতামতের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হতেন না। তাঁর কাছে শিক্ষাগত যোগ্যতাই প্রধান, আবেদনকারীদের

রাজনৈতিক বিশ্বাস কখনই বিচার্য নয়। তাই তাঁর সময়ে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী আবেদনকারীদের নিয়োগ করতে তিনি কখনও বাধা সৃষ্টি করেননি। তাঁর মতে, সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা সবসময়ই 'রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপরে' থাকবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা থাকার ফলে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের মধ্যে বিতর্ক চালানোর মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায়। পুরোনো রক্ষণশীল গবেষকদের সঙ্গো নব্য বুদ্ধিজীবীদের এই দ্বন্দ্ব নব্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

১৯১৮ সালে পিকিং-এর কিছুসংখ্যক ছাত্র 'নতুন জোয়ার' (Hsin Chao) 'পুনরুজ্জীবন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁদের পত্রিকার ঘোষিত নীতি ছিল তিনটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং পরিবর্তিত শব্দবিন্যাস। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি। এটি প্রকাশের সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষিত যুবসমাজ সেটিকে নিজের বলে সঙ্গো সঙ্গো স্বাগত জানায়। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে লো চিয়া-লুন লিখেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসে প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কোনো না কোনো জোয়ারের সঙ্গো যুক্ত, যাকে ঠেকানো যায়নি। রেনেসাঁস ছিল এমন একটি জোয়ার যা অন্ধকারময় যুগের পরে এসেছিল ; আর রিফর্মেশন ছিল ষোড়শ শতকের ইউরোপের জোয়ার। অষ্টাদশ শতকের মূল জোয়ার ছিল ফরাসি বিপ্লব, যা বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিংশ শতকের জোয়ার হল রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব। লো'র মতে সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পরস্পরের পরিপূরক এবং সমাজতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সাহায্য করবে। চাও সে-সং-এর মতে, তদানীন্তন ছাত্রনেতারা বলশেভিক বা মার্ক্সবাদী ছিলেন না ; তাদের চিন্তাভাবনা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক ধরনের দুর্বল মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

'নতুন জোয়ার' সমিতির বিপরীত মেরুতে ছিল অপর একটি সমিতি, যার নাম 'জাতীয় ঐতিহ্য' (Kuo-Ku)। এই সমিতির সদস্য ছিলেন কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্র। তাঁরা সাবেকী ভাষা ও রচনাপদ্ধতি, কনফুসিয় মতবাদ, পুরোনো নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু এই মতবাদ বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সমর্থন পায় তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। সম্পাদকের কলামে বহু চিঠি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, যা থেকে এটা স্পষ্ট যে নতুন আন্দোলন সত্যি সত্যিই এক গণ-জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এমন অনেকের চিঠি পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয় যাঁরা আধুনিক চীনে রাজনীতিগত ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত নাম। আন্দোলনের প্রভাবে ১৯১৭ সাল থেকে অনেক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, যেমন হুনান প্রদেশে মাও সে-তুং প্রতিষ্ঠিত 'নতুন গণ-অধ্যয়ন সমিতি', তিয়েনসিনে চৌ এন-লাই প্রতিষ্ঠিত 'জাগরণ সমিতি' প্রভৃতি। ক্রমশ বুদ্ধিজীবীরা দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী অংশে বিভক্ত হয়ে যান। দক্ষিণপন্থী অংশের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল 'অ-রাজনৈতিক' সাংস্কৃতিক বিষয়ের মধ্যে। অপরদিকে বামপন্থী অংশের মতে চীনা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন আনতে তাহলে তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই করতে হবে। প্রথম অংশের মুখপাত্র ছিলেন হুশী, আর দ্বিতীয় অংশের ছিলেন মাও সে-তুং।

৫৮.৬.২ আশু কারণ

৪ঠা মে আন্দোলনের আশু কারণ হল ১৯১৯-এর ভার্সাই শান্তি অধিবেশনে শানটুং সমস্যা সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গের মনোভাব। এর আগে জার্মানি শানটুং-এর বেশকিছু সুযোগসুবিধা ভোগ করত। অধিবেশনে চীনের দাবি ছিল শানটুং-এর উপর থেকে বিদেশি শক্তিবর্গের সমস্ত সুযোগসুবিধা অবসান, "একুশ-দফা দাবি'২ বাতিল করা, শানটুং-এ জার্মানির এবং পরে জাপানের সমস্ত সুযোগসুবিধা বিলোপ ইত্যাদি। কিন্তু চীনা সরকারের এইসব দাবির কোনোটাই মানা হয়নি ; জার্মানির ভোগ করা পুরেনো অধিকারসমূহ দেওয়া হল জাপানের হাতে এবং চীনের অন্যান্য দাবির কোনটাই আলোচনা করারই প্রয়োজন বলে মনে করা হল না।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের এই ব্যর্থতা চীনের মানুষের হতাশা বাড়িয়ে দিল। তাঁরা এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৫৮.৬.৩ আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রসার

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে পিকিং-এর যুবছাত্ররা এক সুবিশাল বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করনে। তাঁদের দাবি ছিল, 'একুশ দফা দাবি'তে যেসব চীনা অফিসারেরা স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের শাস্তি দিবে হবে। বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে পিকিং-এর ছাত্ররা ধর্মঘটে সামিল হল। ৩রা জুন তারিখে চীনা সরকার ৩০০ জনের বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, এবং সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

৪ঠা মে থেকে ৩ জুন হল আন্দোলনের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরের সূত্রপাত তারপর থেকে। এই স্তরে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু পিকিং থেকে সাংহাই-এ সরে আসে। নতুন স্তরে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ৫ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত সাংহাই শহরের বস্ত্রশিল্প ও ধাতুশিল্প, পরিবহন ও অফিসে কর্মরত ৭০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন। জাপানী মালিকানাধীন বস্ত্র কারখানা এবং আমেরিকা, ব্রিটিশ ও ফরাসি সংস্থাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকেরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেন। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এটি ছিল চীনের ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট। এই আন্দোলনে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীও যোগ দেয়। আন্দোলনের ফলে যেহেতু চীনাদ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়, তাই সাংহাই-এর বুর্জোয়া ছাত্র আন্দোলনকে সহানুভূতির চোখে দেখতে থাকে। ৫ই জুন শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি নিজেদের ব্যবসা বন্ধ রাখে এবং তার অব্যবহিত পরেই সাংহাইয়ের দেখাদেখি অন্যান্য শহরের বুর্জোয়ারাও আন্দোলনে সামিল হয়।

এইভাবে ৪ঠা মে'র আন্দোলন পিকিং-এর সীমারেখা ছড়িয়ে অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে আর শ্রমিক, যুবছাত্র, বণিক এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের নিয়ে এক ব্যাপক দেশপ্রেমী গণআন্দোলনের চেহারা নেয়। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে চীন সরকার ধৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয় এবং প্যারিস শান্তিতে যোগদানকারী চীনা প্রতিনিধিদের ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। এটা ছিল ৪ঠা মে আন্দোলনের এক বিরাট বিজয়।

৫৮.৬.৪ আন্দোলনের গুরুত্ব

চাও সে-সুং-এর মতে, ৪ঠা মে-র আন্দোলন কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক দিয়ে চীনের

ইতিহাসে এক নজীরবিহীন ঘটনা। এবারই প্রথম চীনের বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করলেন যে, সনাতনী চীন সভ্যতার সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গো যোগাযোগের আগে, চীনা সভ্যতা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাদ দিলে, কখনই বিদেশি সভ্যতার দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হয়নি। আফিং যুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ; তখন থেকেই বুদ্ধিজীবীদের এই সত্য বুঝতে অসবিধা হয়নি যে চীনকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটা ছিল চীনের প্রতিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়, যা ১৮৯৪-৯৫ সালের যুদ্ধে জাপানের হাতে চীনের পরাজয় পর্যন্ত চলেছিল। এর পর থেকেই দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ, যখন বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারলেন যে চীনকে শুধু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থেমে থাকলে চলবে না, সেই শিক্ষার আদলে নিজেদের আইন ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও গড়ে তুলতে হবে। এর পর এল তৃতীয় পার্যায়: ৪ঠা মে আন্দোলনের যুগ। নয়া বুদ্ধিজীবীরা বললেন যে চীনের দর্শন ও সামাজিক তত্ত্বগুলিকে পাশ্চাত্যের আদলে ভালভাবে পুনর্বিশ্লেষণ করতে হবে। এটা কোনো আংশিক পরিবর্তন নয় ; এটা পুরোনো ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন এবং তার স্থলে সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

৫৮.৬.৫ আন্দোলনের সাফল্য

৪ঠা মে আন্দোলন শুরু হওয়ার পহর থেকে বহু সংখ্যক বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। একই সঙ্গো সনাতনী সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে আঘাত করার প্রবণতাও বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পুরোনো চিন্তা ও কাঠামো সমালোচিত হয়। পুরোনো চিন্তাভাবনার স্থলাভিষিক্ত হয় নতুন চিন্তাভাবনা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে। পূর্বেকার তাইপিং বিদ্রোহীদের মতো এই নব্য বুদ্ধিজীবীরাও কনফুসিয় মতবাদকে আক্রমণ করেন। কনফুসিয়াসের নাম করে সর্বপ্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। 'নব্য যুবা' পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধের লেখক ছিলেন ই পাই-শা। তাঁর মতে চীনের চিন্তাজগতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দাবি করার কোন অধিকার কনফুসিয় মতাদর্শের থাকতে পারে না। তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চেন-তু-সিউ-এর মতে, কনফুসিয় মতবাদ সামন্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত, তাই আধুনিক সমাজের চাহিদা তা পূরণ করতে পারে না। কনফুসিয় মতাদর্শ সর্বদাই বশ্যতা স্বীকার করার নীতিকথা বলত এবং সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার বিরোধী ছিল। অপর সমালোচক উ ইউ (Wu Yu)-এর মতে, কনফুসিয় মতবাদের পিতৃতান্ত্রিকতার পৃষ্ঠপোষকতা স্বৈরাচারের ভিত্তি ছিল। নব্য বুদ্ধিজীবীরা একই সঙ্গো পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি ধ্যানধারণাকে সমালোচনা করেন।

মতাদর্শগত ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের সঙ্গো আসে লেখার ক্ষেত্রে কথ্য ভাষার ব্যবহার। নতুন ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, যার ভিত্তি ছিল মানবিকতা, রোম্যান্টিকতা ও বস্তুনিষ্ঠা। ছাপাখানার বিস্তারের সঙ্গো সঙ্গো জনশিক্ষার প্রসার ঘটে। সেই যুগের নব্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে নামটি সম্ভবত একেবারে প্রথমে উচ্চারিত হত, তা হল লু সুন। তাঁকে 'চীনের গোর্কি' নামে অভিহিত করা হয়। লু সুন ছিলেন নতুন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। অসংখ্য ছোট গল্পের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা, নানাবিধ কুসংস্কার ও পুরোনো মূল্যবোধকে তীব্রভাষায় আক্রমণ

করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক সংগ্রামী লেখক। সু মউ-ইয়ুং (Hsu Mou-Yung) তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের ভলতেয়ার-র সঙ্গো তুলনা করেছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রেও নানাবিধ মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাবেকী পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের ঠিক করে দেওয়া বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ গুরুত্ব পেতে থাকে। পুরোনো পরিবার ও গোষ্ঠী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চীনের যুবছাত্ররা সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে থাকে। সামন্ত চীনা সমাজে মেয়েদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। মাও সে-তুং-এর ভাষায় তারা চারটি শৃঙ্খলে বাধা ছিল : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত এবং স্বামীর। বহু নারী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য হলে আত্মহত্যা করতেন। ৪ঠা মে'র আন্দোলন চীনা নারীদের দুরবস্থার কথা বার বার তুলে ধরে। মেয়েদের আত্মহত্যার ঘটনা মাও সে-তুং-কে বেশকিছু নিবন্ধ লিখতে উদ্দীপিত করেছিল। সেইসমস্ত রচনায় তিনি সামন্ত সমাজকে এইজন্য দায়ী করেছিলেন এবং তাদের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করার প্রয়োজনীয়তা বার বার তুলে ধরেছিলেন। নারীদের সন্তান প্রতিপালন ও গেরস্থায়ী সামলানোর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সমবায় ব্যবস্থা, নার্সারি, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির কথা বলা হয়। সনাতনী শৃঙ্খলের বন্ধন ভেঙে মেয়েরা বেরিয়ে আসতে শুরু করে ; বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তারা অংশগ্রহণ করতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ৪ঠা মে আন্দোলন চীনের অভ্যন্তরে এক 'পারিপারিক বিপ্লব' গতে তুলতে সক্ষম হয়।

চীনের অর্থনৈতিক কাঠামোতেও আসে পরিবর্তন। সেই সঙ্গো ভূস্বামীদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, কৃষকশ্রেণীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, শহুরে মানুষদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৪ঠা মে আন্দোলন চীনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে থাকে। জাতি-রাষ্ট্রের আদলে তা চীনকে ঐক্যবন্ধ করতে সাহায্য করে। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারণা ক্রমশ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় গুরুত্ব পেতে থাকে আর যুদ্ধবাজদের আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়। এই আন্দোলন অপর ফলশ্রুতি ১৯২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। লুসিয়েন বিয়াংকোর মতে, ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯৪৯ সালের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল।

৫৮.৬.৬ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

৪ঠা মে'র আন্দোলনের সুবিশাল সাফল্য থাকা সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতার দিকও ছিল। চাও সে-সুং-এর মতে, ৪ঠা মে'র আন্দোলন চীনের সাবেকী ঐতিহ্যকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেনি, তাই কনফুসিয় মতাদর্শ ও জাতীয় ঐতিহ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়নি। সংস্কারবাদীরা গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্যের যথেষ্ট অভাব দেখিয়েছেন। চাও-এর মতে, এটা এক ধরনের সীমাবদ্ধতা হলেও তা হয়ত এড়ানো সম্ভব হত না।

৫৮.৬.৭ আন্দোলনের মূল্যায়ন

৪ঠা মে আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মূল বিতর্ক দুটি

দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে : একটি উদারনৈতিক, অপরটি কমিউনিস্ট পার্টির। উদারনৈতিক মতাবাদের প্রবক্তাদের মতে আছেন হুয়াং ইয়ান-ইয়ুং, চেন তু-সিউ ও হুশী, আর কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রতিনিধি মাও সে-তুং।

উদারনীতির প্রবক্তাদের মতে, ৪ঠা আন্দোলন "চীনের পুনর্জন্ম"। যার সঙ্গো "ইউরোপীয় রেনেসাঁস'-এর মিল রয়েছে। এই আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে যুক্তি ও ঐতিহ্য, স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ; একই সঙ্গো তা জনসাধারণের কথ্য ভাষায় এক নতুন সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে।

চাও সে-সুং অবশ্য ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সঙ্গো এই তুলনাকে সঠিক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে উভয়ের মধ্যে মিলনের তুলনায় অমিল অনেক বেশি। প্রথমত, মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে এক বাণিজ্যিক বিপ্লব ঘটে যার ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ঘটার সঙ্গো সঙ্গো বহির্বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনে দাবিও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে চীনের আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এই ধরনের বিস্তারের কোনো সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এ মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল সুপ্রাচীন গ্রীক-রোমান ধ্যানধারণা, অর্থাৎ আরও পুরোনো ধারণার পুনঃস্থাপন। কিন্তু ৪ঠা মে আন্দোলন পুনঃস্থাপনের আন্দোলন ছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো সভ্যতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে পুরোনো সমাজের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার ধ্যানধারণা প্রোথিত করা। 'কনফুসিয় মতবাদ নিপাত যাক' এটাই ছিল সে যুগের মূল ধারা। যদি সেখানে কোনো পুনঃস্থাপন হয়েও থাকে, তবে সেটা হল পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে প্রাচীন চীনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা। চাও-এর মতে, চীনের রেনেসাঁস-এর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল যে, ৪ঠা মে আন্দোলনে কথ্যভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা মাও সে-তুং-এর মতে, ৪ঠা মে আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ত-বিরোধী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লম্ফনের একটি বিন্দু। প্রাচীন নীতিবোধ ও প্রাচীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য। চীনের ইতিহাসে এটা ছিল নজীরবিহীন ঘটনা। মাও-এর মতে, ৪ঠা মে আন্দোলন ছিল পুরোনো ও নতুন গণতন্ত্রের মধ্যে বিভাজন রেখা ; রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এর জন্ম। এটা ছিল বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের একটি অংশ। এটা ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট যেখানে চীনের শ্রমিক, যুবছাত্র ও নবোদ্ভূত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো সন্দেহ নেই ১৯১৯-এর ৪ঠা মে'র আন্দোলন চীনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

৫৮.৭ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম (১৯২১)

১৯১৯-এর ৪ঠা মে আন্দোলনের পরবর্তীকালে চীনের শ্রমিক আন্দোলন বিস্তারলাভ করতে থাকে। কমিউনিস্ট মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ চীনা বুদ্ধিজীবীরা সাংহাই, হুনান এবং অন্যান্য এলাকার শ্রমিকদের সঙ্গো যোগাযোগ করেন, বিভিন্ন এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, আংশিক সময়ের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পিকিং, সাংহাই, কোয়াংচৌ এলাকায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনা প্রচার করা হয়। এইভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে সাংহাই শহরে প্রথম মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। একই বছরের আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের সমাজতান্ত্রিক যুব লিগ। একই সময়ে পিকিং, হ্যাংকোউ, চাংশা এবং অন্যান্য বহু এলাকায় মার্ক্সবাদী গোষ্ঠী ও সমাজতান্ত্রিক যুব লীগ গড়ে ওঠে। এছাড়া দেশের বাইরে প্যারিস ও টোকিওতে একই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। অবশেষে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সাংহাই শহরে চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়।

৫৮.৮ সারাংশ

১৯১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের স্বার্থে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদিত সাং-ইয়াৎ-সেন ক্ষমতাত্যাগী সামন্ত রাজবংশ কর্তৃক নিযুক্ত উত্তরাধিকারী, ইউয়ান শিকাই-এর পক্ষে পদত্যাগ করেন। সান-এর যুক্তি ছিল, তিনি গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ এড়াতে চান, প্রজাতন্ত্রের অধীনে সকল গোষ্ঠীকে আনতে চান এবং নতুন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক দায়িত্বের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বিদেশি ঋণ নিশ্চিত করতে চান। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ইঙ্গিত দিয়েছিল, ইউয়ান প্রেসিডেন্ট না হলে এসব স্থগিত থাকবে।

১৯১৩ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ইউয়ান শিখাই-এর দুর্বল হাঁটু নীতি এবং দেশে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সংঘটিত হয়। এটা ছিল চীনের দক্ষিণামণ্ডলীয় প্রদেশগুলোতে কয়েকটি বাহিনীর সামরিক অভ্যুত্থান এবং কয়েক মাসের যুদ্ধের পর তা দমিত হয়।

নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন সান-ইয়াৎ-সেন। ১৯১৪ সালের প্রথমদিকে পুনরায় ইউয়ানকে উৎখাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি জাপানে একটি নতুন সংঘবদ্ধ এবং কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন চোং হুয়া ফেমিং তাং (চীনা বিপ্লবী পার্টি) প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৪ সালের আগস্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নতুন ঘটনাপ্রবাহ দেখা দেয়। মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দেয় জাপানিরা। এই ডামাডোলে ১৯১৬ সালে ইউয়ান সি কাই সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

এরপর চীনের শাসন দুই প্রাদেশিক সামন্ত সমরবাদী চক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। এর একটি হচ্ছে জাপান সমর্থিত আনহুই প্রদেশের চক্র, অন্যটি হচ্ছে ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সমর্থিত চিলি (হোপেই) প্রদেশের চক্র। এর আরো কিছুদিন পরে আর একটি জাপানপন্থী চক্র, মাঞ্চুরীয় অথবা ফেংথিয়ান চক্র দেশব্যাপী শাসনের বাড়তি প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এভাবেই 'সমরপ্রভু যুগ'-এর সূচনা ঘটে।

'সমরপ্রভুর যুগ' শেষ হয়ে আসে চীনের নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে। চীন বিপ্লবের একটি চরম পরিণতিমূলক ঘটনা হচ্ছে ১৯১৯-এর ৪ঠা মে'র আন্দোলন। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে এ ঘটনা ঘটে। সংখ্যায় কম হলেও, চীনের মার্ক্সবাদীরা ৪ঠা মে'র আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৪ঠা মে'র পরে মার্ক্সবাদীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। পেইচিং (লি তা চাও এবং অন্যান্য), শাংহাই, হানখৌ (তোং পিউ এবং অন্যান্য), ছাংশা (মাও জে দং-এর নেতৃত্বে) চিনান, হাংচৌ

এবং বিদেশে অধ্যয়নরত চীনাদের মধ্যে (চৌ এন লাই এবং অন্যান্যদের মত প্যারিসে) কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠিত হয়। অবশেষে, ১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সাংহাই-এ।

৫৮.৯ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(ক) ইয়ান সী-কাই কীভাবে চীনে এক সামরিক একনায়কত্ব গড়ে তোলেন ?

(খ) কোন্ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের জন্ম, তা পর্যালোচনা করুন।

(গ) ৪ঠা মে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(ঘ) ৪ঠা মে আন্দোলনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) চীনের ইতিহাসে ৪ঠা মে আন্দোলনের গুরুত্ব কী ?

২। টীকা লেখ :

(ক) 'সমরনায়কদের যুগ' ; (খ) চীনের শিল্পায়ন ; (গ) 'একুশ-দফা দাবি' ; (ঘ) সাই উয়ান-পাই ; (ঙ) চেন তু-মিউ ; (চ) লু সন।

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Isreal Epstein : From Opium War to Liberation.

২। Jean Chesneaux : From the 1911 Revolution to Liberation.

৩। Jian Bogan, Shao Xungzeng & Hunua : A Concise History of China.

৪। Chow Tse-tsung : The May 4th Movement Intellectual Revolution in Modern China.

৫। Lucien Brinio : Origins of the Chinese Revolution.

৬। Amitendranath Tagore : Literary Debotes in Modern China 1919-1937.

একক ৫৯ ❐ সংবিধান পরবর্তী যুগে জাপান। ১৮৯০-১৯১৫ সাল পর্যন্ত জাপানে সমরবাদের উত্থান এবং আধুনিকীকরণ

গঠন

৫৯.০ উদ্দেশ্য

৫৯.১ প্রস্তাবনা

৫৯.২ জাপানে সমরবাদের উত্থান

৫৯.৩ চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)

৫৯.৩.১ চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের উদ্দেশ্য

৫৯.৩.২ চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

৫৯.৩.৩ চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফল

৫৯.৪ রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫)

৫৯.৪.১ রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ

৫৯.৪.২ রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল

৫৯.৫ জাপানের সম্প্রসারণশীল পররাষ্ট্র নীতি

৫৯.৫.১ চীনের অভ্যন্তরে জাপ-আগ্রাসন (১৯০৫-১৯১৫)

৫৯.৫.২ চীনের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া

৫৯.৬ সারাংশ

৫৯.৭ অনুশীলনী

৫৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৯.০ প্রস্তাবনা

এই এককটি অধ্যয়ন করে আপনি যে যে বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পারবেন তা হল—

- একটি রুদ্ধদ্বার রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তির অনুপ্রবেশের পর কীভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিল।
- কী পরিস্থিতি জাপানে সমরবাদের উত্থান ঘটায়।
- জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার বীজ কোথায় নিহিত ছিল।
- সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প হল। জাপান এবং তার পররাষ্ট্র নীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।
- সমরবাদের কারণে জাপান তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপরই তার জঙ্গি নতি প্রয়োগ করল।

৫৯.১ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে জাপানের উত্থান। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিরিশ বছর জাপানে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল যার ফলে জাপান একটি সামন্ততান্ত্রিক ও দুর্বল রাষ্ট্র থেকে আধুনিক দেশে পরিণত হয় এবং এই বিবর্তনের ফলে জাপানের জাতীয় জীবনও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় জাপানে বিকশিত হয় সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। এই দুটি হাতিয়ার জাপানকে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে।

৫৯.২ জাপানে সমরবাদের উত্থান

জাপানে সমরবাদের উত্থানের সঙ্গো সেদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তা ক্রমে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গো অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। বস্তুত বিদেশি শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখার তাগিদে সামরিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত, তা পরে পররাজ্য গ্রাসের লক্ষ্যে ধাবিত হয়। এই সমরবাদের উত্থানকে বুঝতে হলে সেই সময়কারক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

১৮৬০-এক দশকে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন ঘটেন। ১৮৬০-এর দশক থেকে ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ চীনে নিযুক্ত নৌবাহিনীর আকার কমিয়ে আনা হয় ; একই সঙ্গো কয়লার যোগান যথেষ্ট না থাকার ফলে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সামরিক শক্তি যা ছিল, তার দ্বারা সমস্ত চুক্তি-বন্দরগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় ব্রিটেনের সামরিক ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল, আর সেইসঙ্গো অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি তো ছিলই। তাই এশিয়ার যে সমস্ত দেশের পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলির আগ্রাসনের সম্ভাবনা ছিল, তাদের কারুর পক্ষেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা বোঝা সম্ভব ছিল না। পাশ্চাতে শক্তিবর্গের এই চাপ জাপানের অভ্যন্তরে এক ধরনের সংকটের জন্ম দেয়, যা জাপানের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষক শিনিয়া সুগিয়ামা-র মতে, প্রথম দিকে এই এলাকার ব্রিটেনের আধিপত্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে ; কিন্তু ১৮৮০-র দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে জাপান যেরকম প্রায় বিনা বাধায় কোরিয়া ও চীনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ করতে থাকে তাতে এটা স্পষ্ট হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটেনকে যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক না কেন, তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে।

মেইজি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে জাপানের আধুনিকীকরণ এবং সামরিকীকরণের পিছনে

জাপান বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, এই ধারণা যেমন কাজ করেছিল, ঠিক তেমনি জাপানের পুঁজিবাদের বিকাশ তাকে বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং অবশেষে পররাজ্য-গ্রাসের দিকেও ঠেলে দিয়েছিল। তাই জাপানের সামরিকীকরণের গুরত্ব অন্য যে-কোনো জিনিসের গুরুত্বের চেয়ে কম ছিল না। বস্তুত তোকুগাওয়া যুগের শেষ ভাগ থেকে জাপানের সামন্ত শাসকেরা এই ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে মেইজি শাসনের প্রথমেই সরকার কিছু সামরিক সংস্থা, গোলন্দাজ বাহিনী, নৌ বিশেষজ্ঞ এবং পাশ্চাত্যের সামরিক কলাকৌশল সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ ওসাকা শহরের অস্ত্রাগার এবং ইয়োকোসুকার নৌবন্দর নতুন সরকারের করায়ত্ত হয়। বাকুফুর আমলের শেষভাগে ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে জাপবাহিনীকে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টা করা হয়, যা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে। একই সঙ্গো সাতসুমা গোষ্ঠী একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করে আর চোশু গোষ্ঠী ইউরোপের ধাঁচে একটা স্থলবাহিনী গড়ে তোলা এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিত যদি আমরা মনে রাখি তবে মেইজি সরকার কেন সামরিক সংস্কারের কাজটা এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল, তা আমরা বুঝতে পারব।

১৮৭৮ সালে ইয়াগামাতা জার্মানির ধাঁচে জাপ সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। একটি সামরিক কমান্ড গড়ে তোলা হয়। ১৮৭৯ সালে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক কাজ করার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৮৮৩ সালে সেটার মেয়াদ আরও বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়। এর ফলে শান্তির সময়ে বাহিনীর সংখ্যা তাকে ৭৩ হাজার আর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষেরও বেশি। ১৮৯৪ সাল নাগাদ এই বাহিনীর হাতে আসে আধুনিক রাইফেল ও কামান, যার অধিকাংশই জাপানের অস্ত্রকারখানায় তৈরি। ১৮৮৩-এর পরবর্তী দশকে গড়ে ওঠে একটি স্টাফ কলেজ, কাজের আরও বিশেষীকরণ (পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার, জোগান দপ্তর), প্রশিক্ষণ-পদ্ধতির উন্নতি এবং সামরিক বাজেটের বরাদ্দ প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি।

একইসঙ্গো নৌবাহিনীও বিস্তারলাভ করে, যদিও এক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরতা বেশি ছিল। ১৮৭২ সালে নবগঠিত নৌ-মন্ত্রিসভার হাতে ছিল ১৭টি যুদ্ধ-জাহাজ, যার মোট ওজন ছিল ১৪ হাজার টন। ১৮৭৫-৭৬ সাল নাগাদ যুক্ত হয় মাঝারি আয়তনের দুটি জাপানি জাহাজ, ১৮৭৮ সালে তিনটি বড় রণতরী কেনা হয় ইংলন্ড থেকে, আর ১৮৮২, ১৮৮৬ ও ১৮৯২ নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণ ও কেনার কর্মসূচী ঘোষিত হয়। ১৮৯৪ সালে চীনের সঙ্গো যুদ্ধের সময় জাপানের হাতে ছিল মোট ৫৭,০০০ টন ওজনের ২৮টি আধুনিক রণতরী আর ২৪টি টর্পেডো নৌকা। জাপানের এই সামরিকীকরণ থেকে বোঝা যায় সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্তুত জাতীয় বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ ছিল সামরিক ও নৌবাহিনীতে খরচের জন্য। সামরিক শিল্প সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল, একই সঙ্গো সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস, যেমন তার ব্যবস্থা, সেটাও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৮৯০ সালে টেলিফোন ব্যবস্থা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার সময় থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। জাপানি রেলব্যবস্থার ৩০ শতাংশ ছিল সরকারের তৈরি ; ১৯০৬ সালে তার জাতীয়করণ হয় এই উদ্দেশ্যে যে সামরিক

প্রয়োজনে তার সঠিক বিকাশ ঘটানো যাবে। বস্তুত জাপানের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গো সামরিকীকরণের প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল।

৫৯.৩ চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)

পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে পশ্চিমদিকে সাগরপারে অবস্থিত চীন, কোরিয়া কিংবা মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব জাপানের কাছে কতখানি। বস্তুত এই তিনটি ভূখণ্ডে ছিল তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের পথে নিকটতম ভূখণ্ড। তাই এইসব ভূখণ্ডের গুরুত্ব জাপানের কাছে নেহাত কম ছিল না। এমনকি বিদেশিদের সঙ্গো চুক্তি স্বাক্ষরের অন্ধকারময় দিনগুলিতে যখন প্রমাণিত জাতীয় দুর্বলতার জন্য শাসকশ্রেণীর মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনও ইওশিদা শোইনের মতো লোকেরা মনে করতেন যে, মহাদেশীয় ভূখণ্ডে পা রাখতে না পারলে আধুনিক পৃথিবীতে জাপানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। পরবর্তীকালে সাইগো তাকামোরির ক্রিয়াকলাপ এই ধ্যানধারণাকে পুষ্ট করেছিল। ১৮৮১ সালে সাইগোর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীরা জেনিওশা নামে একটি উগ্র দেশপ্রেমী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল এই ধরনের সম্প্রসারণবাদী চিন্তার বিস্তার ঘটানো, সরকারি নেতৃবৃন্দের উপর চাপ দেওয়া এবং উগ্র জাতীয়তাবাদেহর পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। কোরিয়া ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই কোরিয়া ছিল বিভিন্ন মহলের বিতর্কের কেন্দ্র এবং অনেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা জাপানের স্বার্থেই প্রয়োজন।

৫৯.৩.১ চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের উদ্দেশ্য

ঐতিহাসিক বিস্‌লি (W.G. Beasley)-র মতে, এর পেছনে সম্ভবত দুটি কারণের যে-কোনো একটি কাজ করেছিল। প্রথম, জাপান যেভাবে সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ করেছে, কোরিয়াকে সেইভাবে জাপানের অভিভাবকত্ব থেকে সংস্কারমূলক কাজ করতে হবে, যাতে করে পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে সঙ্গী হিসাবে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হল, জাপানকে অবশ্যই পাশ্চাত্য শক্তি-বিরোধী একটি সংঘ গড়ে তুলতে হবে, আর সেখানে চীন ও কোরিয়াকে যে কোনোভাবে হোক যোগ দেওয়াতে হবে, কারণ এটা ছাড়া তারা কেউই পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষণের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। বস্তুত জাপানের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার নতুন শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

৫৯.৩.২ চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

বস্তুত ১৮৯৪-৯৫-এর চীন-জাপান যুদ্ধ বেধেছিল কোরিয়ার উপর অধিকার নিয়ে। ১৮৭৬ সালে জাপান কোরিয়াকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে তাদের দুটি বন্দর জাপানি ব্যবসার প্রয়োজনে উন্মুক্ত করতে। কিন্তু চীন তার বিরোধিতা করে এই বলে যে যেহেতু কোরিয়া চীনের অধীন রাষ্ট্র (Vassual state), তাই সে অপর কোনো দেশের সঙ্গো এই ধরনের কোন চুক্তিতে আবন্ধ তে পারে না। এটাই হল দু'পক্ষের বিবাদের সূত্রপাত। চীন ও জাপান উভয় পক্ষই নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্য

কোরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গো গাঁটছড়া বাঁধে, যার পরিণতি হল ১৮৮৪ সালের শেষভাগে সিউল শহরে চীনা ও জাপানি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ। আলোচনা মাধ্যমে অবশ্য সাময়িককালের জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়।

কিন্তু ১৮৯৪ সালে আবার পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। জুন মাসে কোরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এক বিশাল সামন্ত-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়, যা টং-হাক অভ্যুত্থান নামে পরিচিত। কোরিয়ার রাজা চীনের অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্রোহ দমনের জন্য মাঞ্চু রাজবংশের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। চীন সঙ্গো সঙ্গো উত্তর কোরিয়াতে সামরিক বাহিনী পাঠাল। জাপ সরকার এই সৈন্য পাঠানোর বিরোধিতা করল এই যুক্তিতে যে, ১৮৮৫ সালে চীন ও জাপান স্বাক্ষরিত কনভেনশন অনুযায়ী কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে না জানিয়ে কোরিয়াতে সৈন্যবাহিনী পাঠাবে না। তাই জাপানও চীনা সৈন্য পাঠানোর প্রত্যুত্তরে দক্ষিণ কোরিয়ায় সৈন্যবাহিনী পাঠাল। টং-হাক বিদ্রোহ দমন করা হলেও এই পরিস্থিতি নতুন সংকটের সৃষ্টি করল। জাপানের কাছে কোরিয়ার গুরুত্ব ছিল অনেক। কোরিয়া ছিল জাপানের বহির্বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। সামরিক দিক থেকেও তার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। কোরিয়া ছিল উত্ত-পূর্ব এশিয়ায় জাপ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবেশদ্বার। তাই চীনের হাতে কোরিয়াকে ছাড়া জাপানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। চীন ছাড়া জাপানের কাছে দ্বিতীয় বিপদ ছিল রাশিয়া, যে ইতিমধ্যেই নিকটবর্তী সাইবেরিয়া অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। তাই জাপানের পক্ষে প্রয়োজন ছিল দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার।

জুন মাসের শেষে জাপ সরকার জানাল যে, যতদিন পর্যন্ত কোরিয়া জাপানের কথামতো বেশকিছু সংস্কারমূলক কাজ না করবে, ততদিন জাপবাহিনী কোরিয়ায় অবস্থান করবে। এইসব সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কোরিয়ার চীনের প্রভাব কমিয়ে এনে জাপানের প্রভাব বাড়ান এবং চীনের সমস্ত ধরনের বিশেষ সুবিধার অবসান। জুলাই মাসে জাপান চীনকে এই বলে হুমকি দিল যে তারা যেন আর সৈন্য না পাঠায়, আর তার অল্প পরেই জাপানীরা কোরিয়া রাজপ্রসাদ দখল করে নেয়। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

৫৯.৩.৩ চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফল

১৮৯৪-৯৫ সালের এই যুদ্ধে জাপান বিজয়ী হয়। ১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা **শিমোনোসেকির চুক্তি** নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, যার অর্থ কোরিয়ার উপর চীনা আধিপত্যের অবসান। চীনা ভূখণ্ড ফরমোসা (তাইওয়ান) সহ লিয়াওটুং পেনিনসুলা (পোর্ট আথার সহ) জাপানের করায়ত্ত হল ; চারটি নতুন চীনা শহর বহির্বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হল ; জাপান চীনের অভ্যন্তরে কারখানা নির্মাণের অধিকার পেল ; চীন নগদ মূল্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জাপানকে ক্ষতিপূরণ দেবে বলে স্বীকার করল।

চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। একদিকে তা চীনের দুর্বলতাকে আরও বেশিভাবে প্রকট করে তুলল। অন্যদিকে তা জাপানের আধুনিকীকরণের সাফল্য দেখিয়ে দিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান শক্তি হিসাবে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল এবং রাশিয়ার সঙ্গো

তার সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। জাপানের অভ্যন্তরে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব আরও শক্তি সঞ্চয় করল। জাপ সামরিক বাহিনীর সাফল্য তাদের সামরিকীকরণের প্রক্রিয়ায় আনল জোয়ার। ১৮৯৬ সালে সেনাবাহিনীতে আরও নতুন ৬টি ডিভিশন যুক্ত ছিল। ১৮৯৮ সালে ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীকে আলাদা ব্রিগেড হিসেবে গড়ে তোলা হল। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক অস্ত্র তৈরি হতে লাগল। একই সঙ্গে নতুন রণতরী সংযোজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌবাহিনীর কলেবরও বৃদ্ধি পেল। এর অনিবার্য ফল হল প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি। ১৮৯৩ সালে সামরিক খাতে বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ইয়েন ; ১৮৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ইয়েনে। এই বিপুল ব্যয়ভার মেটানোর জন্য সরকার সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপাল।

একই সঙ্গে জাপ সরকার ভারী শিল্প বিকাশের উপর জোর দিল, বিশেষত সেইসব শিল্প যার সামরিক গুরুত্ব আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজনির্মাণ শিল্প, আকরিক লৌহ, কয়লা শিল্প রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তি সঞ্চয় করে।

জাপানের সামরিকীকরণ এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ তার আগ্রাসনের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। ১৮৯৯ সালে চীনের শানটুং প্রদেশ এবং অন্যান্য এলাকায় ই হো তুয়ান বা বক্সারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদেশি বাহিনীকে অবরোধ করে। সেই বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পিকিং শহর দখল করে। ১৯০১ সালে চীনা সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় জাপানের ভূমিকা ছিল এবং চীন থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ জাপ সরকারের কোষাগারে জমা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই সময় থেকে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে, যা ১৯০৪ সালে উভয়দেশের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা ঘটায়।

৫৯.৪ রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫)

১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ ছিল পূর্ব এশিয়ার একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি এবং একটি নবোদ্ভূত শক্তির মধ্যেকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোনো ন্যায়-নীতির বালাই ছিল না, এর লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ার করে নেওয়া। রাশিয়ার পরাজয় এবং **পোর্টসমাউথের সন্ধি** স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

৫৯.৪.১ রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ

বস্তুত কোরিয়াকে কেন্দ্র করে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে তা জাপান ও রাশিয়া বিবদমান পক্ষ হিসাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ১৮৯৫ সালে শিমোনোসেকির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই রাশিয়া কোরিয়া ভূখণ্ডে তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। বক্সার বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে বসবাসাকারী তার নাগরিকদের ও তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠায়। বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পরেও তারা মাঞ্চুরিয়া থেকে তাদের সেনাবাহিনী তুলে নেয়নি। তাছাড়া জার শাসিত রাশিয়া জোর করে চীন সরকারের কাছ থেকে ২৫ বছরের জন্য পোর্ট আর্থারের নৌঘাঁটি এবং

ডাইরিনের বাণিজ্য বন্দরটি লিজ নেয়। এর ফলে রাশিয়া পিকিং ও সিউলের যথেষ্ট নিকটবর্তী এলাকায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। রাশিয়ার এই অগ্রগতি জাপানকে শঙ্কিত করে তোলে। রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল এটা দেখা যে, জাপান যেন কোনোভাবেই কোরিয়ার দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে না পারে, কারণ সেটা হলে ভাদিবোস্টক ও পোর্ট আর্থারের মধ্যেকার জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

যেখানে রাশিয়ার মূল স্বার্থ ছিল মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে, সেখানে জাপানের মূল লক্ষ্য ছিল কোরিয়া। তাই কোরিয়া যাতে রাশিয়ার মতো সম্প্রসারণবাদী কোনো শক্তির হাতে না পড়ে, সেটা ছিল জাপানের মূল চিন্তার বিষয়। একই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। এই সমস্ত কারণে **জাপান ১৯০২ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।** এর মাধ্যমে ব্রিটেন স্বীকার করে নেয় যে, কোরিয়ার ক্ষেত্রে জাপানই হবে একমাত্র দাবিদার। এই চুক্তির মাধ্যমে এটাও স্থির হয় যে, রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধলে ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকবে, আর ফ্রান্স যদি রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়, তবে ব্রিটেন জাপানকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে। এই চুক্তি একই সঙ্গে বহির্বিশ্বের চোখে এশিয়ার নতুন হিসাবে জাপানকে স্বীকৃতি দিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বক্সার বিদ্রোহের সময় রুশ সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়াতে অনুপ্রবেশ করে। জাপান এর প্রতিবাদ জানায়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ১৮৯৮ সালে ফিলিপাইন্স্-এ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। তাই তার মত ছিল চীনের অন্যান্য এলাকার মতো মাঞ্চুরিয়াতেও 'মুক্ত দ্বার' নীতি অনুসরণ করা দরকার, যাতে যে-কোনো দেশের নাগরিকই সেখানে সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। রাশিয়া মুখে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যত সে ধরনের কোনো ইচ্ছা তার ছিল না ; বরং তার লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিয়াকে রাশিয়ার প্রদেশে পরিণত করা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের প্রতিবাদে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও ১৯০৩ সালে রাশিয়া চীনের সম্মতিতে আমুর ও মাঞ্চুরিয়া এলাকায় তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেখাশোনা করার জন্য এক 'ভাইসরয়' নিয়োগ করে।

ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আপন স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখতে হলে তাকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। মাঞ্চুরিয়া থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই রাশিয়ার ছিল না ; তাছাড়া মাঞ্চুরিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে জাপ সরকারের কোনোরকম মতামত গ্রহণ করতেও রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। সেখানে রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকার অর্থ জাপানের বাণিজ্যিক ক্ষতি এবং কোরিয়ার জাপানি আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা। মাঞ্চুরিয়ার বিষয়ে জাপানকে নাক গলাতে দিতে রাশিয়া একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ; আবার কোরিয়ার ক্ষেত্রে জাপানের বিশেষ স্বার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেও সে চাইছিল যাতে কোরিয়ার উপর জাপানের নিয়ন্ত্রণ সীমাহীন না হয়।

যুদ্ধ সমাসন্ন দেখে জাপান নিজের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী ঢেলে সাজাতে থাকে। ১৯০২ স্বাক্ষরিত **ইঙ্গ-জাপান চুক্তি** ছিল তারই একটি কূটনৈতিক ধাপ। এই চুক্তি স্বাক্ষরের দু'বছর পরে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়।

এক বছর ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জাপান জয়লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানের লোকক্ষয় হয় যথেষ্ট এবং জাতীয় কোষাগারে যথেষ্ট চাপ পড়তে থাকে। অবশেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় ১৯০৫ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথে বিবদমন দুই পক্ষ আলোচনায় বসে। জাপানের পক্ষে আর বেশিদিন লড়াই চালান ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ায় সে আলোচনায় আগ্রহী হয়। অন্যদিকে রাশিয়া চাইছিল যুদ্ধ চালাতে যাতে করে সে পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক সংকটের কারণে ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

৫৯.৪.২ রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল

১৯০৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা **পোর্টসমাউথের চুক্তি** নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তাবলি ছিল এই রকম। প্রথমত, কোরিয়ার উপর জাপানের সার্বিক রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ স্বীকৃত হল। দ্বিতীয়ত, এটা ঠিক হল যে, উভয় দেশই একই সঙ্গে তাদের বাহিনী মাঞ্চুরিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তৃতীয়ত, রাশিয়া তার লিজ নেওয়া লিয়াওটুং পেনিনসুলার অংশবিশেষ এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে রেলশিল্প ও কয়লাখনিতে সে যেসব সুবিধা ভোগ করে আসছিল, সেসব এর পর থেকে জাপানের অধিকারে যাবে। চতুর্থত, কারাফুটো (সাখালিন)-এর দক্ষিণ ভাগ রাশিয়া জাপানকে দিয়ে দেবে। পঞ্চমত, জাপানি দ্বীপখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত সমুদ্র এলাকায় মাছ ধরার অধিকার রাশিয়া জাপানকে দেবে। ষষ্ঠত, যুদ্ধবন্দিদের ভরণপোষণের খরচ এক পক্ষ অপর পক্ষকে দেবে ; এইক্ষেত্রে জাপানের প্রাপ্য ছিল রাশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি ; জাপানের ২ কোটি ডলার বেশি প্রাপ্য ছিল। সপ্তমত প্রতিটি দেশই মাঞ্চুরিয়াতে সশস্ত্র রেলপ্রহরী রাখবে। অষ্টমত, কোনো দেশই সাখালিনকে সমরসজ্জিত করতে পারবে না, কিংবা সামরিক প্রয়োজনে মাঞ্চুরিয়ার রেলপথকে ব্যবহার করতে পারবে না। নবমত, উভয় দেশই লিজ নেওয়া মাঞ্চুরিয়ার অংশের বাইরের ভূখণ্ডকে চীনা কর্তৃপক্ষের অধীন বলে মেনে নেবে এবং এখানে সব দেশেই সমান বাণিজ্যিক ও শিল্পবিকাশের সুযোগ পাবে।

পোর্টসমাউথের চুক্তি জাপানের একটা বড় অংশের কাছে জনপ্রিয় ছিল না। তারা বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভের আশা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ না থাকলে সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা কিন্তু মোটেই কম ছিল না। এটা ছিল পূর্ব-এশিয়ার জাপ আধিপত্য বিস্তারের পথে দ্বিতীয় ধাপ। এর দ্বারা জাপান শুধু রাশিয়ার অগ্রগতিতে রোধ করেছিল তাই নয়, একই সঙ্গে সে কোরিয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে নিজ আধিপত্য সংহত করেছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়া পূর্ব-এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে সরে আসে এবং ইউরোপের বলকান অঞ্চলের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়। কোরিয়ার উপর থেকে রাশিয়ার নজর সরিয়ে দেওয়ার ফলে পরবর্তীকালে জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখলের পথও প্রশস্ত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপান নতুন বিশ্বশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। জাপ সাম্রাজ্যবাদের এই অভ্যুত্থানের অন্য তাৎপর্যও আছে। বহুযুগ বাদে এই প্রথম একটি এশিয় শক্তির হাতে ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় ঘটল। এই ঘটনা তাই প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে—পার্সিয়া,

ভারতবর্ষ ও চীনের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ারের সঞ্চার করে। প্রাচ্যের অনেক মানুষেরা তারা জাপানকে যতই অপছন্দ করুন না কেন, তাকে মডেল হিসাবে দেখতে শুরু করেন ; তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে ইউরোপীয় আধিপত্যকে চূর্ণ করতে হলে জাপানের পথই অনুসরণ করতে হবে। পাশ্চাত্য শক্তি অপরাজেয় নয়। তাদের নিজেদের অস্ত্রেই তাদের পরাজিত করা যায়। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ ছিল এশিয়ার বুকে জাপ সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সূচনা। ১৯১০ সালে কোরিয়া দখলের মাধ্যমে তা আরও নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৫৯.৫ জাপানের সম্প্রসারণশীল পররাষ্ট্র নীতি

৫৯.৫.১ চীনের অভ্যন্তরে জাপ আগ্রাসন (১৯০৫-১৯১৫)

সাম্রাজ্যবাদের নিয়মই এই যে পররাজ্য দখলের স্পৃহা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই জাপানের নজর শুধু মাঞ্চুরিয়ার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্রমেই তা চীনের অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চীন শুধু বিশ্বের বৃহত্তম বাজার ছিল তাই নয়, বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল, কয়লা, লৌহ এসবই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। শিল্পোন্নত জাপানে আকরিক লোহার জোগান ছিল কম, তাই চীনের লৌহসম্পদের প্রতি জাপানি সমরবাদীদের নজর থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। চীনের চুক্তি-বন্দরগুলিতে জাপান ডাক অফিস ও কনসুলার অফিস খোলা হল। শত শত জাপানি ব্যবসায়ী চীনে এলেন ব্যবসার জন্য ; চীনা সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে জাপানি শিক্ষকেরা নিযুক্ত হলেন। বস্তুত ১৯০১ সালে বিশেষত ১৯০৫ সালে রাশিয়ার পরাজয়ের পর থেকে হাজার হাজার চীনা ছাত্র শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য জাপানে যেতে শুরু করেন, জাপানী শিক্ষা শুধু পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় নিকটবর্তী ও কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল তাই নয়, জাপানের আধুনিকীকরণের চরিত্র ঠিক কী, তা জানার আগ্রহও কিছু কম ছিল না। ১৯১১ সালে মাঞ্চুশাসনের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে চীনের অভ্যন্তরে জাপানি হস্তক্ষেপের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কাররা চীনা সরকারকে প্রচুর অর্থ ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, যে অর্থটা কর বাবদ পাওয়া অর্থ থেকে চীনা সরকার শোধ করবে ; সেই সঙ্গে এটাও ঠিক হয় যে, ভবিষ্যতে চীন এইসব বিদেশি ধনকুবেরদের কাছ থেকেই ঋণ নিতে বাধ্য থাকবে। ক্রমে জাপান ও রাশিয়াও এই সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা ছিল দুর্বল দেশ চীনকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষণের এক নগ্নরূপ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে। ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ব-এশিয়ায় ব্রিটেন আক্রান্ত হলে জাপান তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং জার্মান আক্রমণ থেকে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য যৌথভাবে ব্যবস্তা গ্রহণ করবে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জাপানের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পথে আর কোনো বাধা রইল না। ১৫ আগস্ট জাপান জার্মানিকে একটা চিঠির মাধ্যমে পূর্বএশিয়া থেকে সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে এবং চীনের কিয়াওচৌ এলাকা থেকে সরে যেতে বলে। জার্মানি, সেই চিঠির

কোন জবাব দেয় না। এর পরেই জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। জাপবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার কিছু জার্মান অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। এতপর তারা চীনের সিংটাও দখল করে এবং শানটুং প্রদেশে জার্মান রেলপথ ও খনি র উপর নিজ আধিপত্য কায়েম করে। চীনের মানুষের কাছে এটা ছিল এক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বদলে অপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য।

তবে চীনের অভ্যন্তরে জাপ অনুপ্রবেশের শেষ এটা ছিল না। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে চীনে নিযুক্ত জাপানী মন্ত্রী হিওকি একি (Hioki Eki) চীনা সরকারের কাছে 'একুশ-দফা-দাবি' পেশ করেন। এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার অর্থ হল চীনের বিস্তূর্ণ এলাকা জাপ উপনিবেশ পরিণত হওয়াষ এই দাবিগুলি পাঁচটি বাগে বিভক্ত ছিল। দাবিগুলির মধ্যে ছিল মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, শানটুং, চীনের দক্ষিণ-পূর্বের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা এবং ইয়াংসি উপত্যকা জাপ নিয়ন্ত্রণাধীন করা। বস্তুত এর অর্থ হল এই সমস্ত এলাকা জাপানের উপনিবেশ পরিণত হওয়া এবং সমগ্র চীনে জাপানের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কায়েম করা। 'একুশ-দফা দাবিসমূহের' সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ ছিল পঞ্চম ভাগে। এই অংশটি প্রথমে অন্যান্য শক্তির কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার অর্থ নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীনা সরকারের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। চীনা সরকার দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে ; চীনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির পুলিশ-কেন্দ্রগুলি যৌথ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসবে ; চীন হয় তার সমরোপকরণের অর্ধেকের বেশি জাপান থেকে কিনবে, অথবা জাপ-বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করে এবং জাপ সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে একটা যৌথ অস্ত্রাগার গড়ে তোলা হবে ; চীনা ভূখণ্ডে জাপানি হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও চার্চ জমির মালিক হতে পারবে এবং জাপানি ধর্মপ্রচার করতে পারবে। ইয়াংসি উপত্যকায় রেলব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাপান কিছু সুযোগসুবিধা পাবে এবং ফুকিয়েন প্রদেশের (যা ফরমোসার অপরদিকে অবস্থিত) বিকাশের জন্য কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করার আগে জাপানের পরমার্শ নিতে হবে।

৫৯.৫.২ চীনের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া

জাপ সরকারের এই 'একুশ-দফা-দাবি' প্রকাশিত হওয়ার পরে মানুষেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার অর্থ চীনের স্বাধীনতাকেই বিসর্জন দেওয়া। চীনের শাসকশ্রেণীর এই অপমানজনক দাবিসমূহ প্রত্যাখ্যান করে জাপবিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই তার সামরিক শক্তি নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াত না। দীর্ঘ চার মাস ধরে চীনা সরকারের সঙ্গো আলোচনা চালানোর পরে অধৈর্য হয়ে ৭ মে তারিখে জাপ সরকার চরমপত্র দেয়। ৮ মে চীনা সরকার প্রথম চারটি ভাগের দাবিগুলি মেনে নেয়। পঞ্চম ভাগের দাবিগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া মুলতুবি থাকে।

চীনা প্রেসিডেন্ট ইউয়ান-শি-কাই এই দাবিগুলি মেনে নেওয়া সঙ্গো সঙ্গো চীনের মানুষেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ৭ ও ৯ মে—এই দিনদুটিকে 'জাতীয় অপমানের দিন' বলে নিন্দা করা হয়। চীনের অভ্যন্তরে এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয় ; মানুষের মনে এই বিশ্বাস দেখা দেয় যে বেঁচে থাকতে হলে বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সাংহাই-এর মানুষেরা জাপানি দ্রব্য

বয়কটের ডাক দেন। এর ফলে চীনের অভ্যন্তরে জাপানের রপ্তানি-দ্রব্যের পরিমাণ কমে আর চীনা জাতীয় শিল্পে বিকাশ ঘটে।

৫৯.৬ সারাংশ

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ মেইজী শাসনকালে জাপানের জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে একের পর এক আসতে থাকে আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন ও সামরিকীকরণের চিত্রগুলি। সরকারি সহযোগিতায় বিকশিত হয় পুঁজিবাদ যা অনিবার্যভাবে জাপানকে টেনে নিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের দিকে। জাপান বিনা বাধায় তার শিল্প, সামরিক উপকরণ ও অর্থনৈতিক হাতিয়ারের বলে বলীয়ান পররাজ্য গ্রাসে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। দূরপ্রাচ্যের রাজনীতি ভারসাম্য হারিয়ে সংকটের দিকে এগিয়ে যায়।

৫৯.৭ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) জাপানে সমরবাদের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করুন।

(খ) জাপ সমরবাদের উত্থানের সঙ্গে কি জাপ পুঁজিবাদের বিকাশ যুক্ত ছিল?

(গ) চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪-৯৫) কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-০৫) কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

(ঙ) চীনের অভ্যন্তরে জাপানের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করুন।

২। টীকা লিখুন ঃ

(ক) শিমোনোসেকির চুক্তি (১৮৯৫)

(খ) পোর্টসমাউথের চুক্তি (১৯০৫)

(গ) ‘একুশ-দফা-দাবি’ (১৯১৫)

৫৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। সিদ্ধার্থ গুহ রায় ঃ চীন ও জাপানের ইতিহাস

২। Richard Story : A History of Modern Japan.

৩। W. G. Beasley : The Modern History of Japan.

৪। K. S. Latourette : The History of Japan.

৫। F. O. Reischauer : Japan, Past and Present.

একক ৬০ ❐ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররূপে জাপানের প্রতিষ্ঠা লাভ (১৯১৫-১৯৩১)

গঠন

৬০.০ উদ্দেশ্য

৬০.১ প্রস্তাবনা

৬০.২ জাইবাৎসু ব্যবস্থা

৬০.৩ জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও পূর্ব-এশিয়া (১৯১৪-১৯২২)

৬০.৪ ওয়াশিংটন সম্মেলন (নভেম্বর ১৯২১-ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

৬০.৪.১ সম্মেলনের গুরুত্ব

৬০.৫ ওয়াশিংটন সম্মেলনের পরবর্তীকালে থেকে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ পর্যন্ত জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবর্তন ১৯২২-১৯৩১

৬০.৫.১ জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

৬০.৬ জাপানে মার্ক্সবাদের প্রভাব

৬০.৭ সারাংশ

৬০.৮ অনুশীলনী

৬০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গি রাষ্ট্ররূপে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এককটি অধ্যয়ন করে আপনারা যে উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন তা হল—

- এক অভিনব অর্থনৈতিক সংগঠন, জাইবাৎসুর ভূমিকা।
- জাইবাৎসু গোষ্ঠী ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, নিয়ন্ত্রণ।
- জাপানি সম্পদের একীকরণের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।
- পূর্ব-এশিয়ায় জাপানি সাম্রাজ্যবাদ।
- ওয়াশিংটন সম্মেলন।
- জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি।
- জাপানের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব ও সংকট বৃদ্ধি।
- সরকারি দমন-পীড়ন নীতির ফলে মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিপদ।

৬০.১ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে জাপান দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়। বাস্তবিকপক্ষে ১৯১৫-১৯৩১ সাল পর্যন্ত দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক গতিধারাই ছিল জাপানের উত্থান এবং তার রাজনৈতিক সক্রিয়তা নিয়ে। ১৯১৫ সালে চীনের কাছে ২১ দফা দাবি উপস্থিত করে বেশকিছু অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে নেয়। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে প্রাচ্যে জার্মানির উপনিবেশগুলি জাপান করায়ত্ত করে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে জাপানের এই গতিকে প্রতিহত করার মতো কোনো শক্তি প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে ছিল না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। দূরপ্রাচ্যের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আহূত হয় ওয়াশিংটন সম্মেলন ১৯২১ সালে। এই সম্মেলন চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস রাজনৈতিক স্থিতি রক্ষা করে। পরিস্থিতির চাপে জাপান কিছুকালের জন্য আগ্রাসন বন্ধ করে রাখে। যদিও চীনে তার সুবিধা হারাতে জাপান প্রস্তুত ছিল না তাই সে সুযোগে অপেক্ষায় রইল এবং দশ বছরের মধ্যে ওয়াশিংটন সম্মেলন শর্ত লঙ্ঘন করে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। ফলে দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য পুনরায় বিনষ্ট হয়।

জাপানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ১৮৮৯ সালের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারিত। তবে সংবিধান বহির্ভূত কিছু শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল জেন্‌রো ব বয়স্কদের প্রতিষ্ঠান, সর্বোচ্চ যুদ্ধ পরিষদ এবং জাইবাৎসু বা বৃহৎ পুঁজিপতী গোষ্ঠী। এই জাইবাৎসু গোষ্ঠী জাপানে বৃহৎ ও ভারী শিল্প প্রসারে অগ্রসর হয়। এরা কোনো একটি যৌথ পরিবারের সদস্যদের মতো ভূমিকা পালন করতে থাকে। এরাই জাপানের বেশিরভাগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান, রেল, জাহাজ, ব্যাঙ্ক, খনি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা এদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ও কারণ ছিল। জাপানের সামরিক বাহিনীর জঙ্গি নীতির প্রধান সমর্থক ছিলেন এই জাইবাৎসু গোষ্ঠী। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিকাশে এদের উৎসাহে অনেকটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

৬০.২ জাইবাৎসু ব্যবস্থা (Zaibatsu System)

'জাইবাৎসু' শব্দটির অর্থ 'ধনকুবের গোষ্ঠী' (financial clique)। জাপানের বৃহৎ বুর্জোয়া ও ব্যবসায়ীরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেইজি পুনঃস্থাপনের পর নতুন সরকার শিল্পের বিকাশের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা নেয় এবং প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। পরবর্তীকালে সামরিক শিল্প ছাড়া অন্য প্রায় সব শিল্পকেই খুব কম অর্থের বিনিময়ে বেসরকারি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এইসব অল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী বেসরকারি কোম্পানি জাইবাৎসু নামে পরিচিত হয়। যেহেতু সরকারি আনুকুল্য ছাড়া তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব ছিল না, তাই সরকারের সঙ্গে তারা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে জাইবাৎসু রাজনীতির জগতে প্রবেশ করতে চাইত না, ডায়েট (Diet)-এ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য রাখত না। অন্যদিকে এই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে—যেমন মিৎসুই ও

মিৎসুবিশির মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তাদের প্রত্যেকে কোনো না কোনো শাসকগোষ্ঠীভুক্ত সদস্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধত। যেমন মিৎসুই-এর সঙ্গে ছিল ইতো ও ইনুয়ে কাওরু (Inouye Kaoru)-র সম্পর্ক আর মিৎসুবিশির সঙ্গে ছিল মাৎসুকাতার সম্পর্ক। এর অর্থ হল প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অবশ্যই জাইবাৎসু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই ১৮৮৯-এর সংবিধান অনুযায়ী ডায়েট গড়ে ওঠার পর থেকে আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাইবাৎসু হস্তক্ষেপ করতে থাকে, যার ফলে ক্রমশই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের শিল্পক্ষেত্রে আসে বিরাট জোয়ার। এইসব শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে তারা দেশের অর্থনীতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে থাকে। এইসময় জাপানের বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায় ; ফলে বৃহদায়তন শিল্পায়নের আর্থিক দায়িত্ব এই ধরনের বৃহৎ শিল্পসংস্থার হস্তগত হয়। আগে যেমন এইসব সংস্থাগুলি/বেসরকারি কোম্পানিগুলি সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল, এখন আর তারা পুঁজির জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এখন তারা সরকারি নীতি অন্যতম উপাদান হওয়ার সাথে সাথে সরকারি আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করার সুবাদে সেইসব সরকারি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

কোন্ কোন্ বেসরকারি শিল্পসংস্থাকে নিয়ে জাইবাৎসু গড়ে উঠেছিল সে ব্যাপারে গবেষকেরা একমত হতে পারেন নি। তবে তাদের মধ্যে অন্তত যে চারটি সংস্থা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই সেগুলি হল মিৎসুই, মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো ও ইয়াসুদা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি বৃহদাকার শিল্পসংস্থা, যেমন ফুরুকাওয়া, কুহারা, কাওয়াসাকি, আইকাওয়া'র নিসান এবং ১৯৩০-এর দশকে অস্ত্র নির্মাণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 'নতুন জাইবাৎসু', যারা চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল শোষণের কাজে জাপ-সামরিক বাহিনীকে রসদ জুগিয়েছিল।

জাইবাৎসু সংস্থার সঙ্গে পশ্চিমী বৃহৎ সংস্থার সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, জাইবাৎসুর কর্মক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ; এটা ছিল বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যেকার জোট। যেমন কোনো একটি মিৎসুবিশি খনি কোম্পানির কাজ খনিজ পদার্থ তোলা ; সেই খনিজ পদার্থ থেকে কোনো একটি মিৎসুবিশি শিল্পসংস্থা পণ্য উৎপাদন করে ; আবার সেই পণ্যসামগ্রী বিদেশে বিক্রির দায়িত্ব আর একটি মিৎসুবিশি বণিক সংস্থার ; আবার সেগুলিকে জাহাজে পাঠানোর দায়িত্ব অপর এক মিৎসুবিশি সংস্থার ও আর সবশেষে এইসব কাজের যাবতীয় খরচপত্র বহন করে একটি মিৎসুবিশি ব্যাঙ্ক। বস্তুত ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে মিৎসুই ও মিৎসুবিশি সংস্থাদুটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৬০.৩ জাপ সাম্রাজ্যবাদ ও পূর্ব-এশিয়া (১৯১৪-১৯২২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ওয়াশিংটন সম্মেলন পর্যন্ত সময়কাল হল জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের পরবর্তী স্তর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল বিশ্বকে নতুন করে ভাগবাঁটোয়ার করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিবর্গের মধ্যেকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ জড়িয়ে পূর্ব-এশিয়ায় এক ধরনের শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হয়। জাপান এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ আধিপত্য বৃদ্ধি করে। ব্রিটেনের সহযোগী হিসাবে জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৯১৪ সালে চীনের শানটুং ভূখণ্ড জার্মানির হাত থেকে কেড়ে নেয়। ১৯১৫ সালে জাপান চীনকে ২১-দফা দাবি সম্বলিত একটি চরমপত্র দেয় যা মেনে নেওয়ার অর্থ চীনের সুবিশাল ভূখণ্ড জাপানের করায়ত্ত হওয়া। এরপর ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা সাইবেরিয়াতে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সে দেশে এক সমাজতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠেছে। একদিকে জাপান যেমন কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানে অংশ নিতে চেয়েছিল। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী সাইবেরিয়া অঞ্চল কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসুক, তাও সে চায়নি। যত সংখ্যক সৈন্য সাইবেরিয়াতে পাঠানোর কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্য জাপান পাঠায়। এটা শুধু যে ব্যয়বহুল ছিল তাই নয়, এর ফলে একই সঙ্গে জাপান জনপ্রিয়তা হারায়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি হস্তক্ষেপকারীদের মধ্যে নানাধরনের মতপার্থক্য দেখা যায়। কিছুকাল অন্যান্য দেশ তাদের সৈন্য অপসারণ করলেও জাপান তার সৈন্য সরায় না। বরং ১৯২০ সালে সে উত্তর সাখানিল দখল করে নেয়। শক্তিবর্গের চাপে ১৯২২ সালে সাইবেরিয়া থেকে এবং ১৯২৫ সালে উত্তর সাখালিন থেকে সৈন্য তুলে নিতে বাধ্য হয়। বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাপান এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের 'নয়া কূটনীতি'র মূল লক্ষ্য ছিল যুদ্ধকালীন সমরসম্ভারের বদলে শান্তিকালীন সীমিত সমরসম্ভার এবং যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বদলে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বহুপাক্ষিক চুক্তি গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে আহূত হয় **ওয়াশিংটন সম্মেলন**।

৬০.৪ ওয়াশিংটন সম্মেলন (নভেম্বর ১৯২১—ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলন যে সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আহূত হয়েছিল তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাপানের কোনো না কোনো ভূমিকা ছিল। ভার্সাই সন্ধি চীনের সানটুং ভূখণ্ড জাপ অধিকারমুক্ত করার দাবিকে অগ্রাহ করেছিল, তাই চীন তা স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং সেই মর্মে দাবি জানাতে থাকে। অন্যদিকে জাপান এত দৃঢ়ভাবে সানটুং-এ নিজ আধিপত্য কায়েম করে বসেছিল যে তার পক্ষে সেখান থেকে পুরোপুরি সরে আসা খুব সহজ কাজ ছিল না। সাইবেরিয়াতে জাপসৈন্যের উপস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কার কারণ ছিল। উভয় দেশই সামরিক সমরসম্ভার বৃদ্ধি করেছিল, যার মধ্যে ব্রিটেনও জড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত যাবতীয় সমুদ্রমুখগুলি জাপ নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। সাখালিন, হোক্কাইডো ও কোরিয়ার উপর জাপ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনো বহির্শক্তির পক্ষে জাপান সাগরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। একই কারণে মাঞ্চুরিয়াতে হস্তক্ষেপ করা জাপানের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। বস্তুত জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তখন এমন পর্যায়ে

পৌঁছেছিল যে অনেক দেশই তাদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছিল না। এটা ব্রিটেনের কাছে ছিল বিপদের সংকেত, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধলে ইঙ্গ-জাপান চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটেন জাপানের সাহায্যে আসতে বাধ্য থাকবে। ১৯২১ সালের জুন মাসে মাসে কানাডার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে মার্কিনী উদ্যোগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সমস্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২) অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তিসমূহ ঃ ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটন শহরে অধিবেশনে বসেন। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্ব-এশিয়ার সমস্যাসমূহ নিয়ে সুবিধাজনক সমাধানে পৌঁছান। স্বাক্ষরিত মোট ৭টি চুক্তির মধ্যে ৩টি চুক্তিই ছিল প্রধান।

১। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির উপর ঔপনিবেশিক মালিকানা ও সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত চতুঃশক্তি চুক্তি। ১৩ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী এই চতুঃশক্তি এই বিশাল এলাকায় পারস্পরিক অধিকারকে মর্যাদা দেবে এবং কোনো সংকট দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে।

২। পূর্ব-এশিয়ায় নৌশক্তি ও নৌ-প্রতিযোগিতা হ্রাস করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে স্বাক্ষরিত পঞ্চশক্তি চুক্তি। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কোন্ দেশ কতটা বড় এবং কত সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ রাখতে পারবে, তা নির্ধারিত হয়। ডব্লিউ আর কেলব (W. R. Keylor)-এর মতে ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রধান সাফল্য হয় এই পঞ্চশক্তি স্বাক্ষরিত চুক্তি। এখানে যে যুদ্ধজাহাজের কথা বলা হয়েছে সেগুলি ১০ হাজার টনের বেশি ওজনের এবং ৮ ইঞ্চি ব্যাসের বেশি কামানবাহী জাহাজ। শর্তানুযায়ী পঞ্চশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালির নৌবহরের আনুপাতিক হার হবে যথাক্রমে ৫ : ৫ : ৩ : ১ : ১.৭৫ : ১.৭৫। সেইসঙ্গে আগামী দশবছর এই আকারের নতুন যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের উপরও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। ব্রিটেন-অধিকৃত সিঙ্গাপুর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকৃত পার্ল হারবার ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্য সমস্ত ঘাঁটি এলাকাগুলিকে নতুন কোন ধরনের সামরিক নির্মাণকাজ না-করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান সম্মত হল। সেইসঙ্গে জাপান পূর্ব-সাইবেরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করল।

৩। চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়ে নয় শক্তির চুক্তি (ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। এই নয় শক্তি হল ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, নেদারল্যাণ্ড, পোর্তুগাল ও চীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পূর্বেকার জার্মানি-নিয়ন্ত্রিত চীনের শানটুং অঞ্চলটি জাপান অধিকার করে নেয়। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভার্সাই সম্মেলনে চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাপানের সানটুং দখল করাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে জাপান চীনকে সানটুং প্রত্যর্পণে রাজি হয় এবং সেই মর্মে ৪ ফেব্রুয়ারি চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নয় শক্তি চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা মেনে চলতে স্বীকৃত হল। এই ধরনের স্বীকৃতি যে দিতে হল সেই ঘটনাটাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চীনের ব্যাপক এলাকাই ছিল কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবাধীন এলাকা। তার চেয়েও বড় কথা, চুক্তি যে মেনে চলা হবে তার কোনো

গ্যারান্টি ছিল না, কারণ তা বাস্তবে রূপায়িত করার মতো কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। বস্তুত চীনের অব্যন্তরে যে ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা বিভিন্ন বিদেশি শক্তি ভোগ করত, চীনা শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ ছিল (যা ছিল চীনের সার্বভৌমত্বের উপরই আঘাত), তা অব্যাহত ছিল। তাই পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচার সত্ত্বেও চীনের কাছে শানটুং প্রত্যর্পণের কার্যকরী গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না।

৬০.৪.১ সম্মেলনের গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বে ওয়াশিংটন সম্মেলন অন্যতম সম্মেলন হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিস্‌লে (W. G. Beasley)-র মতে, এই সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা শঙ্কা ও অস্থিরতাকে সাময়িককালের জন্য হলেও কমিয়ে আনা। এর একটি হল, পঞ্চশক্তি চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনা ; অপরটি নয় শক্তি চুক্তির মাধ্যমে জাপ-অধিকৃত শানটুং অঞ্চল চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া। রিচার্ড স্টোরির মতে, ভার্সাই সম্মেলন যে ভূখণ্ড চীনকে জাপানের হাত থেকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে, ওয়াশিংটন সম্মেলন তা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

সীমিত সাফল্য থাকলেও এই সম্মেলনের সীমাবদ্ধতার দিক নেহাত কম ছিল না। পঞ্চশক্তি চুক্তি নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনলেও অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানি নৌশক্তির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেলর (W. R. Keylor)-এর মতে, পার্ল, হার্বার ও সিঙ্গাপুরের মধ্যেকার অঞ্চলের কোথাও নতুন ঘাঁটি গড়ে না তুলতে স্বীকৃত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ভবিষ্যতে চীনের মূল ভূখণ্ড ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ আগ্রাসনের সম্ভাবনাকে কার্যত মদত যুগিয়েছিল। এর ফলে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং চীনের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার প্রবেশদ্বারে জাপানি প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনের শানটুং অঞ্চল ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই সাফল্য ছিল সীমিত চরিত্রে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে, বিশেষত আফিং যুদ্ধ ও নানকিং চুক্তি (১৮৪২) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইটালি, জাপান, বেলজিয়াম প্রভৃতি শক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে সামন্ত মাঞ্চুশাসনের দুর্বলতা এবং শাসকগোষ্ঠীর আত্মসমর্পণবাদী নীতির সুযোগে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিলর্জ্জভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। সামন্ত চীনের বাজার পশ্চিমী দ্রব্যে ছেয়ে যায় ; চীনের বিভিন্ন এলাকা এক-একটি বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পরিণত হয় এবং চীনের সার্বভৌমত্ব সর্বতোভাবে খর্ব হয়। বস্তুত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সুবিশাল ভূখণ্ড ছিল ব্রিটেনসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ নিপীড়নের মৃগয়াভূমি। বিশ শতকে এই সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আরও হিংস্রও চেহারা নেয়। তাই শানটুং প্রদেশ চীনকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ চীনের অভ্যন্তরে বিদেশি নিয়ন্ত্রণের অবসান ছিল না ; এতে সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলেও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের কোনরকম হেরফের হয়নি। বস্তুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য এই সীমিত ছাড় দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের অপর গুরুত্ব ইঙ্গ-জাপ জোটের অবসান। রিচার্ড স্টোরির মতে, এর জায়গায় যে চতুঃশক্তি জোট স্বাক্ষরিত হল তা একটি ফাঁকা চুক্তি ছাড়া কিছু নয়। এটা কোনো নিরাপত্তা

চুক্তি ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্বেকার ইঙ্গ-জাপ জোটের অবসান, কারণ ব্রিটেনের পক্ষে আর এই চুক্তির দায়ভার বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বস্তুত ভার্সাই সম্মেলনের পর থেকে মার্কিন কূটনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইঙ্গ-জাপ জোটের অবসান ঘটান এবং ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতা বৃদ্ধি। অন্যদিকে এই দ্বিশক্তি-জোটের অবসানের অর্থ হল এর পর থেকে টোকিওর ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আর কোনো ভূমিকা রইল না। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও এর কোনো ভূমিকা ছিল না। একই সঙ্গে এর ফলে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হংকং এবং বঙ্গোপসাগরের পূর্বে ব্রিটেন-অধিকৃত এলাকাগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হওয়ার তিন বছর পরে ১৯২৫ সালে উত্তর সাখালিন থেকে জাপান নিজ সৈন্যবাহিনী অপসরণ করে এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর পর থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কাল জাপানী রাষ্ট্র সমরবাদের জায়গায় অর্থনৈতিক বিস্তারের উপর জোর দেয়। এই সময়কালের বেশিরভাগ অংশেই জাপানের বিদেশমন্ত্রী ছিল শিদেহারা কিজুরো। ইতিমধ্যে জাপানের অভ্যন্তরে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ওয়াসিংটন সম্মেলনের শর্তাবলী লঙ্ঘন করার দাবি উঠতে থাকে। ১৯৩১ সালের চীনের মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ড আক্রমণ ও দখল এবং মাঞ্চুকুও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সমরবাদ উগ্র আকার ধারণ করে।

৬০.৫ ওয়াশিংটন সম্মেলনের পরবর্তীকাল থেকে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ পর্যন্ত জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবর্তন (১৯২২-১৯৩১)

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সময়কাল হল জাপানের পুঁজিবাদী বিকাশ, সমরবাদের উত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী চরিত্রের নগ্ন আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং এই যুদ্ধ-অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচুর অর্থাগম ঘটায়। যুদ্ধশেষে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হওয়া ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পরে ব্যবসাক্ষেত্রে সাময়িক মন্দা আসে। এর ফলে কম দক্ষ কিছু কিছু কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শিল্পায়নের গতি ততটা পরিমাণ ব্যাহত হয়নি। রেশম ও তাঁত বস্ত্র ছিল রপ্তানির দুটি প্রধান দ্রব্য, যার বাজার ছিল প্রধানত মার্কিক যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ। ভারী শিল্পের বিকাশ এইসময় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যদিও জাপানকে কারিগরি দ্রব্যের আমদানির উপর নির্ভর করতে হত তবুও বেশকিছু পরিমাণ মেশিন দেশে প্রস্তুত হত। যেমন, কাপড়ের কল, বৈদ্যুতিক কল, রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত দ্রব্য, সাইকেল এবং জাহাজ। শিল্পক্ষেত্রে দু'ধরনের সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সংগঠন এবং ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সংগঠন। বৃহদায়তন সংস্থাগুলি জাইবাৎসু নামে পরিচিত ছিল। জাইবাৎসু বা 'ধনকুবেল গোষ্ঠীগুলি' নানাভাবে সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারত।

অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও নিজেদের সংঘবদ্ধ করে সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরোনো সংস্থাগুলির অন্যতম টোকিও চেম্বার অব কমার্স। শিবুসাওয়া এইচি (Shibusawa Eiichi) নামে এক ব্যাঙ্কারের নেতৃত্বে মেইজি যুগের শেষভাগ থেকেই তারা সরকারি আর্থিক নীতির

বিভিন্নক্ষেত্রে আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯২০-র দশকে বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, রোটারি ক্লাব ব্যবসায়ী ও শিল্প সংস্থাগুলি ছিল শহুরে জীবনের বৈশিষ্ট্য। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক দলগুলি। আইনি পথে সরকারি নীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা তারাই সবচেয়ে ভালো বুঝত। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণ করতে হলে ব্যবসায়ীদের সমর্থন যে জরুরি, এই সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল।

৬০.৫.১ জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

১৮৮৯ সালে প্রবর্তিত জাপানি সংবিধানে একথা বলা হয়েছিল যে ক্ষমতাসীন মন্ত্রীসভার কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গো সম্পর্ক থাকবে না। তাই ১৮৮০-এর দশকে ইয়াগাকির নেতৃত্বে জিয়ুটো (Jiyuto) এবং ওকুমার নেতৃত্বে কাইশিনটো (Kaishinto) দল গঠিত হলেও তাদের মন্ত্রীসভা গঠনের বিষয়টি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এসে বর্তায় কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ, বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ রাজনীতিবিদের উপর যারা 'Elders' নামে পরিচিত ছিলেন। বস্তুত জাপানি সমাজের যা চেহারা তাতে প্রবীণদের পক্ষে এই ধরনের ভূমিকা পালন করা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। অতীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপ শাসকশ্রেণীকে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়েছে। এঁরা 'জেন্‌রো' (Genro) নামে এক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইতো, মাৎসুকাটা ও ইয়ামাগাতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাপানের ডায়েট (Diet) দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—নিম্নতর কক্ষ (House of Representatives) ও উচ্চতর কক্ষ (House of Peers)। ১৮৯০ সালে ১ জুলাই অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নির্বাচনে জিয়ুটু ও কাইশিনটো দলের সদস্যরা নিম্নতর কক্ষে প্রাধান্য লাভ করেন। ইতো এই ধরনের ফলাফলের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। লিবারেল পার্টি (জিয়ুটু) ও প্রোগ্রেসিভ পার্টি (কাইশিনটো)-র উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীসভার উপর ডায়েট বা সংসদের কর্তৃত্ব কায়েম করা। ক্রমশই ইতো বুঝতে পারেন যে, প্রতি বছর বাজেট পাশ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সুদক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন লাভ করা জরুরি। এই কারণে ঊনবিংশ শতকের শেষে ইতো ইতাগাকির জিয়ুটু দলের সঙ্গো সমঝোতা করে ইতাগাকিকে মন্ত্রীসভার সদস্যপদ দেন। একইভাবে মাৎসুকাতা ওকুমার নেতৃত্বাধীন কাইশিনটো দলের সঙ্গো বোঝাপড়া করেন। বস্তুত রাজনৈতিক পার্টির প্রতি মনোভাব নিয়ে বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ রাজনীতিবিদ ইতো ও ইয়ামাগাতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ইয়ামাগাতা মনে করতেন যে মন্ত্রীসভার সঙ্গো রাজনৈতিক দলের কোনো সংশ্রব থাকা উচিত নয়, কারণ তা থাকলে জাপানের অগ্রগতিই ব্যাহত হবে। অন্যদিকে ইতো সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শাসকগোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতো সাংবিধানিক দলের সঙ্গো হাত মিলিয়ে 'রিকেন সেইয়ুকাই' (Rikken Seiyukai) বা সাংবিধানিক সরকারের বন্ধু নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরবর্তী দুই দশক ধরে House of Representatitves-এ সেইয়ুকাই পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির মর্যাদা পেয়ে থাকে। নতুন দলের সভাপতি হিসাবে ইতো জাপানোর

প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইয়ামাগাতা স্বাভাবিকভাবেই ইতোর কার্যকলাপ সমর্থন করেননি। তিনি যেমন কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন, একই সঙ্গে সামরিক দপ্তর অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়ে তাঁর তীব্র বিরোধিতা ছিল। সামরিক দপ্তর সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, কোনো অসামরিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না—ইয়ামাগাতার এই মতাদর্শ পরবর্তীকালে জাপানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ শতকের শুরুতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন ইয়ামাগাতার ঘনিষ্ঠ সামরিক নেতা কাৎসুরা তারো। কাৎসুরা-গঠিত মন্ত্রীসভা কোনো রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না ; এটি ছিল আমলাদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভা। প্রথম দিকে ইতো পরিচালিত সেইয়ুকাই পার্টির সমর্থন লাভ করার ফলে তাঁর পক্ষে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কিছুকাল পরে ভূমিকর বৃদ্ধির প্রশ্নে কাৎসুরাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯০৪-০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধ তাকে সাময়িকভাবে রেহাই দিলেও, ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত চুক্তি জাপানের মানুষকে খুশি করতে পারেনি। টোকিও শহরে বিক্ষুব্ধ জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে ১০০০ মানুষ নিহত হয়। এই সুযোগে ওকুমা গোষ্ঠীর 'সাচ্চা সাংবিধানিক দল' সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯০৬ সালে কাৎসুরা পদত্যাগ করতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯০৬ সালে কাৎসুরা পদত্যাগ করেন। অবশ্য ১৯০৮ সালে তিনি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯১২ সালে কাৎসুরা সংসদে এক রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাৎসুরাও একটা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ১৯১৩ সালে দোশিকাই (Doshikai) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছিলেন। দোশিকাই দল ক্রমশ সেইয়ুকাই দলের বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জাপানে একটি দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে দোশিকাই-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় কেনসেইকাই (Kenseikai) এবং ১৯২৭ সালে তা হয় মিনসেইটো (Minseito)।

১৯১৩ সালে দোশিকাই দল গঠিত হওয়ার পরেও ইয়াগামাতা মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির অধীনে দলহীন মন্ত্রীসভার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং তাঁর অনুমতি লাভের মাধ্যমেই ১৯১৮ সালে সেইয়ুকাই দলের সভাপতি হারা তাকাশি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাকাশি সামরিকবাহিনীর প্রভাবমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে সামরিকবাহিনী ও অভিজাতদের বিরূপ মনোভাবের মুখোমুখি পড়তে হয়। ১৯২১ সালে এক দক্ষিণপন্থী যুবকের হাতে তিনি নিহত হন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হন তাকাহাসি কোরেকিও। পূর্বসূরীর সঙ্গে কোরেকিও মত মূলত এক থাকায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব হারান। ১৯২২ সালে ইয়াগামাতার মৃত্যুর পরে চোশু গোষ্ঠীভুক্ত সামরিক অফিসারদের প্রাধান্য কমতে শুরু করে।

১৯২৪ সালে কেনসেইকাই দলের কাটো তাকাকির নেতৃত্বে একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠে। ১৯২৬ সালের গোড়ায় কাটোর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন ওয়াকাৎসুকি রেইজিরো ঐতিহাসিক জন

হ্যালিতে বলেছেন যে তাকাকির সরকার বামপন্থী মতাদর্শকে আঘাত করার জন্য নানাবিধ দমনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। যেমন ১৯২৫ সালে 'শান্তিরক্ষা আইন' বা 'বিপজ্জনক ধারণার বিরুদ্ধে আইন' (Law against dagerous ideas) নামে একটি আইন প্রণীত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী আন্দোলনকে দমন করা।

১৯২৭ সালে ওয়াকাৎসুকি মন্ত্রীসভার পতন ঘটার পরে প্রধানমন্ত্রী হন জেনারেল তাকানা গিচি। তিনি ছিলেন সেইযুকাই দলের সভাপতি। মিনসেইটো দল (কেনসেকাই দলের নতুন নাম) ছিল এই সংসদের প্রধান বিরোধী দল। তানাকার আমলে চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মাঞ্চুরিয়া আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কুয়োমিনটাং বাহিনীর সাথে জাপবাহিনীর সংঘর্ষ চলতে থাকে। জাপ সামরিক নেতাদের চক্রান্তে মাঞ্চুরিয়ার চীনা সমরনায়ক চ্যাং সো লিন (Chang Tso-lin) মুকদেনের কাছে নিহত হন। বিরোধী সাংসদরা সংসদের অধিবেশনে এইসব ঘটনা নিয়ে সরকারকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকেন। একই সঙ্গে আর্থিক সংকটও তানাকা সরকারকে ব্রিবত করছিল। এই উভয় সংকটের চাপে ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে তানাকা সরকার পদত্যাগ করে। এই অবস্থায় নতুন প্রধানমনত্রী হন মিনসেইটো দলের নেতা হামাগুচি। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। ফলে তিনি সামরিক বাহিনী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের বিরাগভাজন হন। ১৯৩০ সালের জুন মাসে আহূত লন্ডন নৌ-সম্মেলনে জাপান যোগদান করে। সেই সম্মেলনে পূর্ববর্তী ওয়াশিংটন সম্মেলনে নির্ধারিত জাপানের নৌবহরের পরিমাণ হ্রাসের প্রস্তাব দেওয়া হয়। জাপ সরকার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। জাপানের সাধারণ মানুষ, সামরিক প্রধান ও উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তিতে ভালোভাবে নেননি। ফলে সরকার-বিরোধী জনমত গড়ে উঠতে থাকে। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন শুল্কব্যবস্থা চালু করার ফলে আমেরিকাতে আমদানিকৃত জাপানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্কের পরিমাণ ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে চীনদেশেও জাপানী পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি মার খায়। এটা ছিল দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে দুনিয়াকে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়ার প্রতিযোগিতা। এর ফলে জাপানের অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং হামাগুচি সরকার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী হামাগুচি গুলির আঘাতে নিহত হন। এরপর প্রধানমন্ত্রী হন ওয়াকাৎসুকি।

সেইসময়ে জাপানের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন শিদেহারা। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল মূলত আপোষমূলক। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এবং প্রশাসনে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবক্তারা ছিলেন এই নীতির বিরোধী। তাদের মতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জাপানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলা উচিত। তাঁদের মতে, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, পররাজ্য গ্রাস ছাড়া তা সম্ভব নয়। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ওয়াকাৎসুকি মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এর কয়েক মাস পরেই বিক্ষুব্ধ সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচনায় চীনে অবস্থানকারী জাপানি সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়ার মুকডেন শহর অবরোধ করে। এটা ছিল মাঞ্চুরিয়া দখল ও চীনের অন্যান্য অঞ্চলে আগ্রাসী আক্রমণ চালানোর সূচনা।

৬০.৬ জাপানে মার্ক্সবাদের প্রভাব

মতাদর্শ হিসাবে জাপানে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলন এই মতাদর্শের বীজ বপন করার বাস্তবক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই ধরনের আন্দোলন অঙ্কুরেই ধ্বংস করারা উদ্দেশ্য কতকগুলি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মার্ক্স, এঙ্গেলস, এমিল জোলা, টলস্টয় প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌দের রচনার অনুবাদ নিষিদ্ধ হয়।

১৯০১ সালে জাপানে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। কিন্তু গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একই দিকে সরকার তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০৩ সালে প্রথম জাপানে একটি সমাজতন্ত্রবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরের বছর 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়। হেইমিন শিম্‌বুন (Heimeen Shimbun) নামে একটি বামপন্থী পত্রিকায় অনুবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯০৫ সালে জাপানের শ্রমজীবী মানুষ রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত পোর্টসমাউথ চুক্তির কয়েকটি শর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য টোকিও শহরে এক শান্তিপূর্ণ জমায়েতে সামিল হয়েছিলেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের আক্রমণে বেশকিছু ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হন। ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন এবং গণ-অসন্তোষ ও প্রতিরোধের ফলে ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে কাৎসুরা সরকারের পতন ঘটে।

এরপর ১৯১০ সালে ঘটে 'কোতোকু ঘটনা (Kotoku Incident) । কোতোকু ছিলেন জাপানের প্রথম যুগের সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। ১৯১০ সালে কোতোকু ও তাঁর কিছু অনুগামীর বিরুদ্ধে সম্রাটকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুগামীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্য করা পরিকল্পনামাফিক মামলা ছিল এটা। এই সাজানো কোতোকু ও তাঁর ১১ জন অনুগামীর মৃত্যুদণ্ড হয়। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের ফলে বেশ কিছুকাল সমাজতন্ত্রবাদী কার্যকলাপ বন্ধ থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আবার সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আসে। যুদ্ধের সময় জাপ অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি ঘটে ; শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে। ১৯১৮ সালে ঘটে 'চাউল দাঙ্গা' (Rice Riots), যা বহু মানুষকে জাপানের অভ্যন্তরের সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। জন ইমার্সনের মতে, চাউলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই 'দাঙ্গা' জাপানের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো জাপানের অভ্যন্তরেও মার্ক্সবাদী মতাদর্শের বিকাশে সাহায্য করেছিল।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে টোকিও শহরে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দমন ও নিপীড়ন এত তীব্র ছিল পার্টিকর্মীদের অত্যন্ত গোপনে কার্যকলাপ চালাতে হত। বিপ্লবী বামপন্থীদের শক্তির একটা বড় অংশ আসত ছাত্রসমাজ থেকে, যারা বহুসংখ্যক 'সমাজবিজ্ঞান পাঠচক্র', ছোট ছোট

গোষ্ঠী এবং জঙ্গি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। এইসবগুলির আকার ছিল ছোট, ফলে তারা এত দ্রুত পুনর্গঠিত হতে পারত যে নাম ধরে তাদের খুঁজে পুলিশের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের মাত্রা এত বেশি ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টিসদস্য সবসময়ই কারান্তরালে থাকতেন। এই বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনে বড় ভূমিকা পালন করত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। পুরোনো সদস্যরা বন্দি হওয়ার পর প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের স্নাতকেরা বামপন্থী পার্টিগুলিতে যোগদান করে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতেন। এমনকি ১৯৩৩ সালের পরে যখন চরম বামপন্থী পার্টি ও ইউনিয়নগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠচক্রগুলিতে মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন এবং মার্ক্সীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে নতুনভাবে মার্ক্সবাদের আবির্ভাব ঘটে তার পেছনে পূর্বেকার সময়ের এই বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

৬০.৭ সারাংশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দূরপ্রাচ্যে জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই চীনের বিশাল বাজারের সুবিধা নিতে চাইছিল। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানি প্রবাসনের প্রশ্নটি (Immigration Question)-র আশু নিরসনের প্রয়োজন ছিল। ফলে আহূত হল ওয়াশিংটন সম্মেলন যদিও দুর্বল চীন ছিল এই সম্মেলন আহ্বানের পশ্চাদভূমি। এই সম্মেলন চীনকে সন্তুষ্ট করে সান্টুং প্রদেশ ফিরিয়ে দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সম্মেলন জাপানকে দূরপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ওয়াশিংটন সম্মেলন দূরপ্রাচ্যে যে শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করল তাকে ব্যবহার করে জাপান আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সংহতি নিয়ে আসে ও আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রচণ্ড দমনপীড়ন নীতির মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়। ১৯২৭ সালের পর জাপানের রাজনীতিতে, শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। এরপর জাপান মাঞ্চুরিয়া বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়।

৫৯.৭ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন ঃ

(ক) ওয়াশিংটন সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করুন।

(খ) ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত প্রধান চুক্তিগুলির শর্তাবলি আলোচনা করুন।

(গ) জাপানের সংবিধান রচিত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে জাপান কর্তৃক চীনের মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ড দখল করার সময়কাল পর্যন্ত জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কী ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) জাপানে মার্ক্সবাদী মতাদর্শের বিকাশের পরিচয় দিন।

২। **টীকা লিখুন ঃ**

(ক) জাইবাৎসু ব্যবস্থা।

(খ) পঞ্চশক্তি চুক্তি।

(গ) নয়শক্তি চুক্তি।

(ঘ) ইয়ামাগাত-ইতো দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

(ঙ) জাপানের বামপন্থী আন্দোলন।

৬০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Fairbank, Reischeaner, Craig : East Asia Tradition and Transformation.

২। K. S. Latourette : The History of Japan.

৩। W. R. Keylor : The Twentieth Century World.

৪। Reihard Storry : A History of Modern Japan.

৫। John Halliday : A Political History of Japanese Capitalism.

৬। সিদ্ধার্থ গুহ রায় : আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস।

একক ৬১ ❒ ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিবর্তন

গঠন

৬১.০ উদ্দেশ্য
৬১.১ প্রস্তাবনা
৬১.২ চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি
৬১.৩ কে. এম. টি. পি ও সি. সি. পি-র মধ্যে ভাঙন ও আভ্যন্তরীণ সমস্যা
৬১.৩.১ সরকারের পরিকাঠামো
৬১.৩.২ পররাষ্ট্রীয় বিপদ : জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ
৬১.৩.৩ দীর্ঘ পদযাত্রা ১৯৩৪-১৯৩৫
৬১.৩.৪ মূল্যায়ন
৬১.৪ চীনের আর্থসামাজিক বিবর্তন
৬১.৫ সারাংশ
৬১.৬ অনুশীলনী
৬১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.০ উদ্দেশ্য

তৎকালীন চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আমরা একটি অপর ধরনের সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দেখতে পাই। এই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নেতা হিসাবে জাপানের সামরিক সরকার চিহ্নিত হয়েছিল। অন্যদিকে চীনের জাতীয় জীবনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। তবে এই জাতীয়তাবাদী শক্তি জাপানি সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে অপরাগ হয়। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদী শক্তি বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে এক সমঝোতা মূলক সম্পর্ক স্থাপন করে।

এই এককটি পড়ার পর আপনি যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন তাহ'ল—

- তৎকালীন চীনে এই দুই শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক।
- এই সম্পর্ক কখনও সমঝোতামূলক আবার কখনো বিরোধিতামূলক।
- চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন তার গঠনমূলক সময়কালে কিভাবে পরস্পরবিরোধিতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছে।
- এই পরিস্থিতিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কী ছিল।

- রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে আপনারা আলোচ্য সময়কালে চীনা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা চীনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে।

৬১.১ প্রস্তাবনা

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন চীনের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চীনে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার স্বতন্ত্র উন্মেষ ও তার ক্রমবর্ধমান বিকাশ এই সময়টিকে আলোকিত করেছে। চীনের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমিতে কমিউনিস্ট তথা সাম্যবাদী দলের উত্থান এবং তার বিবর্তন ভবিষ্যতে চীনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় একটি সুসংগঠিত পার্টির মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিল এবং পরিচালিত হয়েছিল সাম্যবাদী আন্দোলন যা প্রতিষ্ঠা করেছিল বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পরিকাঠামো।

সান ইয়াৎ-সেন পরিচালিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট ও পার্টি চীনা রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রদান করেছিল। আমলাতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই পার্টির ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তনে জনগণের সক্রিয় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে গৃহীত হয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষায় প্রদান ও বিস্তার, ভূমি-বন্টন, অর্থনৈতিক উন্নতি। এইসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা জাগরিত করার জন্য চীনা সাম্যবাদী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জোরদার করে তোলা প্রাধান্য পায়।

এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। আলোচ্য সময়কালে চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী প্রাধান্য পায়। ফলে সাম্যবাদী সদস্যদের ওপর অত্যাচার চালান হ'লে সাম্যবাদীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এইসময় (১৯৩১) জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। চিয়াং সরকারের জাতীয়তাবাদী দল এই জাপানি আক্রমণ রোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে চীনের সামগ্রিক স্তরে তথা রাজনৈতিক, র্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। চীনের সামগ্রিক ব্যবস্থায় যিনি পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন আধুনিক চীনের রূপকার মাও-জে-ডং। চীনের এই যে সামগ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এল তার ভিত্তিভূমি ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সশস্ত্র আন্দোলন। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের মূলে ছিল পার্টির সুপরিকল্পিত কার্যকলাপ এবং সেনাবাহিনীর ইতিবাচক ভূ মিকা। এই ক্ষেত্রে জিয়াংসি সোভিয়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৬১.২ চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯২১-১৯৩৭

১৯১৮-১৯৪৫ সালের অন্তর্বর্তী সময়কাল চীনের ঐতিহাসিক বির্বতনের এক জটিল অধ্যায়। রুশ বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য এই সময় চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাতাবরণকে প্রভাবিত করে। একদিকে যেমন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন হল অপরদিকে জাতীয়তাবাদী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন

ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক বুনয়াদকে জোরদার করতে প্রয়াস নিল। চীনের বুদ্ধিজীবীদের কাছে যেমন পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শন সহজে গ্রহণযোগ্য মনে হল না তেমনই আবার পশ্চিমে উদ্ভূত মার্ক্সীয় দর্শনের কিছু দিক যেমন "Utopian Socialism", Anarchism এবং মার্ক্সের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ ঐ সকল বুদ্ধিজীবীবদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। এরই সঙ্গো সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং সহযোগিতা চীনকে মার্ক্সীয় পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ১৯২০ সালের মধ্যেই চীনে বেশ কয়েকটি সাম্যবাদী সংগঠনের জন্ম হয় শাংহাই এবং পিকিং-এ। চীনের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহল পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিতভাবে মার্ক্স এবং লেনিনের ভাবাদর্শ সম্প্রসারে নিযুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক নবচেতনার জাগরণ করতে সমর্থ হয় এবং শোষিত মানুষের হাতে এক রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দেয়। এই ভাবধারা বিরস্তারিত হতে থাকে কৃষক, শ্রমিক, এবং ছাত্রকুলের মধ্যে। এরই মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি. সি. পি) জন্ম হয় ১৯২১ সালে। প্রথম পার্টি কংগ্রেসেই চীনের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথ নির্ধারিত হয় এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের অবসানের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯২২ সালে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্ত্রতন্ত্রের বিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ধীরে ধীরে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে চীনের সমস্ত মানুষকে সামিল করতে কমিউনিস্ট পার্টি সচেষ্ট হয়। ১৯২২-১৯২৩ সালের বেশ কিছু শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং বহুস্থলে ধর্মঘট হয়। হংকং নাবিক ধর্মঘটে পার্টি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিতে সফল হয়। অপরদিকে রেল এবং সড়ক শ্রমিকদের আান্দোলনের উপর সামন্তরাজদের জঙ্গিবাহিনীর কঠোর দমন-পীড়ন কমিউনিস্ট পার্টিকে এক নূতন চেতনার সম্মুখীন করে। তাঁরা অনুধাবন করেন যে চীনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে সফল করতে সকল শ্রেণীর মানুষকে যেমন কৃষক এবং বুর্জোয়া গোষ্ঠীকেও সঙ্গো নিয়ে এক যৌথ বৈপ্লবিক ফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করার প্রয়োজন।

অপরদিকে রুশ বিপ্লবের সাফল্য এবং এই দেশের নূতন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনের সূচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে চীনের ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রধান সান-ইয়াৎ-সেন চীনের তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের সঙ্গো এক গঠনমূলক সহযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এই সময়কালে (১৯২২-২৪) এই দুই পার্টি সক্রিয় হয় এক যৌথ বৈপ্লবিক ফ্রন্ট স্থাপনের যা বর্তমান চীনের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ সম্প্রসারে এবং বিপ্লবের পথকে আশ্রয় করতে সমর্থ হবে। এই দুই পার্টির সমন্বয়ের মাধ্যমে সান-ইয়াৎ-সেন মূলত চেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের ছত্রছায়াত থাকা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সাথে (তার পার্টির) ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা, এই সুবাদে সোভিয়েত রাশয়ার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া এবং এর মাধ্যমে তাঁর নিজের পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলাপরায়ণতা আনা। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি এই সুযোগটি নিজেদের সংগঠনিক সম্প্রসারণের সহায়তার কাজে লাগাতে সক্ষম হয় এবং দেশের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার সুযোগ পায়। ১৯২৪-২৬ সালে এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট গোয়াংচু (ক্যান্টন) এলাকায় নিজেদের কর্মবিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই সময় রাজনৈতিক নানান উত্থান-পতনের প্রেক্ষিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও-জে-দং অনুভব করলেন যে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থানের মাপকাঠিতে কৃষক শ্রেণীই হচ্ছে তাঁর ইপ্সিত বিপ্লবের মূলশক্তি। সেই সূত্র ধরেই এই যৌথ যুক্ত বহু কৃষক এবং শ্রমিকগণকে

সংগঠিত করে। এই বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে চীনের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব প্রান্তে অভিযান চালিয়ে সামন্ত শক্তিকে পরাস্ত করে বিপ্লবের ধ্বজাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট চীনে যখন গঠন হয় (১৯২৪-১৯২৬) তখন সান-ইয়াৎ-সেনের জনগণের তিনটি তথ্যকে (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং জনগণের জীবিকা) মাথায় রেখে কুয়ো-মিন-তাং (KMT) ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)-র সঙ্গে সহযোগিতায় সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই যুক্তফ্রন্টকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী মঞ্চ হিসেবে মানা হয়েছিল। এই যুক্তফ্রন্টের চলাকালীন কৃষক এবং কর্মীদের নিয়ে সংগঠন করা হয় এবং একটি বিপ্লবী সেনা তৈরি হয় যার পরিচয় আমরা পেয়েছি দুটো পূর্ব অভিযানের সাফল্যে। একটি হল হংকং-এর ক্যান্টন Merchent Volunteers-এর অভ্যুত্থানের দমন ও দক্ষিণ দিকের অভিযান। ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুতে কুয়ো-মিন-তাং (KMT) এবং (CCP)-র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে চিড় খায়। দুই দলই নানা ধরনের সুবিধা পেয়েছিল। বিপ্লবীরা তখন সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে বেশ কয়েকটি warlord (যুদ্ধবাজ সামন্তপ্রভু)-দের ক্ষমতাচ্যুত হতে চায়।

জাতীয়াতাবাদী সরকারের গঠন হয় ১৯২৫ সালে। এই সময় চিয়াং-কাই-শেক-এর ক্ষমতার উত্থান দেখা যায়। উত্তর অভিযানের সময় চিয়াং-কাই-শোকের নেতৃত্বাধীনে বেশ কয়েকটি Warlord পরাজিত হয়। এছাড়া মধ্য চীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেমন উ-হান, নানচাং, সাংহাই, নানকিং ইত্যাদি সরকারের অধীনে চলে আসে।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯২৫ সালে চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধান হন ওয়াং-চিং-ওয়েই যিনি কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, অপরদিকে চিয়াং-কাই-শেক চীনের হুয়াং-পু (হোয়াম পোয়া) সামরিক একাদেমীর প্রধান হিসাবে সামরিক মহলে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকেন। এই সুবাদে জাতীয়তাবাদী সরকার চিয়াং-কাই-শেককে পিকিং সামন্ততান্ত্রিক সরকারকে অপসারণের দায়িত্ব দেয়। কিছুকালের মধ্যেই চীনের দক্ষিণ ভাগও জাতীয়তাবাদী সরকারের অধীনে চলে আসে।

৬১.৩ কে. এম. টি. পি ও সি. সি. পি-র মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমস্যা

সান-ইয়াৎ-সেনের অন্যতম রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ছিলেন ওয়াঙ-চিঙ-ওয়েই। যিনি ছিলেন হোয়াম-পু সামরিক একাদেমির চেয়ারম্যান এবং এই একাদেমীর সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন চিয়াং-কাই-শেক। সান-ইয়াৎ-সেন চিয়াং-কে সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে চীনে এল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের জোয়ার। এই সময় কে. এম. পি ও সি. সি. পি-র সামনে জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে ১৯২১-১৯২৫ সালে অনেকগুলি ধর্মঘট হয়। তবে ১৯২৫ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময় একটি প্রশ্নে তাদের (কে. এম. টি. পি. ও সি. সি. পি.) ঐক্যের মধ্যে ভাঙনের প্রচ্ছন্ন আভাস দেখা যাচ্ছিল। বিপ্লবের শেষ লক্ষ্য কী হবে? শ্রেণীসংগ্রাম নাকি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। কিছু নেতা এই সময় সাম্যবাদী দলের বিরুদ্ধে

সম্মিলিত পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কে. এম. টি. পি ও সি. সি. পি মৈত্রী বজায় ছিল। চিয়াং-কাই-শেক ও তাঁর হোয়াম-পু সামরিক একাদেমির ক্যাডেটরা একটি সফল কুদেতা (তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থান) দ্বারা কিছু কমিউনিস্ট নেতাকে বিতাড়িত করেন। চিয়াং-কাই-শেকের বর্ধিত সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে য়োঙ-চিং-ওয়েই ও জাতীয় সরকার ক্যান্টন থেকে উ-হানে চলে যায়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে কমিন্টার্ণের অধিবেশন বসে এবং উ-হান সরকারের সঙ্গো একত্রে কাজ করার নির্দেশ পায় সি.সি.পি। ১৯২৭ সালের প্রথমদিকের কিছু ঘটনা কে. এম. টি. পি ও সি. সি. পি-র মধ্যে ভাঙন নিয়ে এল। চিয়াং কিয়াংসির নানচাঙে তাঁর সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখান থেকে বিদেশি রাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে তিনি চীনা সাম্যবাদীদের উপর আক্রমণ চালান এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন। লি-তা-চাও ও অন্যান্য অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ো হয়। ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট সশস্তর আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। এই বছর চিয়াং নানকিং-এ নিজস্ব সরকার গঠন করেন। উ-হানের জাতীয় সরকারকে তিনি অগ্রাহ্য করেন।

KMT-র নেতৃত্বের মধ্যেও দুটি ভাগ দেখা দেয়—দক্ষিণ এবং বামপন্থী গোষ্ঠী। KMT-র বামপন্থী গোষ্ঠী Wuhan-এ কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে গণআন্দোলন করে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে KMT-র দক্ষিণপন্থীরা পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনে বিশেষত নানকিং-এ নিজেদের সত্তা শক্তিশালী করে। বলা হয় যে, চিয়াং-কাই-শেখ দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর দিকে হওয়ার ফলে নূতন করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে KMT শাসিত সরকার নানকিং শহরে গঠন করে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে এই সরকার কঠোরভাবে চীনে শাসন চালায়। একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল অপরদিকে পররাষ্ট্র জনিত সমস্যা KMT সরকারকে ব্যস্ত রাখে।

এইসময় KMT সরকারের প্রধান কার্যকলাপ ছিল চীনের ঐক্যকরণ (Unification)। ইয়াং-সি-নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা সবথেকে উন্নত হওয়ার ফলে চিয়াং নিজের রাজধানী ইয়াং-সি নদীর কাছে স্থানান্তরিত করেন। ১৯২৪ সালের মধ্যে চিয়াং-এর প্রভাব বেইজিং-এর উত্তরদিকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছোয়। মাঞ্চুরিয়া যেখানে স্থানীয় warlord বা সমরনায়ক জাপানি আধিপত্যে ভীত ছিল। যদিও চিয়াং বিভিন্ন warlord-দের পরাস্ত করেন, warlordism চীনে নির্মূল করা সম্ভব ছিল না, ফলে চিয়াং নিজের সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকটি warlord-দের স্থান দেন। তবে, ১৯৩০ এ সাংসি অঞ্চলে কয়েকটি warlord-রা সরকারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। সরকারের বাহিনী দ্বারা পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও KMT-র রাজত্ব সফল হয়নি। একই সঙ্গো দেখা যায় যে, সেনা-প্রধানেরা অনেক সময় warlord-দের পক্ষে থাকে, যার ফলে warlord-দের কোনো মতেই সরকার নিজের অধীনে আনতে পারে না। ১৯৩৬ সালের মধ্যে KMT সরকারের অধীনে $^{২}/_{৩}$ অংশ জনগণ থাকা সত্ত্বেও $^{১}/_{৪}$ অংশ চীন সরকারের অধীনে ছিল। বলা হয় যে, সরকার নিজেদের কার্যকলাপ বেশিরভাগ সময় শহরাঞ্চলে সীমিত রাখে যার ফলে গ্রামীণ প্রশাসনক স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত হয়।

৬১.৩.১ সরকারের পরিকাঠামো

KMT সরকার ১৯২৮ সালে একটি অস্থায়ী সংবিধান "An Outline of Political Jutelage" গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সরকারে পার্টির ভূমিকা প্রাধান্য পায়। একদিকে পার্টির উপরে জনগণের চারটি

অধিকারের (Election, Recall, Initiative, Referendum) বিষয়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পড়ে যায়, অপরদিকে সরকারের পাঁচটি ক্ষমতার (Executive, Legislative, Judicial, Control and Examination) উপর দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে।

KMT সরকার 5-Yuan-structure ভিত্তিক ছিল। এই কাঠামোটি রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করত (Executive Yuan, Legislative Yuan, Judicial Yuan, Examination Yuan and Control Yuan)। Executive Yuan দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক অঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ক্যাবিনেট এই ক্ষমকাটি প্রয়োগ করত। এই Yuan-টি কেবল দেশের রাষ্ট্রপতির ও পার্টির কাছে দায়বন্ধ ছিল। Legislative Yuan প্রধানত একটি আইন তৈরির সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত ছিল। Judicial Yuan দেশের সর্বোচ্চ Judicial অংশ হিসেবে জানা যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া হত। Examination Yuan দুইভাবে গঠিত হয়। একটি ভাগ (Examination Commission) বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরীক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বে ছিল। Control Yuan দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সরকারি কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং অপরাধী সরকারি কর্মীদের দণ্ড দেওয়া হত।

বলা হয় যে সরকারের এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সান-ইয়াৎ-সেনের তিনটি জনগণের নীতি সম্প্রসারণ, সংবিধানের পঞ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় পুনঃনির্মাণ নীতির প্রয়োগ করার একটি চেষ্টা ছিল। কিন্তু এই সরকার তিনটি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে পড়ে—জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিক, সামাজিক বিপ্লব।

জাতীয় সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গো সঙ্গো বিভিন্ন ধরনের warlord-এর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বলা হয় যে এই শতকটি (১৯২৭-৩৭) চীনের 'আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও পররাষ্ট্রীয় আক্রমণের' দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে চিয়াং-কাই-শেক-এর স্বৈরাচারী প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার নীতির অভাবে কৃষকগোষ্ঠীর অবনতি ঘটে, যার ফলে warlordism বা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর মালিকানা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়নি। অপরদিকে সরকারি সেনা এবং ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য চিয়াং সেনার আধুনিকীকরণ নীতির উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর মালিকরা সরকারের সঙ্গো ততক্ষণই সহযোগিতা করত যতক্ষণ তাদের স্বার্থ বজায় থাকত।

১৯২৯ সালে কে. এম. টি একটি প্রস্তাবনা পার্টি কংগ্রেসে আনে—

বিভিন্ন সেনাগোষ্ঠীদের একত্রিকরণ করে একটি রাষ্ট্রীয় সেনাদল তৈরি করা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রশাসনের মধ্যে কেন্দ্রীকরণ করা। ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর মালিকেরা এই প্রস্তাবনা সমর্থন করেনি।

কে. এম. টি-র পার্টির মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব সরকারের উপর পড়ে। কেয় এম.টি-তে কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী হিসাবে একটি 'বামপক্ষের' উদ্ভব হল। কে. এম.টি-র কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে আশ্চর্যভাবে সমতা রক্ষা করছিল এই কেন্দ্রীয় 'বামপক্ষ'। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীদের সঙ্গো নিয়ে চিয়াং আইন প্রণয়ন সভার রাষ্ট্রপতি হন। অপরদিকে KMT-এর বামগোষ্ঠী চিয়াং-এর নীতির কঠোর বিরোধিতা করেন, ফলে ১৯৩১ সালে বামগোষ্ঠী ক্যান্টন-এর একটি নূতন সরকার গঠন করে। জনসাধারণের বিরোধিতা সক্রিয় হওয়ার ফলে

চিয়াং ডিসেম্বর ১৯৩৫-এ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩২ সালে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। চিয়াং-কাই-শেককে Military Commission-এর সভাপতিত্ব দেওয়া হয় এবং বামপক্ষের নেতা ওয়াঙ-চিঙ-ওয়েইকে প্রশাসনিক সভার রাষ্ট্রপতি করা হয়।

১৯৩৩ সালে KMT সরকার পুনরায় সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ক্যান্টন-এর "Nineteenth Routh Army" যারা জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা Fukien-এ নূতন জনসাধারণের বৈপ্লবিক সেনা তৈরি করে একটি গণবৈপ্লবিক সরকার গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করে। এ সেনাগোষ্ঠী জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাবনা দেয়। ১৯৩৪ সালে সহযোগিতার অভাবে এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় সরকার দমন করতে সফল হয়।

১৯২৭ সালের ঘটনার পর KMT-র কমিউনিস্টদের মধ্যেও আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল—একটি গোষ্ঠীতে মস্কোয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট নেতারা যোগ দেন (Twenty Eighth Balshevik); অপর গোষ্ঠীতে মাও এবং অন্য নেতারা যোগ দেন যারা চীনের রাজনৈতিক অবস্থাভিত্তিক স্বাধীন নীতির পক্ষে ছিলেন। প্রথম গোষ্ঠীর প্রভাবে কমিউনিস্টরা শহরাঞ্চলে বেশ কয়েকটি ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যোগ দেয়। অপরদিকে মাও গোষ্ঠী কৃষকদের সংগঠন করা এবং কিছু অঞ্চলে সোভিয়েত প্রশাসনের গুরুত্ব দেন। মাও-এর সাফল্যে KMT সরকারের দুশ্চিন্তা দেখা যায়। ১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং পাঁচটি কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি—("Encirclement & Extermination) গ্রহণ করে। চার বার অসফল হওয়ার পর KMT সরকার পঞ্চমবার একটি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে যার ফলে সেনাবাহিনী প্রথমে কমিউনিস্টদের ঘিরে ফেলে এবং ক্রমশ আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কমিউনিস্ট অধীন এলাকাগুলিতে বিভিন্ন খাদ্য এবং আর্থিক অভাব প্রকট হতে আরম্ভ করে। এর ফলে KMT সরকার কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার চালাতে সফল হয়। কোনো কোনো লেখক মনে করেন যে, কমিউনিস্টদের পরাজয় ঘটে মাও দ্বারা প্রস্তাবিত রণকৌশল নীতি গ্রহণ না করায়। এর ফলে Red Army-র প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেয়। এরই সঙ্গে কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চল থেকে কমিউনিস্টদের সরে যেতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালে জনপ্রিয় Long March আরম্ভ হয়। বলা হয় যে Long March এবং Tsunyi সম্মেলন মাও-এর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। Tsunyi কংগ্রেসে মাও-এর উত্থানের বাধা হিসেবে পরিচিত। ১৯৩৬ সাল থেকে মাও দৃঢ়তাপূর্বক পার্টি ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন। বলা হয় যে একদিকে যেমন KMT সরকার কমিউনিস্ট বিরোধিতার মোকাবিলা করে, অপরদিকে মাও-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ সুসংগঠিত হয়ে ওঠে।

৬১.৩.২ পররাষ্ট্রীয় বিপদ : জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

আভ্যন্তরীণ ঘটনার পাশাপাশি KMT সরকার বিদেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। উত্তর-পশ্চিম চীনে একটি সমৃদ্ধশালী খণ্ড, মাঞ্চুরিয়া বহু সময় থেকে সম্পদহীন জাপানকে আকৃষ্ট করে। ১৯১২ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে জাপান বহুবার মাঞ্চুরিয়া দখল করার চেষ্টা করে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে জাপানের বিশ্বাস ছিল যে বিশ্ব জয় করতে হলে সর্বপ্রথম চীনকে দখল করা প্রধানত মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়াকে অধীনস্ত করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। ১৯৩১ সালে চীন যখন আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত তখন জাপান এই সুযোগ নিয়ে চীন আক্রমণ করে। জাপানি আক্রমণ

রুখতে চীন অক্ষম হয়ে পড়ে কারণ একদিকে আভ্যন্তরীণ সমস্যার বৃদ্ধি অপরদিকে পশ্চিমী দেশের অসহযোগিতা থাকায় "Nine Power Treaty" (1912) এবং "Kellog-Briand Pact" (1928) জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে কোনো রকমের সাহায্য দেয়নি। জাপানি আক্রমণের সময় KMT সরকার সেনাবাহিনীকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠায়নি, অপরদিকে KMT সরকার গৃহযুদ্ধ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও বলা হয় যে জাপানের বিরুদ্ধে চীন League of Nations-এর সাহায্য চায় কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা বা economic depression দেখা দেওয়ার ফলে যথার্থ সাহায্য পায় নি, যার ফলে KMT সরকার জাপানিদের বিরোধিতা করেনি এবং প্রত্যক্ষ আলোচনায় বসেনি। বেসরকারি কয়েকটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীরা কোনো কোনো স্থানে জাপানের বিরোধিতা করে বলে জানা যায়।

১৯৩২ সালে জাপানি সেনা সাংহাই শহর আক্রমণ করে যার বিরোধিতা ক্যান্টন-এর Nineteenth Route Army ও Nanking-এর Fifth army করে। এক মাসের মধ্যে চীনের Leyong শহরে চলে যায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সাংহাই-এর কিছু অংশ জাপান চীনকে ফেরত দেয় কিন্তু উত্তর-পূর্বান্তে চারটি অঞ্চল নিজের অধীনস্ত করে।

এই পরাজয় মাও-জে-ডংকে বিপ্লবের জন্য প্রকৃত এক সামরিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝায়। এই পরাজয় Stalin দ্বারা প্রস্তাবিত রণনীতি সমকালীন চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিপরীত ফল আনে (চীনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়)। অপরদিকে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা জেনে মাও একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জনগণের সামনে আনেন—রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎসারিত হয় বন্দুকের নল থেকে এবং পার্টির দায়িত্ব সর্বদা এই বন্দুকটিকে নিয়ন্ত্রণ রাখা, ফলে মাও জনসাধারণকে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করার কার্যক্রম গ্রহণ করে চীনে Peoples' war গঠন করেন। একদিকে জনসাধারণ সেনাবাহিনীকে নিজেদের অঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় অপরদিকে সেনাবাহিনী মানসিকভাবে জনসাধারণের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

৬১.৩.৩ দীর্ঘ পদযাত্রা ১৯৩৪-১৯৩৫

১৯২৭ সালের পর যদিও চীন সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়, প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের অগ্রগতির পথ রোধ করে দেয় চিয়াং-কাই-শেক-এর নেতৃত্বাধীন একনায়কতান্ত্রিক কোয়ামিনটাং সরকার। ঐ সময়ে কমিউনিস্টরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় এবং কুয়োমিনটাং সরকারের অত্যাচারে তাদের শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনগুলি ভেঙে যায়। যেখানে কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা পল্লিগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নেয় সেখানে কুয়োমিনটাং সরকারের বাহিনীর সংযোগ কম। ১৯২৭-৩৭ সালের মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ গণ-জাগরণের ঘটনা ঘটে যেমন নানচাং এবং গোয়াংজতে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই এবং কৃষক বিপ্লব। এইভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামভিত্তিক সশস্ত্র আন্দোলনের পরিকাঠামো তৈরি করতে থাকে, যার ফলস্বরূপে লাল ফৌজ বা রেড আর্মির জন্ম হয়।

এই সময় চীনে এক অভূতপূর্ব আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। কমিউনিস্টদের মধ্যেও বিপ্লবের পথ নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। একটি গোষ্ঠী সোভিয়েত রাশিয়ার ২৮ বলশেভিক অভিজ্ঞতার আধারে নিজেদের বিপ্লবকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। মাও-জে-দং সমর্থিত অপর গোষ্ঠী অন্যের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পথে চলার স্বপক্ষে ছিল।

বাস্তবিকপক্ষে চীনা সাম্যবাদী দল প্রথম থেকেই মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে আসছিল। বলশেভিক প্রভাবিত Polit Bureau মাও-জে-দং-এর কাছে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে চীনা সাম্যবাদী দল দুটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। কারণ ১৯২৭ সালের আগস্ট মাস থেকে মাও-এর নেতৃত্বে কৃষক ও সৈনিক আন্দোলনগুলি ব্যর্থ হচ্ছিল তা দলের জেনারেল সেক্রেটারি চেন-তু-সিউ দ্বারা সমালোচিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় একটি অংশ মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাম্যবাদীদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের নেতৃত্বে গঠিত হল। অপর অংশ মা-ওর নেতৃত্বে স্বাধীনভাবে ঊনান এবং জিয়াংসিতে সাম্যবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হল। মাও জিয়াংসিতে চীনা সোভিয়েত গঠন করেন। ১৯৩১ সালে প্রথম চীনা সোভিয়েত রিপাবলিক ঘোষিত হয় জুই চীন বা জিয়াংসিতে। এখানে চু-তে'র সাহায্যে গঠিত হয়েছিল লাল ফৌজ বা Red Army।

মাও-এর সামনে আরও একটি সমস্যা ছিল চিয়াং সরকারের পরিচালিত সামরিক বাহিনী। নব্য প্রতিষ্ঠিত এই সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য চিয়াং সরকারে বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। কারণ এই সোভিয়েত জিয়াংসি ও ঊনান প্রদেশের কৃষকদের নিয়ে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে জমির সমবন্টন করেছিল এবং প্রতিরক্ষার জন্য গেরিলা বাহিনী স্থাপন করে। সশস্ত্র আন্দোলনের পদ্ধতিকে শ্রেণীসংগ্রামের এক মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে এই সোভিয়েত কতৃক গৃহীত হয়। চিয়াং সরকারের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল শহরকে কেন্দ্র করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা শিল্প সমর্থিত সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করছে। কৃষক সমাজের সমর্থন তারা অনুধাবন করেন নি। কৃষক সমাজও যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হতে পারে তা জাতীয়তাবাদী চিয়াং সরকারের ধারণার বাইরে ছিল। কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রেণীসংগ্রামেরও বিরোধী ছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কুক্ষিগত চিয়াং সরকার ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। আর মাও-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদীরা ভূমিসংস্কার কার্যকরী করতে য-বান হয়। মাও-জে-জং বলেছিলেন, "কৃষকশ্রেণীর সমর্থন যে পাবে চীন তার করায়ত্ত হবে ; যে চীনের ভূমি সমস্যার সমাধান করবে একমাত্র সেই কৃষকদের সমর্থন পাবে।" কে. এম. টি সরকার ১৯৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৪ সালের অক্টোবরের মধ্যে কমিউনিস্ট ও অন্য সাম্যবাদীদের উপর পাঁচটি আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযান ছিল অবরোধ ও নিশ্চিহ্ন করার অভিযান ("Campaign of encirelement of extermination.") । চিয়াং জার্মান পরামর্শ অনুযায়ী জিয়াংসি অঞ্চলকে অবরোধ করার জন্য ব্লক হাউস, রাস্তা, দুর্গ, ট্রেঞ্চ তৈরি করতে থাকেন। চিয়াং-এর সামরিক বাহিনীর কাছে ছিল গোলাবারুদ, মেশিনগান প্রভৃতি। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই অবরোধ ও সামরিক চাপের ফল খুব শীঘ্র দেখা গেল। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে কমিউনিস্টদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। অবরুদ্ধপ্রায় লক্ষাধিক সাম্যবাদী তথা লাল ফৌজ চিয়াং সরকারের অবরোধ ভেঙ্গে জিয়াংসি থেকে চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল সেন-শি প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়। চীনা কমিউনিস্টদের এই অবরোধের ভাঙন ও সেন-শি প্রদেশ অভিমুখে পদযাত্রাই বিশ্বের ইতিহাসে 'দীর্ঘ পদযাত্রা' বা 'Long March' নামে খ্যাত। এক বছর ব্যাপী (১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত) অসহনীয় দুর্গম পথে অসহ্য কষ্ট বরণ করে কমিউনিস্টরা বা লাল ফৌজরা পদযাত্রা করেন। তাঁরা এগারোটি প্রদেশের মধ্যে দিয়ে ৬ হাজার পথ অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে অনাহারে, অসুস্থতায় প্রাণ

হারায় বহু পথযাত্রী। যাত্রাকালে লাল ফৌজের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ এবং শেষপর্যন্ত পীত নদীতীরে উত্তর সেন-শি বিপ্লব ঘাঁটিতে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল আট হাজার। যাঁরা এই পদযাত্রাকে সফল করে তুলেছিলেন তারা পরবর্তীকালে খাঁটি কমিউনিস্ট হয়ে ওঠেন। তাঁদের অসীম মনোবল সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে তোলে।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্যবাদীরা ঊনান দখল করে এবং এখানে তাদের নতুন রাজধানীও স্থাপিত হয়। তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছিল সেন-সির উত্তরে চীনা প্রাচীরের (Great Wall) দক্ষিণ ভাগ এবং কানসু প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। এই অঞ্চল ছিল স্থানীয় সমরনায়কদের (War Lord) অত্যাচারপূর্ণ কর ব্যবস্থা ও ভ্রান্ত শাসনব্যবস্থা দ্বারা জর্জরিত। কমিউনিস্টরা ন্যায়বিচার, সুশাসন ও কৃষিসংস্কার দ্বারা জিয়াংসি সোভিয়েতের সাফল্য এখানে সুনিশ্চিত করেন।

৬১.৩.৪ মূল্যায়ন

নানকিং-এ জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের দিন থেকে ১৯৩৭ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত KMT সরকারকে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবং বিদেশি শক্তির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মাঞ্চুরিয়া, সাংহাই এবং উত্তর প্রান্তে জাপানি আক্রমণ, অন্যদিকে গৃহযুদ্ধ অবসানের জন্য এবং জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হতে থাকে, যার চাপে কেন্দ্রীয় সরকার কমিউনিস্টদের নিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অপরদিকে KMT সরকারকে চীনের ন্যায় সংগত সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। KMT ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত গ্রামাঞ্চলে কার্যত শাসনব্যবস্থাকে মেনে নেয়। দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষার তাগিদে এবং মিয়াং প্রদেশের ঘটনার পর কমিউনিস্ট এবং KMT-র মধ্যে সহযোগী সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, ফলে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের রেড আর্মির নাম পরিবর্তন করে Eighth Route Army হিসাবে স্বীকৃত দেয়।

জাপানি আক্রমণের সময় KMT সরকার মূলত রক্ষণাত্মক পথকে বেছে নেয়। অপরদিকে কমিউনিস্টরা আক্রমণকারী মনোভাব নিয়ে কার্যকলাপ চালায়। উল্লেখযোগ্য এই নূতন সহযোগিতাকে সামনে রেখে জাপানি ফ্যাসিস্ট শাসকগণ কমিউনিস্টদের দমনের একটি পথ বেছে নেয়। এর মাধ্যমে তারা কে. এম. টি. শাসিত দক্ষিণচীনের ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালায় ও ধ্বংস করতে থাকে। ফলে ১৯৪০ সালের সময়কালে উত্তর চীনের বিস্তারিত অঞ্চল কমিউনিস্টদের দখলে নির্বিঘ্নে চলে আসে এবং তারা জাপানিদের আক্রমণ করতে সক্ষম হয়।

৬১.৪ চীনা আর্থসামাজিক বিবর্তন ১৯২১-৩৯

চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে বিশ দশকে। একদিকে যেমন উৎপাদন ঘটিত সমস্যা দেখা দেয় অপরদিকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বহু মানুষকে আক্রান্ত করে। ১৯২০ দশকে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন হ্রাস পায় ফলে বহু মাত্রায় খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়, ফলে খাদ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় এবং চাষিদের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। ১৯২৯ সাল অবধি চীন অধিক মাত্রায় খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে এবং জাপানি আক্রমণের সময় পর্যন্ত এই পদ্ধতি চলে। অন্যদিকে কৃষি সামগ্রী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের রপ্তানি হ্রাস পায়। এরই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে

চীনের গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। ১৯২১ সাল অবধি বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগে চীন আক্রান্ত হয়। ১৯৩১ সালে চীনে Grand Canal, Yangsi, Tuai নদী প্লাবিত হওয়ার ফলে একটি ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি হয়ে পড়ে। ১৪,০০০ মানুষের মৃত্যু জলে ডুবে হয় এবং ২৫,০০০ মানুষ ২০টি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এরই সঙ্গো যুদ্ধ এবং হিংসার বাতাবরণে বহু কৃষকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার জন্য বাধ্য করা হয়। একই সঙ্গো বহু warlords নতুন কর বসায়, যার ফলে চাষিদের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে গ্রামে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ সালে সরকারি তথ্য অনুযায়ী বেশিরভাগ বেকার হলেন চাষি এবং গ্রামের শ্রমিক।

KMT সরকার অপরদিকে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করে, যার ফলে একদিকে যেমন বিদেশি ঋণ বৃদ্ধি পায় অপরদিকে সরকারের ঘাটতি বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ মানুষের উপর কর ব্যবস্থার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা হয়। ত্রিশ দশকে চীনের ক্ষুদ্র শিল্প রপ্তানি যেমন সিল্ক, তুলো, গোলমরিচ, বাঁশ ও তৈলবীজ ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। এর ফলে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের পরিবারবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে সমকালীন চীনে সাবেকি ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। অপরদিকে উৎপাদন শিল্প নৌবাহন শিল্প এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে সাবেকি ধারা চলার ফলে ধনতান্ত্রিক আধুনিকীকরণে বাধা পায়। KMT শাসনকালে একচেটিয়া আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তার দেখা যায়। চারটি ধনী পরিবার চীনের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে (চিয়াং-কাই-শেক, টিভি সুং, এইচ এইচ কং এবং চিয়েন লু ফু)। এই চারটি পরিবার বিশেষভাবে শিল্প এবং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর মূলে অবশ্য রাজনৈতিক প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯৩৫ সালে এই চারটি ধনী পরিবার ১২% শিল্পের মূলধন নিয়ন্ত্রণ করে।

যে সময় চীনের বেশ কয়েকটি প্রধান শহর জাপানের অধীনে থাকে সে সময় চীনের ভূমি এবং সম্পদের বিশাল অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গো জাপান চীনের বহু সম্পদ, শিল্প এবং বন্দর এলাকা অধীনে করে নেয়। ফলে চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে আর জনসাধারণের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর জাপানের উপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতির ফলে চীনের শিল্প এবং খনিজ জাপানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়। বলা হয় যে আটত্রিশটির মধ্যে ২৪টি চীনা সামগ্রী জাপানের সেনাবাহিনীর জন্য উৎপাদন করা হত (যেমন লোহা এবং ইস্পাত, কয়লা, জ্বালানি এবং রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি)।

জাপানের অধীনে থাকাকালীন চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জাপানীরা বেশ কিছু ধনী ব্যবসায়ীদের নিয়ে কিছু শিল্প এবং Minning করতে উৎসাহ দেখায়। এই প্রয়াসটি অবশ্য জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা মেটাবার জন্য ছিল। অপরদিকে দেখা যায় যে, কুয়ো-মিন-তাং কমিউনিস্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিল। ৩০ দশক থেকে চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি আরম্ভ হয়ে যায়, যার মূলে ছিল বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, জাপানি আগ্রাসন এবং কে. এম. টি. পি.-র অক্ষমতা কারণ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কুক্ষিগত কে. এম. টি. পি. যাবতীয় ভূমিসংস্কারের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল।

ভূমিবন্টন ব্যবস্থা ত্রিশের দশকে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল। KMT সরকার সামন্তবাদী ভূমির ব্যবস্থার বিরোধিতা না করে জমিদার এবং অন্যান্য এলিট্‌দের পক্ষে ভূমিবন্টন করে,

ফলে ভূমি বণ্টনগত সম্পর্ক গ্রামাঞ্চলে সমস্যা এনে দেয় এবং সামন্ত এবং গরিব কৃষকের মধ্যে সংগ্রামটি চলতে থাকে। একটি সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী জমিদারবর্গ চীনের প্রায় অর্ধেকের মতো জমির অধিকারীর বিপীরতে গরিব কৃষকরা (৭০.৫%) অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সালের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত স্বশাসনব্যবস্থা এক বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চীনে আরম্ভ করে।

১৯৩৮-৩৯ সালে বিভিন্ন শহরের স্থাপনার পরে চীনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ দেখা দেয় এই শ্রেণীটি খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যসামগ্রীর পরিবর্তন এনে দেয়। বহু চাষিরা উৎপাদনের নানান ধরনের দুগ্ধসামগ্রীর তৈরি করতে আরম্ভ করে, ফলে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন আবার ব্যাহত হয়। ১৯২০ দশক থেকে চীনে হস্তশিল্পের অবনতি ঘটে। সাতটি প্রধান হস্তশিল্পসামগ্রীর রপ্তানি হ্রাস দেখা যায়, যেমন রেশমশিল্প এবং সুতিবস্ত্রের উৎপাদন কমে যায়। অপরদিকে কিছু গ্রাম্য হস্তশিল্প এবং চা আর চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। কারণ হিসেবে দেখান হয় যে, Synthetic সুতো দ্বারা নির্মিত বস্ত্র ধীরে ধীরে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে যন্ত্রচালিত মেশিন দ্বারা তিনগুণ উৎপাদনের ফলে চীনের হস্তশিল্পের অবনতি ঘটে। উৎপাদনে ঘাটতি হয়োর চীনের গ্রামীণ অর্থনীতি প্রভাবিত হয় এবং কৃষকদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহু সাবেকি সামগ্রীর ধীরে ধীরে যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর অধীনস্থ হয়ে পড়ে। (বনস্পতি তেলের বদলে কেরোসিন, কাঠের ব্লকের বদলে আধুনিক ছাপা মেশিন ইত্যাদি)।

যুদ্ধ চলার ফলে চীনের বহু কৃষকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। উপরোক্ত অবস্থাটি চীনে সর্বত্রই দেখা দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতা অপর দিকে স্বাভাবিক ভাবেই বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। অপরদিকে চীনের বেশ কয়েকটি প্রমুখ জায়গা জাপান দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় চীনের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে এই সমগ্র কারণে চীনকে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে জোর দিয়েছিল যাতে জনসাধারণের দারিদ্র্যতা এবং দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়।

৬১.৫ সারাংশ

আলোচিত এককটিতে আপনি জানতে পেরেছেন ১৯২১ সালে সাম্যবাদী দল চীনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কীভাবে অজেয় হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল চীন জনগণের পূর্ম সহযোগিতা ও সমর্থন। সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কুয়ো-মিন-তাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ক ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন করা এবং এই দুই শ্রেণীর উপর তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। কুয়ো-মিন-তাং দলের সঙ্গো সাধারণ শ্রেণীর কোনো সংযোগ স্থাপিত হয়নি। এটি তাদের নেতৃত্বের অপর্যাপ্ততা প্রমাণ করে। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সাম্যবাদীরা কুয়ো-মিন-তাং দলের সঙ্গো সমন্বয় সাধন করে দলীয় কার্য সমাধা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুয়ো-মিন-তাং দলকে ভিতর থেকে ধ্বংস করা ও নিজ দলীয় সংগঠন এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। ১৯২৬-২৭ সালে উভয় দলের মধ্যে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯২৭-১৯৩০ সময়কালে সাম্যবাদী দল কতকগুলি অভ্যুত্থান পরিচালনা করে, যা সফল হয়নি। তবে ১৯৩১ সালে প্রথম চীনা সোভিয়েত রিপ্লাবিক ঘোষিত হল

জিয়াংসিতে। এখানেই গঠিত হয়েছিল লাল ফৌজ। এই সোভিয়েতের কাছে বড় সমস্যা ছিল চিয়াং সরকার পরিচালিত সৈন্যবাহিনী। নব্য প্রতিষ্ঠিত এই জিয়াংসি সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য চিয়াং সরকার আক্রমণ পরিচালিত করে। কিন্তু এই জিয়াংসি সোভিয়েত মাও-জে দং-এর অসাধারণ নেতৃত্বের বলে সমস্ত রকম প্রতিরোধ চূর্ণ করে অজেয় বাহিনীতে পরিণত হয় এবং চীনা রাজনীতিতে সাম্যবাদের জয় ঘোষণা করে। চীনা লাল ফৌজ ঘোষণা করেছিল তাদের পথ গণমুক্তির পথ তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জনগণের দ্বিধানহীন সমর্থন চীনা সাম্যবাদীরা লাভ করেছিল যা কুয়ো-মিন-তাং দলের অভাব ছিল।

এই এককটিতে রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গো আপনারা চীনা অর্থনীতি ও সামাজিক একটি চিত্রও জানতে পারবেন। বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অনুপ্রবেশ শুরু হয়। একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী এশিয় দেশ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক শোষণ চীনের অর্থব্যবস্থাকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল। উন্নয়নের কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নিয়োজিত ছিল। তবে মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে চীনে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি, তাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং এই সংগঠনের আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়গুলি সমানে আসতে থাকে। একই সঙ্গো সান-ইয়াৎ-সেনের চীনের পুনর্নির্মাণ, বিদেশিদের বিশেষ সুবিধার অবসান প্রভৃতির নিরন্তর প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং সরকার গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী এবং শহরাঞ্চলের বিত্তবান পুঁজিপতি শ্রেণীর সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী, গ্রামাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় নিষ্ক্রিয় রয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ সালের বিশের দশকে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না কে. এম. টি. পি'র কাছে অথচ সি. সি. পি'র শ্রমিক সংগঠন ১৯২১ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত অসফল হওয়া সত্ত্বেও অনেক ধর্মঘট আন্দোলন চালিয়ে যায়। তাই দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সি. সি. পি শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ১৯২১ থেকে তারা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। হুনানে মাও-জে-দং গড়ে তুলেছিলেন কৃষক সংগঠন। সাম্যবাদীরা কৃষকদের যে নেতৃত্ব ও সংগঠন দিয়েছিল তা সত্যই ছিল অভূতপূর্ব। চীনের বিপুল জনসমুদ্রকে আলোড়িত করে সাম্যবাদীরা এক ব্যাপক অপরিবর্তনীয় আথ-সামাজিক রূপান্তর ঘটায়। এই গণসংগঠনই ছিল সি. সি. পি-র সাফল্যের চাবিকাঠি আর কে. এম. টি. পি-র ব্যর্থতার কারণ।

৬১.৬ অনুশীলনী

১। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) চিয়াং সরকারের গঠন বর্ণনা করুন।

(খ) কে. এম. টি. পি ও সি. সি. পি-র মধ্যে ভাঙ্গানের কারণ কী?

(গ) চীনা হস্ত ও কুটির শিল্পের বিবরণ দিন।

(ঘ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় চীনা অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

২। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :**

(ক) দীর্ঘ পদযাত্রার কারণ ও বিবরণ দিন।

(খ) চীনের অর্থনীতির একটি চিত্র দিন ১৯২১-১৯৩৯।

(গ) ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু কবে হয়?

(খ) তাঁর স্থলাভিষেক কে হন?

(গ) চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কবে স্থাপিত হয়?

(ঘ) চিয়াং-কাই-শেক কোন্ সামরিক আকাদেমির সদস্য ছিলেন?

(ঙ) লাল ফৌজ কারা?

(চ) এই বাহিনীর পরিবর্তিত নামটি কী ছিল?

(ছ) লং মার্চ কবে হয়?

(জ) পদযাত্রীরা কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন?

(ঝ) দীর্ঘ পদযাত্রার প্রাক্কালে চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কী নীতি নিয়েছিলেন?

(ঞ) প্রথম চীনা সোভিয়েত কোথায় ও কত সালে স্থাপিত হয়?

(ট) চীনের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি কী কী?

৬১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. H. Su. C. Y. Immanuel—The Rise of Modern China—OUP. 1985, pp. 514-518.
2. Tiejian Chern in Chinese Revolution : Comparative Perspectives on Transformation of Non-western Societies Manoranjan Mohanty(ed). Ajanta Pub. 1992, pp. 47-50.
3. Schwartz. Benjamin-I, Chinese communism and Rise of Mao, Cambridge-Mass 1958, pp. 53-60.
4. Moise Edwine E—Modern China : The Present and The Past. Longman Group Ltd., 1986, pp. 53-60.
5. Jerome Chien—Mao and the Chinese Revolution. London, 1965, pp. 202-216.
6. K. R. Sharma—China : Revolution to Revolution, Mittal Pub., N. Delhi 1989, pp. 1-10.
7. The Cambridge History of China—Cambridge University Press.
8. Jian Bozan, et al.—A Concise History of China. Foreign Language Press, Beijing. 1989.
9. June Teufel Dreyer—China's Political System. Paragon House Pub., N. York. 1993.

একক ৬২ ❒ চীনা সাম্যবাদী আন্দোলনের সাফল্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৭-১৯৪৯

গঠন

৬২.০ উদ্দেশ্য

৬২.১ প্রস্তাবনা

৬২.২ কমিউনিস্ট আন্দোলনে জিয়াংসি সোভিয়েতের ভূমিকা

৬২.৩ জিয়াংসি সোভিয়েতের কার্যক্রম

- ৬২.৩.১ ভূমিবণ্টন
- ৬২.৩.২ প্রশাসনিক সংস্কার
- ৬২.৩.৩ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার
- ৬২.৩.৪ ভূমিব্যবস্থার সংস্কার
- ৬২.৩.৫ শিক্ষা সংস্কার

৬২.৫ সারাংশ

৬২.৬ অনুশীলনী

৬২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- চিয়াং-কাই-শেক ও তাঁর জাতীয়াতাবাদী দল কীভাবে বিদেশি সরকারের তথা পশ্চিমী শক্তির মদতপুষ্ট হয়ে অপাত জাতীয়তাবাদী মুখোশের আড়ালে কমিউনিস্ট বিরোধিতা এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি পরিচালনা করেছেন।
- চীনা কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস।
- মাও-জে-দং'এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দলের নানাবিধ কল্যাণমুখী সংস্কার।
- এই জনকল্যাণমুখী সংস্কারের কারণে চীনা জনতার অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ ফলে, চীনা কমিউনিস্ট দলের সমগ্র চীন ভূখণ্ডে সাফল্য।

৬২.১ প্রস্তাবনা

১৯৩৫ সালে দীর্ঘ পদযাত্রায় সফল হয়ে চীনা কমিউনিস্টরা বিশ্বের ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সোভিয়েত তাঁরা স্থাপন করলেন তার পর থেকে ১৯৩৭-

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় আন্দোলনের লাগাম ছিল মাও-জে-দং'এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। এই দলের সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ধারবাহিক আন্দোলন চীনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। এই আন্দোলনের মধ্যে জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সেইজন্য সুসংহত চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়কাল চীনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। অধিকার এবং অধিকার বোধের এক সমন্বয় পার্টির কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায়। মানুষের ন্যায্য অধিকারকে কায়েক করতে গেলে এবং স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা মাও-এর উক্তি থেকেই পাওয়া যায়—"রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎসারিত হয় বন্দুকের নল থেকে।" অধিকার পাওয়া শেষ কথা নয়। এই অধিকার অর্জন করে তার যথাযথ সম্মান ও এই অধিকারকে বাস্তব জীবনে প্রবাহিত করতে হলে মানুষকে তার জীবনধারায়, শিক্ষার মাধ্যমে ও জ্ঞানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৬২.২ কমিউনিস্ট আন্দোলন জিয়াংসি সোভিয়েতের ভূমিকা

১৯৩৭-৪৭ সময়কাল কমিউনিস্টদের এবং তাদের রাজধানী ঊনান-এর স্বর্ণ যুগ বলে গণ্য করা হয়। মাও-জে-দং এক "নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের" সূচনা করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি শক্তিকে পরাজিত করে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটান এবং সাথে সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সাম্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তন। সমকালীন চীনের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাকে দেখে মাও অনুধাবন করেন যে বিপ্লবের অগ্রগতি এবং সাফল্যতার জন্য সর্বস্তরের মানুষের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন যার জন্য শ্রমিক-কৃষক, petty bourgeois এবং national bourgeois-দের সম্মিলিত আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন।

জাপান-বিরোধী যুদ্ধে কমিউনিস্টদের সাথে একযোগে কয়েকটি লড়াই চালাবর পর ১৯১৪ সালে KMT কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সামরিক বাহিনী দ্বারা কমিউনিস্টদের উপর এবং তাদের শাসিত অঞ্চলগুলিকে ধ্বংস করতে উদ্ধত হল আমেরিকার সাহায্য নির্ভর করে।

এইসব ঘটনার ফলে চীনের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল যে KMT সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি তো দূরের কথা এমনকি বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে অক্ষম। কার্যতভাবে জাপান-বিরোধী যুদ্ধের সময়কাল চীনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সাংগঠনিক ঐক্যের কাছে এক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় যা পরবর্তী সময় চীনের পরিবর্তন ও বিপ্লবের গতিপথ নির্ধারিত করতে সাহায্য করে।

৬২.৩ জিয়াংসি সোভিয়েতের কার্যক্রম

৬২.৩.১ ভূমিবন্টন

১৯৩১ সালে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের কেন্দ্র হিসেবে প্রথম জিয়াংসি সোভিয়েতের প্রতিষ্ঠা করা হয়। জিয়াংসি সোভিয়েতকেই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালত বিকল্প প্রশাসনের সূচক হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

প্রতিষ্ঠা করা হয় বিভিন্ন সরকারি দফতর, কার্যালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়। জমিদার এবং বড় চাষিরা নূতন শাসনব্যবস্থায় প্রতি সমর্থন জানালেও গ্রামের ক্ষমতায় কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অব্যাহত। স্বাভাবিকভাবেই এই ধনী কৃষকগোষ্ঠী জমির দখলে বাধা সৃষ্টি করে অথবা নিজেরা উর্বর জমিতে নিজেদের মালিকানা বজায় রাখার মাধ্যমে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এচাড়াও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিণতি হিসেবে প্রতিবার জমির বিভাজনের জন্য উৎপাদনের হারের উপর প্রভাব পড়ে। বলা হয় যে উৎপাদন সংরক্ষণের জন্য সরকার একাধিকবার জমির বণ্টন করতে বাধ্য হয়।

৬২.৩.২ প্রশাসনিক সংস্কার

জিয়াংসি সোভিয়েত একদিকে যেমন বাইরের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তেমনই আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিল। মূলত কমিউনিস্ট দ্বারা পরিচালিত এই কেন্দ্রীয় কমিটির অঞ্চল নীতির বিশেষ করে বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—এই ব্যবস্থায় গ্রামের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় একইসঙ্গো সর্বহারা কর্তৃক শাসন আন্তঃশাসনের তত্ত্ব দেখা যায়। একটি সংগঠিত সৈন্যবাহিনী তৈরি করা হয়।

এই সময় মাও অনুভব করলেন যে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দ্বারা base area-কে প্রতিরক্ষা করা যায়। এই প্রসঙ্গো মাও-এর চিন্তাধারা ছিল "Political Power grows out of barrel of a gun"। মাও এই সঙ্গো পার্টিকে বুঝিয়ে দিলেন যে পার্টি হ'ল বন্দুকের মালিক এবং নিয়ন্ত্রণকারী, জিয়াংসি সোভিয়েতের সময় থেকে মাও "mass mobilisation"-এ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়া একদিকে জনসাধারণের সহযোগিতায় গণযুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার পর KMT সরকার শহরাঞ্চলে কমিউনিস্টদের উপর "white terror" চালায়। এমনকি কমিউনিজমের প্রতি সংবেদনশীল মানুষদেরও গ্রেফতার এবং ফাঁসি দেওয়া হ'ত। অপরদিকে সাংগঠনিক সেনা না হওয়ার ফলে কমিউনিস্টরা লাল ফিতে বেঁধে নিজেদের চিহ্নিত করে সশস্ত্র বাধা দেওয়া আরম্ভ করে। এর পর থেকে KMT সরকারের সেনাবাহিনী যে-কোনো ব্যক্তির হাতে লাল ফিতে জড়ান দেখলে কঠোর শাস্তি দিত। এই শাস্তি এড়াতে পরবর্তীকালে বহু সশস্ত্র কমিউনিস্টরা হাতে লাল ফিতে বাঁধা বন্ধ করে। বলা হয় যে এই ছোট যোদ্ধাগোষ্ঠী CCP-র নেতৃত্বে পরবর্তী "Red Army" তৈরি করে। সরকারি সেনাবাহিনীর ক্ষমতার তুলনায় নিজেদের সীমিত ক্ষমতার অনুভূতির ফলে Red Army গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করে।

বলা হয় যে মাও-জে-দং এই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির যথার্থ নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। বিভিন্ন অসুবিধার মধ্য দিয়ে জিয়াংসি সোভিয়েতের কার্যকলাপ চালান হয়। এমনকি জমি দখল অভিযানও আরম্ভ হয়, একই সঙ্গো গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্র এমনকি গোপন সংস্থার সঙ্গোও কমিউনিস্ট পার্টি সহযোগিতা করেছিল।

সাংসি-সানসু-লিংজিয়া সোভিয়েতের গঠন হয় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরে এবং এই সোভিয়েতকে

জাতীয় সরকারের বিশেষ আঞ্চলিক ব্যবস্থা হিসেবেও জানা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে জাতীয় সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দিক থেকে এই সোভিয়েতকে একটি বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন নামের পরিবর্তন করে সেই হিসেবে লাল ফৌজের নাম হল Eighth Route Army, যেটি জাতীয় সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসেবে স্বীকৃত হবে। Long March-এর সময় যে পরিত্যক্ত বাহিনী ছিল তার নাম হল New Fourth Army। এছাড়া Red Army Academy নূতন পরিচয় হল Resist Japan Academy এবং Lenin Club অথবা Workers Club-দের নূতন নাম salvtion Rooms দেওয়া হল।

প্রশাসনিক স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি ভূমিসংস্কারকে কিছুটা সংশোধন করার চেষ্টা করে যাতে আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছুতে পারে। সামরিক শক্তির জিয়াংসি সোভিয়েতের মতোই এখানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কেন্দ্রগুলি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য কেন্দ্রে পার্টির প্রভাব থাকলেও এই অঞ্চলেই রাজনৈতিক স্তরে তুলনামূলকভাবে স্থায়িত্ব পেয়েছিল পার্টির কার্যকলাপ। পার্টি এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে একটি প্রকল্প হল Mass mobilisation। এরই মাধ্যমে গণ-সংগঠন করার চেষ্টা চালান হয়, ফলে কিছু মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন, কৃষক সংগঠন আর ব্যবসায়ী সংগঠন আয়োজিত হয়েছিল। এছাড়াও শিক্ষাগত কিছু কার্যকলাপও এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে পার্টি চালাতে থাকে।

৬২.৩.৩ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার

পার্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার। চীনে ১৯১১ সালের বিপ্লবের পূর্বে বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ছিল যে বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর মাধ্যমে শুধু যে রাজনৈতিক দিকটাই প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, পার্টির কর্ম এবং কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন প্রতিফলিত হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে ১৬ বৎসরের ঊর্ধ্বে গোপন ভোটের মাধ্যমে ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। এই নির্বাচন পদ্ধতিটিকে বলা হত ‘Three-Thirds System—এতে ১/৩ অংশ নির্বাচিত হতেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের থেকে। বাকি ১/৩ অংশ নির্বাচিত হবে বাম এবং প্রগতিশীলদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ১/৩ অংশ নির্বাচিত হবেন যারা মধ্যপন্থী তাদের মধ্য থকে। কারো কারোর মতে ১/৩ অংশ কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে ১/৩ KMT-দের মধ্য থেকে ৩১/৩ অংশ নির্দলদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কট্টর দক্ষিণপন্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন—এমনকি জয়ীও হয়েছিল কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে তারা সংখ্যাধিক্য পাননি।

জনগণের অংশগ্রহণ, প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রচার এবং এই উদ্দেশ্যে জনসংগঠন—এগুলি সবই ছিল নির্বাচন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ—গ্রামে ও শহরে সভা, আলোচনা এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সেগুলো সমাধান সূত্র সম্পর্কে প্রতিনিধিদের অবহিত করা। যেহেতু নির্বাচকদের অনেকেই ছিলেন অশিক্ষিত ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হত না এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন হত হাত তুলে। এতে যে সরকার গঠিত হত সেটি নিঃসন্দেহে অবাধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হত কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী বা জনসংগঠনের প্রভাব ও নির্বাচনগুলোতে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকেও এই নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৬২.৩.৪ ভূমিসংস্কার

এই পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ভূমি সংস্কার। যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত ছিল যে কেউ—এমনকি বৃহৎ চাষি যদি জাপান-বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকে তাহলে তার জমি দখল করা হবে না। কিন্তু এর ফলে বৃহত্তর চাষি তাদের পরিবারে অন্তত একজনকে Red Army-তে নথিভুক্ত করে জমির পুনর্বন্টনকে এড়াতে পেরেছিলেন। পার্টি অবশ্য ভূমি ও সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ এবং গরিব চাষির সংখ্যা কমাতে ব্যর্থ হয়েছে—এর জন্য দায়ী অবশ্য তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এর ফলে ভূমিসংক্রান্ত বহু সমস্যারই সমাধান হয়নি এবং জমির স্বত্ত্ব সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। জমির স্বত্ত্ব বিস্তৃত অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকার ফলে একদিকে যেমন যান্ত্রিক পদ্ধতিকে চাষআবাদের চূড়ান্ত সাফল্য আনা যায়নি অন্যদিকে তেমনই গ্রামীণ ক্ষমতাবান গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।

৬২.৩.৫ শিক্ষা সংস্কার

পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সাধারণ মানুষকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষিত করে তোলা। যেহেতু চীনা জনগণের শতকরা নব্বইভাগ ছিল গ্রামবাসী এবং তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৯৩৭ সালের পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছিল অনেক, যদিও তাদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জেলা সদরে। স্বাভাবিকভাবেই বহু পরিবারেই ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। গ্রাম থেকে শহরে মেধার অভিবাসনের ফলে দলের তরফ থেকে ব্যাপকভাবে জনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষানীতির ভিত্তি ছিল 'জনগণের দ্বারা পরিচালনা এবং সরকারের দ্বারা সাহায্য।' পার্টি তখন কতগুলি সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে পার্টির সরাসরি দায়িত্ব পড়ে পার্টির সদস্য ও তাত্ত্বিক নেতাদের হাত থেকে গ্রামের নিম্নস্তরের গ্রামীণ কেন্দ্রের উপর। এর ফলে তৃণমূল স্তরে কর্মীদের অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং নিম্নস্তরের মানুষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হয়ে গ্রামের মানুষের সেবা সম্ভব হয়। এছাড়া নৈশ বিদ্যালয়, শীতকালীন বিদ্যালয় এবং অর্ধদিবস বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এছাড়া শুরু হয় 'গ্রামে চলা' আন্দোলন (Xiaxiang) যার মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে শিক্ষাদানের জন্য পাঠানো হয় এবং এই যুবকেরা সেখানে গ্রামীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে শহর ও গ্রামবাসীর মধ্যে এবং শ্রমিক ও কর্মচারীর মধ্যে পার্থক্য দূর করার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল জনগণকে বিশেষত কৃষকশ্রেণীকে মার্কসীয় দর্শন চীনের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বোঝান হয়। একটি গোষ্ঠী যেমন বৈপ্লবিক গণআন্দোলন এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয় অপর গোষ্ঠী একটি স্থায়ী প্রশাসন জাতীয়তাবাদ এবং চীনের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়। এই ধরনের মতের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি একটি সংশোধনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে। অপরদিকে আঞ্চলিক প্রশাসনের সাফল্য এবং ত্রুটিহীন কার্যক্রম ২৮ বলশেভিক দ্বারা যে ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছিল এবং মার্কসীয় লেনিনীও চিন্তাধারার সঙ্গো অসংগতিপূর্ণ আঞ্চলিক ব্যবস্থা একটি যথাযুক্ত উত্তর হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময় Zhengfeng আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে ওঠে আর একটি ধারণা যার মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ধারণাটি Mass Line নামে পরিচিত, যার উদ্দেশ্য ছিল পার্টিতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দূর করা। পার্টিকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে তারা যেন জনগণকে আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের কাছে আনতে চেষ্টা করেন। Mass Line-এর মূল বক্তব্য ছিল প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ সূত্র গড়ে তোলা। প্রশাসনের এই চেষ্টা চীনের ভবিষ্যতে সরকার চালাবার চেষ্টার একটি প্রধান স্তর। এই আঞ্চলিক প্রশাসনের মাধ্যমেই কর ব্যবস্থা, শিক্ষা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ, সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি চীনের সমাজবাদী বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৬২.৪ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আত্মপ্রকাশ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। মাও-জে-দং'-এর নেতৃত্বে চীনের উত্থান এশিয়াতে কমিউনিস্ট শিবিরের শক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ মাও-জে-দং যদি না চীনা জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে আনতেন তাহলে হয়তো সাম্যবাদের জয় চীন ভূখণ্ডে সম্ভব হত না। তিনি এক দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিন-তাং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারি শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। একটি বিধ্বস্ত ও বিভেদহীন রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ গতিশীল রূপ দিয়েছিলেন।

৬২.৫ অনুশীলনী

১। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :**

(ক) চীনা রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শিক্ষাসংস্কার আলোচনা করুন।

(খ) আঞ্চলিক স্ব-শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

(গ) চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিবর্তন ও সাফল্যে মাও-জে-দং'এর ভূমিকা পরীক্ষা করুন।

(ঘ) কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনীর সংস্কারগুলি কী কী ছিল ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :**

(ক) গ্রামে চোল আন্দোলন বর্ণনা করুন।

(খ) Mass line প্রকল্পটি কী ?

(গ) Three Third System কাকে বলে ?

(ঘ) ত্রিশের দশকে ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা কী ছিল ?

৩। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) চীনা কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'স্বর্ণযুগ' কোন্ সময়টি ?

(খ) কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারগুলি কী ছিল ?

(গ) 'শ্বেত সন্ত্রাস' বা 'white terror' কী ? কে পরিচালনা করেন এবং কেন ?

(ঘ) কমিউনিস্টরা হাতে কী পরিধান করতেন ?

৬২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. H. Su. C. Y. Immanuel—The Rise of Modern China—OUP. 1985, pp. 514-518.
2. Tiejian Chen in Chinese Revolution : Comparative Perspectives on Transformation of Non-western Societies. Manoranjan Mohanty (ed). Ajanta Pub,. 1992, pp. 47-50.
3. Schwartz. Benjamin-I, Chinese Communism and Rise of Mao, Combridge-Mass 1958, pp. 53-60.
4. Moise Edwine E.—Modern China : The Present and The Past. Longman Group Ltd., 1986, pp. 54-65.
5. Jerome Chien—Mao and the Chinese Revolution, London, 1965, pp. 202-216.
6. K. R. Sharma—China : Revolutiion to Revolution, Mittal Pub., N. Delhi 1989, pp. 1-10.
7. The Cambridge History of China—Cambridge University Press.
8. Jian Bozan, et al.—A Concise History of China—Foreign Language Press, Beijing, 1989.
9. June Teufel Dreyer—China's Politica System. Paragon House Pub., N. York. 1993.

একক ৬৩ ❒ বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে জাপান এবং জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৩১-৪৫

গঠন

৬৩.০ উদ্দেশ্য
৬৩.১ প্রস্তাবনা
৬৩.২ জাপানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৬৩.৩ জাপানের সংবিধান
৬৩.৪ জাপানের রাজনৈতিক বিবর্তনে ক্যাবিনেটের ভূমিকা
৬৩.৫ জাপানের নির্বাচনী কার্যক্রম
৬৩.৬ জাপানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়া
৬৩.৭ সারাংশ
৬৩.৮ অনুশীলনী
৬৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৩.০ প্রস্তাবনা

এই এককটির পড়ার পর আপনি যেসব যুক্তিগুলি খুঁজে পাবেন—

- ১৮৫৪ সালে পশ্চিমী রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের ফলে জাপান উন্মুক্ত হয়।
- পশ্চিমী অনুপ্রবেশের পর জাপান তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে এবং দ্রুতগতিতে একটি আধুনিক পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের পরিণত হয়।
- রক্ষণশীল অত্যাচারী শাসনগোষ্ঠীর পতন হয়। অত্যাচারী টোকুগাওয়া শোগুনেটের পতন ও সম্রাট মেইজির ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর অতি দ্রুত জাপান একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।
- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়।
- গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটে।
- একইসঙ্গো প্রতিবিপ্লবী ফ্যাসিস্ট, চিন্তাধার জাপানের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

৬৩.১ প্রস্তাবনা

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়কাল জাপানের রাজনীতিতে এক বিশেষ অধ্যায়। এই সময় সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে দলীয় রাজনীতির বিকাশ ঘটে। জাপানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন ছিল গণতন্ত্র অপরদিকে ছিল সামরিক অভ্যুত্থান। এর এক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দেখা যায় যে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায় আর তার সুযোগে সামরিক বাহিনীর গুরত্ব বৃদ্ধি পায়।

জাপানে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় বহু জনকল্যাণমূলক নতি গৃহীত হয় এবং মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের স্বাদ মানুষের মনে স্বাধিকার বোধের উদয় ঘটায়। ১৯২৫ সালের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার আইন এরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এরই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবাহ নয়। এই অধিকারকে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করা হয় Peace Preservation Law -এর দ্বারা। এর ফলে জনসাধারণের মানসিক অবস্থা অনেকভাবেই বাইরে থেকে পরিচালনা করা হত। এই দলীয় রাজনীতি সচেতন সত্তাকে প্রভাবিত করতে অক্ষম ছিল। এই অস্থিরতার সুযোগে জাপানে ফ্যাসিস্ট সামরিকতন্ত্রের উন্মেষ হয়।

এই সময় জাপানে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯২২ সালে জাপানে কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি ও সদস্যদের উপর অত্যাচার ও জুলুম হতে থাকে এবং এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা হয়, যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার রাজনৈতিক মতাদর্শ জাপানের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিশেষভাবে কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। এই সময় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন গৃহীত হয়—যেমন, জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা আইন, শ্রম-বিরোধী সালিশি আইন ইত্যাদি।

এই সময়ে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। Kahutai চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মনে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করা হয় এবং এক ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়, যার ফলে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে আগ্রহী হয়।

এই সমকালীন রাজনীতির আর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস জাপানকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত—এই সময়কালে জাপানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন জাপানকে একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও ধনী দেশ করে তুলেছিল। যার ফলে জাপানের বহু সম্পদ জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লাগান হয়। বলা যেতে পারে যে, জাপানের সমাজ অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে কঠোর শাসনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে, ফলে তৎকালীন জাপানের ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জাপানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, সামরিক শক্তির উত্থান ইত্যাদি জানতে পারি। তৎকালীন জাপানের

ইতিহাস আমাদের সামনে জাপানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির, গণতন্ত্রের উন্মেষ ও অবক্ষয়, প্রবল জঙ্গিবাদের অভ্যুদয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদির স্পষ্ট একটি চিত্র প্রস্তুত করে। এই কারণে বলা হয় যে সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গিবাদ জাপানের চরম সমস্যা ডেকে আনে।

৬৩.২ জাপানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

১৯২০ দশকে উগ্রজাতীয়তাবাদী (ultranationalist) চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। ১৯১৯ সালে Dai Nihon Kakusuikai (Greater Japan National Essence Society) স্থাপনা করা হয়। দুই ধরনের চিন্তাধারা Pro-Establishment state nationalism এবং Anti-Establishment nation-oriented nationalism প্রবর্তিত হয়।

১৯২৪ সালে National Foundation Soceity স্থাপিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাপানের জাতীয় রাজনীতিকে রক্ষা করা। এদের মূল বক্তব্য ছিল গণতন্ত্রীকরণে বিরোধিতা করা। তারা বামপন্থী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। তাদের মতে বামপন্থী আন্দোলন ধনতান্ত্রিক সমাজ ক্ষতি করার চেষ্টা করে অপরদিকে জাপানি সমাজব্যবস্থা শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিরোধিতা করে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেইজি মূল্যবোধকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কট্টর জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের দাবি জানান। সেই সময় Young Men's এবং Women's Association গড়ে ওঠে এবং দেশাত্মবোধক চিন্তাধারা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৩০ দশকে কট্টর জাতীয়তাবাদীরা বামপন্থী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবীদের উপর অত্যাচার চালায় যাদের চিন্তাধারা জাপানি Kotutai-এর বিরোধিতা করেছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বেশকিছু বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আসন থেকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তাঁদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য-Professor Minobe-এর জাপানি সংবিধানের ব্যাখ্যা, যার মাধ্যমে জাপানি সংবিধানকে আধুনিক জার্মান "organ theory"-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এই organ theory অনুযায়ী দেশের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় এবং সম্রাট তারই সর্বোচ্চ অংশ হিসেবে মানা হয়। সমকালীন জাপানে দেখা যায় যে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে রাজনৈতিক সত্তাধারী oligarchy-র পরিবর্তে Elite সংগঠনগুলি সক্রিয় য়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে প্রমুখ ছিলেন রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনা, অভিজাত সম্প্রদায় এবং বিচারালয়। ১৯১৮ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি অত্যন্ত জটিল অবস্থায় ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ না হওয়ায় জাপানের রাজনৈতিক পটভূমি রাজনৈতিক দল দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়নি। বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীরা মিলে সরকার গঠন করত এবং গোষ্ঠীগত একতা না থাকায় কোনো সরকারেই কোনো গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে নিজের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। আর একটি কারণ বলা হয় যে প্রতিটি গোষ্ঠীর হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা ছিল, যার ফলে অপর গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়নি। উচ্চপদস্থ আমলাদের একটি গোষ্ঠীও জাপানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সমাজের একটি সেরা অংশ বলে চিহ্নিত এই গোষ্ঠীর

সদস্যদের বিরোধিতা কোনো সরকারের পক্ষে লাভজনক ছিল না। প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোষ্ঠী জাপানের অপর একটি প্রভাবশালী অঙ্গ হিসেবে মানা হয়, যাদের প্রভাব জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পড়ে। জাপানে অপর একটি গোষ্ঠী genro অর্থাৎ বয়স্কদের পরিষদ আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সক্রিয় ছিল। Zaibatsu গোষ্ঠী ও অর্থনৈতিক শক্তি জাপানের রাজনীতিকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। জাপানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সরকার গঠনের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া।

১৯১৯-এর মাঝামাঝি সময় জাপানী শিল্প বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। “Dangerous Thoughts” হিসাবে চিহ্নিত চিন্তাধারা জাপানে দেখা যায় যার ফলে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব, সংসদের প্রতি অসন্তোষ এবং বণিকগোষ্ঠীর প্রতি বিতৃষ্ণা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

Kokutai চিন্তাধারা জাপানি দেশাত্মবোধক চিন্তাধারা একটি অঙ্গ Kokutai-কে প্রায়শই জাতীয় polity অথবা জাতীয়তাবোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। Kokutai চিন্তাধারা সম্রাটভিত্তিক রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে মান্যতা (recognition) প্রদান করে। জাপানের জাতীয় ভিত্তির উন্নতি বা প্রথা ও জাপানের জাতীয় চরিত্রের উপর গুরুত্ব দেয়। Kokutai চিন্তাধারাকে জাপানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। বলা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই চিন্তাধারাকে নূতন প্রজন্ম গ্রহণ করেনি। বলা হয় যে Kokutai চিন্তাধারার অপব্যবহারই জাপানে সামরিক চিন্তাধারা এবং tatalitariansism-কে সাহায্য করে। The Fundamentals of our National Essense নামে একটি বই শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশ করা হয়, যার মাধ্যমে Kokutai-এর গুরুত্ব, ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্ব, নিস্বার্থতা, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এটাও দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের আগে অবধি জাপানে যুদ্ধের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রাধান্য ছিল।

জাপানের ইতিহাসে বিশেষ দশককে প্রায়শই eraticism, grotesquerier, nonsense বলে চিহ্নিত করা হয়।

৬৩.৩ জাপানের সংবিধান

১৮৮৯-এ গৃহীত সংবিধান জাপানে ১৯৪৫ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এই সংবিধান অনুযায়ী জাপানের সম্রাট অসীম রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। উল্লেখ্য রাজকীয় সংগঠনটি জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু যুগ ধরে স্বীকৃত ছিল। সম্রাটই দেশের কর্তা হিসেবে সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র ছিলেন। দৈনন্দিন পরিচালনায় সম্রাটকে সাহায্য করত জাপানের রাজার খাস দরবার। এছাড়াও সেনাবাহিনীর প্রধান সম্রাটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারী ছিলেন।

সংবিধান বহির্ভূত একটি শাসকগোষ্ঠী জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এই Elite সংগঠন ‘genro’ সম্রাটকে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি যেমন প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ইত্যাদিতে পরামর্শ দিতেন। অভিজ্ঞ রাজনীতিকরাই genro-র সদস্য বলে চিহ্নিত ছিলেন। জাপানের সম্মান ও

প্রতিপত্তির বিষয়ে genro-র সদস্যরা শাসনক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের হাতে রেখেছিল। genro-র শেষ নেতা প্রিন্স সায়নজি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত জাপানি রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হন। Genro-দের মধ্যে থেকেই জাপানের সব প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হতেন।

১৯২৪-২৬-এর মধ্যে জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলীয় সরকার গঠন সফলভাবে এগিয়ে যায় এবং উদারপন্থীকে গ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন দেয় genro। যদিও জাপানি চিন্তাধারায় রক্ষণশীলতাই ছিল প্রধান অঙ্গ। genro দ্বারা সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও উদারপন্থাকে সেনাবাহিনী কোনো মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেনি।

সম্রাটের অধীনে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। নিম্নকক্ষের গঠন নির্বাচনের মাধ্যমে হত এবং উচ্চ কক্ষকে নিয়োগ করা হত। সাধারণ ব্যবস্থাপক সভার নিম্নকক্ষই রাজনৈতিক বিরোধিতার কেন্দ্র ছিল।

দেশের প্রধান কার্যকলাপের দায়িত্বে জাপানের ক্যাবিনেট ছিল। ক্যাবিনেট গঠন এমনভাবে করা হত যাতে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা না থাকে এবং ক্যাবিনেটের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির মধ্য দিয়ে সব সময় গঠিত হত না।

৬৩.৪ জাপানের রাজনৈতিক বিবর্তনে ক্যাবিনেটের ভূমিকা

১৯১৮ সালে Seiyukai দলের সদস্যরা সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলভিত্তিক ক্যাবিনেট গঠন করে। এই প্রক্রিয়াটি ১৯৩২ সাল পর্যন্ত চলে, যদিও প্রধানমন্ত্রিত্ব এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে দেওয়া হত কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে প্রার্থীর নাম genro নিশ্চিত করত। সম্রাট সেই প্রার্থীকেই নিয়োগ করতেন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্বাচন করনে তবে এর আগে সম্রাট এবং উপদেষ্টাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মতি গ্রহণ করে নিতেন।

১৯১৮ সালের Seiyukai দলের সভাপতি হারা জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন যিনি genro-গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন না। জাপানের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য প্রধানমন্ত্রী হারার সময় থেকেই হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জাপানের সাংবিধানিক শাসন প্রথা আরম্ভ হয়।

নির্বাচিত এই ক্যাবিনেট দ্বারা বেশ কয়েকটি কট্টরপন্থী দক্ষিণপন্থীদের নীতি গৃহীত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯১৯-র ভোটাধিকার দেওয়া হয় শুধু তাদের, যারা রাষ্ট্রীয় কর-এ তিন ইয়েন জমা দিয়েছিল। এছাড়া Peace Police Law নামক একটি আইন গ্রহণ করা হয়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ধর্মঘট-বিরোধী আইন গ্রহণ করে পুলিশ এবং সেনা বলপ্রয়োগের অনুমতি এই ক্যাবিনেট দিয়েছিল। অপরদিকে ক্যাবিনেট একটি বিশেষ ব্যুরো গঠন করে, যার মাধ্যমে শিশুকল্যাণ এবং জনকল্যাণের কাজ দেখাশোনা করা হত। এছাড়া ক্যাবিনেট একটি রোজগার সংস্থারও স্থাপনা করে।

চিন্তাধারার উন্নতির উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট একটি প্রচার চালায় 'The Spirit of Self-Sacrifice and Service' বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এই প্রচারটি চালান হয়, যেমন যাজক, খুব সংগঠন, নারী সংগঠন,

উৎপাদক এবং সমবায় ইত্যাদি। বলা হয় যে এই প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের কট্টরপন্থী চিন্তাধারায় পরিবর্তন করা হয়। বলা হয় যে এই ক্যাবিনেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল Seiyukai পরিচালিত একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের বৃদ্ধি, যার বিশেষ অভাব জাপানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা দেয়।

হারা একদিকে যেমন দলের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান অপরদিকে অসামরিক প্রশাসনের প্রভাব বাড়াতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। হারার এই কার্যকলাপ সামরিক বাহিনীর প্রধানদের অবশ্যই পছন্দ হয়নি। ১৯২১ সালে একজন দক্ষিণপন্থী যুবকের হাতে হারার মৃত্যু হয়।

একটি অস্থায়ী সরকারের পর genro-র মাধ্যমে জাপানে Admiral Kato ক্যাবিনেটের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন (১৯২২-১৯২৩)। নির্দলীয় হলেও Seiyukai দলের সমর্থন পেয়ে এই দলের কার্যকলাপকে সামনে রাখেন (জাপানের Washington সম্মেলনে নিষ্ক্রিয় মনোভাব, স্থলবাহিনীর ব্যয় হ্রাস এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠন ইত্যাদি)। বলা হয় যে কাতোর পরবর্তী সব প্রধানমন্ত্রীরাই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কার্যকলাপ চালাতে পারেনি যার ফলে বহুবার মন্ত্রীসভার পতন হয়।

কাতোর মৃত্যুর পর genro পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে সক্রিয় হয়ে পড়ে। Admiral গম্বিইকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়। Admiral গম্বিই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে ক্যাবিনেটের কার্যকলাপ চালান। এই তিনটি দল হল—Seiyukai, Kanseikai এবং Kankusin Club। এই ক্যাবিনেটের পতনের পর ১৯২৩ সালে যোগ দেয়। ১৯২৪ সালের মে মাসে এই জোটভিত্তিক ক্যাবিনেট আবার ক্ষমতায় আসে, যার প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা খর্ব করা হয় ফলে সেনাবাহিনীর খাতে ব্যয় এবং নিয়োগ বিশেষভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে সেনা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয় বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের দিকেও নজর দেওয়া হয়।

এই ক্যাবিনেটের প্রচেষ্টায় জাপানের কর ব্যবস্থায় আংশিক সংশোধন আনা হয় যাতে দরিদ্র চাষিদের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি না হয়, কিছু কিছু স্থানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থাপনা করা হয়। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা এবং সেনা প্রশিক্ষণ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার করা হয়।

এই ক্যাবিনেট একটি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে যেমন Seiyukai দল সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ মনে করে, অপরদিকে Kenseikai দল একটি সন্তুলিত বাজেটের উপর গুরুত্ব দেয়। এই মতবিরোধিতার ফলে ১৯২৫ সালে ক্যাবিনেটটি সম্পূর্ণ Kenseikai দলের অধীনে হয়ে পড়ে। ১৯২৫-২৬ সালে জাপান আবার একটি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং সেই সময় ক্যাবিনেটের পতন হয়।

১৯২৪ সালের নির্বাচনের ফলে Seiyukai পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পরবর্তী ক্যাবিনেট গঠন করে। ১৯২৪ সালে Kenseikai দলের প্রধানমন্ত্রী দলীয় সরকার গঠনের প্রথম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপের মধ্যে—প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার আইন গ্রহণ করা, যে আইন জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একইসঙ্গে শান্তি সংরক্ষণ আইন

নামে আইনটি রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর কোনো পরিবর্তন অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে কোনো গোষ্ঠী গঠন করা আইনত নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক কল্যাণ কয়েকটি আইনও পাশ করা হয়, যেমন কারখানা আইন, জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা আইন এবং শ্রম-বিরোধী সালিশি আইন ইত্যাদি। জাপানি সংসদের উচ্চ সভার গঠনশৈলীতে কয়েকটি পরিবর্তন করা যার মাধ্যমে এই কক্ষটি নিম্নকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বিলকে আইনে পরিণত করতে বাধা সৃষ্টি না করে, ফলে উচ্চকক্ষে অভিজাত শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্রাটের মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে এই সময় রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য পুনঃ বাড়ানো চেষ্টায় সামরিক বাহিনীর প্রভাব কমাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯২৪ সালের জাতীয় বাজেটে সামরিক বাহিনীর জন্য ধরা হয় শতকরা ১৯ ভাগ এবং ১৯২৭ সালে শতকরা ২৮ ভাগ। অপরদিকে দেখা যায় যে সামরিক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন স্কুল পর্যায়ে শুরু করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানীয় সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

এছাড়া আর একটি বিষয়ে এই ক্যাবিনেট খুব সক্রিয় ছিল তা হল কট্টরপন্থী বিরোধীদের বিশেষত কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করতে। বিশেষ করে বলা যায় যে, ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে এই ক্যাবিনেট একটি দেশব্যাপী কমিউনিস্টদের তল্লাশি চালায় যার ফলে ১৫০০ কমিউনিস্ট ধরা পড়ে। ১৯২৯ সালে আবার ১০০০ কমিউনিস্টদের ধরা হয়। ক্যাবিনেট এই সময় পুনরায় 'Peace Preservation Law' প্রয়োগ করে। এই ক্যাবিনেটটি আবার ছাত্র-সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করে 'সমাজ বিজ্ঞান' পড়ার জন্য।

১৯২৭ সালে জেনারেল তানাকার ক্যাবিনেট Seiyukai দলের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনে। জেনারেল তানাকা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক দলভিত্তিক সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে জাপানি সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে সরকারের মধ্য সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্ক দেখা যায়। একদিকে যেমন দোষীদের শাস্তি দেবার প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয় অপরদিকে সামরিক কর্তারা এই ব্যাপারে অরাজি হন। ১৯২৯ সালে তানাকা পদত্যাগ করেন। সেনাবাহিনীর এই ঘটনায় সামরিক বাহিনী ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে যেটা অসামরিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার ইঙ্গিত হিসাবে মানা হয়।

১৯২৯ সালে তানাকা ক্যাবিনেটের পতনের মূলে ছিল ক্যাবিনেট-সেনাবাহিনী সম্পর্ক। জানা যায় যে, ১৯২৪ সালে জাপানি সেনাবাহিনী একজন মাঞ্চুরিয়ার warlord-কে মেরে ফেলে। ক্যাবিনেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই সব সেনাধিকারিকদের শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সেনাবাহিনী এই প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং কোর্ট-মার্শাল প্রক্রিয়াকে রোধ করে দেওয়া হয়।

Menseito নামের একটি বিশেষ দল ক্যাবিনেট গঠন করে। Menseito দলের নেতৃত্বে যে সরকার জাপানে কার্যকলাপে চালায় তারা একটি জাপানের শান্তিপূর্ণ নীতি এবং সামরিক বাহিনীকে ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয় যে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও এই সরকার জাপানের যুদ্ধজাহাজ সীমিত করতে লন্ডনের সম্মেলনে রাজি হয়।

Menseito দলের কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারের অর্থনীতিকে দৃঢ় করবার জন্য বাজেট পুনরায়

সেনাবাহিনীর ব্যয়সংকোচ করার উপর জোর দেয়। অপরদিকে ১৯৩০ সালে জাপান দ্বারা লন্ডন-এ নৌবাহিনীর সম্মেলনে বিভিন্ন নৌবাহিনী ভিত্তিক শর্ত মেনে নেওয়ার ফলে ক্যাবিনেট-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়।

১৯২৯ সালের আর্থিক সংকট ক্যাবিনেটকে শ্রমিক কর্মসূচির পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে ফলে শ্রমিক-সংগঠনগুলিকে আইনগত সম্মতি দিয়ে দেয়। মানা হয় যে, ১৯৩১ সালে শ্রমিক-সংগঠন সংক্রান্ত আইন মূলত একটি শ্রমিক-সংগঠনের সাধারণ কেন্দ্রীয় আইন। এই ক্যাবিনেটও ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ফলে ১৯৩২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় Seiyukai দল ক্যাবিনেট গঠন করবার অধিকার পায়। তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাতাবরণের বিবেচনার ফলে Seiyukai দল সেনাবাহিনীর পক্ষে ছিল এবং দেশপ্রেম উদ্বেলিত করার পক্ষে নীতি নির্ধারণ করে। এই সময়টিকে তাইশো গণতন্ত্রের পতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় যে, Seiyukai ক্যাবিনেট মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য স্থাপন করতে সফল হয়।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেটের পতন হয়। জাপানের শেষ রাজনৈতিক দলভিত্তিক ক্যাবিনেট Seiyukai দল গঠন হয়। এই ক্যাবিনেট অসামরিক প্রশাসনের সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা কমাতে অসফল চেষ্টা করে। এই সময় কিছু রাজনৈতিক হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। একধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদের অবলম্বনে সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতি বিঘ্নিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই যিনি পূর্বে Oligarchy-র বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীর অসামরিক ক্ষমতার বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন জাপানে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকার ফলে সম্রাটের পাঠান একটি আদেশকে তিনি নির্বিঘ্নে গ্রহণ করেন। এই আদেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ ও বিদেশি রাজনীতিতে দেশের স্বার্থে হস্তক্ষেপকে ইনুকাই মেনে নিয়েছিলেন। ১৫ মে ১৯৩২ সালে কয়েকটি ব্যক্তি, কিছু নৌবাহিনীর অফিসার ও কিছু সৈনিকরা ইনুকাই-এর উপর হামলা চালায়, অপরদিকে কিছু ব্যক্তি টোকিওর বিদ্যুৎ কেন্দ্র দখল করে। May 15th Incident জাপানে রাজনৈতিক দলভিত্তিক ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পতন ঘটায়, যার ফলে প্রায় ১৩ বছর জাপানে দলভিত্তিক সরকার গঠন করা হয়নি।

Seiykai and Menseito পার্টি Saito ক্যাবিনেট গঠন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থায়িত্ব স্থাপন করা এবং নাগরিক জীবনের সমস্যার সমাধান করা। ১৯৩২-১৯৩৬ সালের মধ্যে যে সন্ত্রাসের অবস্থা দেখা দেয় তার প্রভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র লুপ্ত হয়ে যাবার দিকে এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলি সামরিক বাহিনীর শক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়নি। উদারপন্থী হওয়ার ফলে Admiral Saito ১৯৩২-৩৪-এর মধ্যে বেশ কয়েকবার উগ্রদক্ষিণপন্থীদের হত্যার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ান। ১৯৩৩ সালে Seiyukai এবং Menseito পার্টির সদস্যদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ব্যয় নিয়ে মতবিরোধ হয়। Saito ক্যাবিনেটের পতন হয় ১৯৩৪ সালে, যার মূলে বিভিন্ন মন্ত্রীদের অপবাদ জড়িত ছিল।

১৯২৪-৩৬-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী Admiral Okada—ও উগ্র দক্ষিণপন্থীদের হত্যার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে সেনাবাহিনীর একটি অংশ টোকিও তে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আক্রমণ করে ১৯৩৬ সালে এবং কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ও কিছু অন্য সরকারি

দপ্তর দখল করে নেয়। সম্রাট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব বহন করেন, যার ফলে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানের রাজনৈতিক পরিবেশে সামরিক বাহিনীর প্রভাবে ঘাটতি হয়নি।

১৯৩৬-৩৭-এর ক্যাবিনেটে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ দেখা যায়। সেনার আধুনিকীকরণের জন্য ক্যাবিনেট ব্যয়ের একটি বড় অংশ রেখে দেয়। তাছাড়া জাপানের চীন সংক্রান্ত বৈদেশিক নীতি যেটা সেনাবাহিনী পরিকল্পনা করে সেটা ক্যাবিনেট গ্রহণ করেছিল। সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে জাপানে রাজনৈতিক দলগুলি একসঙ্গো প্রচার চালায়। জনসাধারণ এই পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন দেয়।

১৯৩৭-এর ক্যাবিনেট রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে সমস্ত সদস্যদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। "একটি দেশ একটি দল"—নাৎসী আদর্শই সম্ভবত জাপানের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরাজয়ের ক্যাবিনেটের এই প্রস্তাবটি জাপানে গ্রহণ করা হয়।

১৯৩৬ সালে যে ক্যাবিনেটটি গঠিত হয়, তার মূলে ছিল সেনাবাহিনী। পরবর্তী ক্যাবিনেটে মূলত সেনাবাহিনী এবং আমলারা যোগ দেয়। এই ক্যাবিনেটের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গা করে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে গঠিত ক্যাবিনেট দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। ক্যাবিনেটের অধীনে একটি সর্বদলীয় Advisory Committee, Planning Committee, Central Federation for National Spiritual Mobilisation Committee গঠিত হয়। একটি প্রমুখ আইন গ্রহণ করা হয়, যার মাধ্যমে সব রকমের সত্তা নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশব্যাপী সংগঠনগুলিকে নিজের অধীনে রেখে দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে।

১৯৩৭-৩৯ সালের ক্যাবিনেট—রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী, বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে সুসম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করেন সেই চেষ্টা চীন জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সেনাবাহিনীর এবং যুদ্ধাজ অসামরিক ব্যক্তিদের কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে ক্যাবিনেটের পতন হয় মূলত দুই কারণে। একটি হল Anti-Commintern Pact এবং দ্বিতীয়টি হল National Spiritual Mobilisation নীতি। ১৯৩৯ সালের পরে তিনবার ক্ষণকালীন ক্যাবিনেট গঠিত হয়।

১৯৪০ সালে জাপানে একটি নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক নেতা, আমলা, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সবাই মিলে একটি নূতন রাজনৈতিক পরিকাঠামোর চিন্তাভাবনা করে কিন্তু কেউই তার পরিচালনার বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে দেশকে নূতন করে পরিচালনার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। জুলাই এবং আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সেই সংগঠনের নাম হয় 'Imperial Rule Assitance Association' সেটা ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে সৃষ্টি করা হয়।

১৯৪২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে একটি ক্যাবিনেট গঠন করা হয়, যার মূলে নীতি ছিল দেশকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করা এবং জাপান যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। ১৮৪৩ সালে জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একটি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৪ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যাবিনেট আভ্যন্তরীণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এর পরে দ্রুত ক্যাবিনেট অদলবদল হতে শুরু করে অবশেষে ১৯৪৫ সালে অ্যাড্‌মিরাল সজুকি কানতারো নূতন ক্যাবিনেট গঠন করেন এবং তিনি থাকাকালীন জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আত্মসমর্পণ করে।

৬৩.৫ জাপানের নির্বাচনী কার্যক্রম

নির্বাচন ঃ ১৯২৫ সালে জোট ক্যাবিনেট দ্বারা জাপানে গণভোটাধিকারের আইন গৃহীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ২৫ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এর আগের ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী যারা ইয়েন রাষ্ট্রীয় কর জমা দিয়েছিলেন তারাই শুধুমাত্র ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের আইনের ফলে ভোটদাতাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসঙ্গো রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার Peace Preservation Lawও চালু করেছিল। এই আইনের মাধ্যমে সরকার যে-কোনো বামপন্থী গোষ্ঠী এবং তাদের ভোটদাতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিল।

১৯২৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটাধিকার আইনের প্রচার চালায়। একইসঙ্গো নির্বাচনে ভোট কেনাবেচা এবং অসংগতিপূর্ণ নির্বাচনী পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে এই আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হয়নি, অন্যদিকে ১৯২৮ সালের নির্বাচনের বাম দলগুলি শ্রমিক-কৃষক দলের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ভোট পেয়েছিল। ১৯২৮ সালের নির্বাচনের ফলে কমিউনিস্টরা প্রথমবার জাপানের রাজনৈতিক পটভূমিতে সক্রিয় ছিল। কিন্তু শীঘ্রই শ্রমিক-কৃষক দল এবং যুব লিগদের কমিউনিস্ট ফ্রন্ট হওয়াতে তাকে ভেঙে দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের সাধারণ নির্বাচনে Seiyukai দল বিজয়ী হয়। ১৯৪২ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার মূলে ছিল ব্যবস্থাপক সভাকে আরও বেশি অনুগত করান এবং জাপানের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে জনসাধারণের দ্বারা সম্মতি নেওয়া, নির্বাচনী বিজয়ের উদ্দেশ্য সরকার ভোটাধিকারকে একটি দেশাত্ব অধিকার হিসেবে প্রচার করে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানে কোনো সাধারণ নির্বাচনে আয়োজিত হয়নি।

৬৩.৬ জাপানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়া

বিশের দশকে জাপানে রাজনৈতিক দলগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র ও উদারনীতির মনোভাবের বিকাশ দেখা যায়। এই সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটধিকার আইন এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক আইনের প্রবর্তন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য যে এই সময় বামপন্থী আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে।

১৯২০ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠনে যোগ দেয়। এই দলগুলি কোনো উদারপন্থী অথবা গণতান্ত্রিক শক্তিভিত্তিক ছিল না এবং নিজেদের কোনোভাবেই শক্তিশালী সংগঠন করতে সফল হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ যে কট্টরপন্থী দলগুলো ক্যাবিনেট গঠন করে ১৯২৫-এ তারা আমলার উপরে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতি দুর্বল শক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল।

একই সঙ্গে বলা যায় যে বিশের দশকে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণগুলি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ideological অস্থিরতা। এছাড়া genro সংগঠনটির ভূমিকা ও সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সক্রিয় হয়ে ওঠে যার মধ্যে কট্টর দক্ষিণপন্থী এবং বেশ কিছু বামপন্থী দলেও ভূমিকা দেখা যায়। একই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে দলগুলি দেশের ঐক্যতার (Kokutai) ব্যাপারে একমত ছিল। দলীয় সক্রিয়তার জন্য জাপানে জোট ক্যাবিনেটের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংশোধনের আইন গৃহীত হয়। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সভাভিত্তিক নীতি গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় ও জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির আলোচনা হয়।

বিশের দশকের শেষের দিকে বিশ্বজোড়া মন্দা (depression) জাপানের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক দলগুলো জাপানের শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতির সপক্ষে ছিলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যর্থতার ফলে জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। একই সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর থেকেও মানুষের আস্থা চলে যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সামরিকবাহিনী তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সফল হয়।

১৯২৭-৩০ সালের মধ্যে অভিযোগ ওঠে যে রাজনৈতিক দলগুলি Seiyukai এবং Menseilo দুই বিশাল Zaibatsu মিৎসুবিশি ও মিৎসুই-এর সঙ্গে যুক্ত। এই দুর্নীতির অভিযোগ সত্যে পরিণত হয় যখন ১৯২৭ সালে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং Zaibatsu-দের অধীনে চলে যায়।

এর ফলে জনসাধারণ জাপানি রাজনৈতিক দল এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এই সুযোগে সামরিক বাহিনী তার প্রভাব বিস্তারে সফল হয়। মূলত সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে।

অপরদিকে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলস্বরূপ সামরিক বাহিনীর ধনতন্ত্র এবং গণতন্ত্র নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চা হয়ে ওঠে। এছাড়াও উগ্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মতবাদ মানুষের মনে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা যারা League of Blood হিসেবে পরিচিত ছিল তারা অত্যন্ত কট্টর জাতীয়তাবাদী সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থা ইত্যাদি। এছাড়াও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে তীব্র শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিয়েছিল। একই সময়ে জাপানে সাম্রাজ্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদ বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং শ্রমিক গোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে।

১৯২৯-৩০ সালের বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষের মনে রাজনৈতিক দলের প্রতি বিতৃষ্ণা এনে দেয়। অপরদিকে প্রমাণিত হয় যে, জাপানে Zaibatsu-ই বিভিন্ন দলকে পরিচালনা করে। ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব কমে যায়। একদিকে পশ্চিম ইউরোপীয় প্রভাব, অপরদিকে দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বী ও করাপ্‌শন্‌ ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করেছে।

অপরদিকে জাপানে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সংগঠনগুলি নাগরিকদের সরকারের পক্ষে থাকার একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। The Great Japan Imperial Rule Assistance, Young

Men's Corp. ইত্যাদি সংগঠনগুলি সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীগুলিকে প্রচার সক্রিয় ছিল। The Imperical Rule Political Associations সংগঠনগুলি সরকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারে নিযুক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য যে কয়েকটি সংগঠন যেমন ব্যবসায়িক, মহিলা, যুব, কৃষি ইত্যাদি সংগঠনগুলি Imperial Rule Assistance সংগঠনের অংশ হয়ে কাজ করত।

১৯০২ সালের মধ্যে জাপানে বিভিন্ন শ্রমিকদলের উৎপত্তি হয়। সাধারণত এই দলগুলি এবং শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে একই সালে একটি সমাজতান্ত্রিক দলের সংগঠন হয়। এই দলটি একটি সামাজিক, গণতান্ত্রিক মোর্চার সমর্থন করে যেটি কমিউনিজম, সমাজতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিস্টবাদকে বিরোধিতা করে। এই দলটি অবশ্য কট্টরপন্থী দলকেও বিরোধিতা করেছে। এই দলটি নিজেকে একটি প্রভাবশালী বিরোধী দল হিসেবে প্রমাণ করতে অসমর্থ হয়েছিল। অপরদিকে নগরের শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে বামপন্থী সংগঠনের সুবিধার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কট্টর বামপন্থী কার্যকলাপগুলি পুরোপুরিভাবে সরকার দমন করেছিল ফলে তাদের ideology ও সাধারণভাবে প্রসারিত হয়নি। অপরদিকে কিছু সংগঠনগুলি সরকারের সেনাবাহিনীর নীতির বিরোধিতা করেনি। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে Universal Manhood Suffrage Act ২৫ বছরের উর্দ্ধে পুরুষদের নির্বাচনী অধিকার দেওয়ার ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য পায়, কিন্তু ১৯২৫ সালে Peace Preservation Law-এর মাধ্যমে নানা ধরনের সীমারেখা তৈরি করা হয়। এর ফলে কিছু শ্রমিক দল ১৯২৫ সালের পর সাংগঠনিক কাজে ভীষণভাবে পিছিয়ে পড়ে।

১৯২২ সালে Intellectual Studeis Society-র সক্রিয়তায় কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। এই দলটি অবশ্য গোড়ার দিকে গোপনে কাজ চালায়। ১৯২৩ সালে দলের সদস্যদের গ্রেফতারের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ স্থগিত হয়ে পড়ে। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপের উদাহরণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়—যখন একটি বামপন্থী লেখক Kabayashi Takigi-র মৃত্যু পুলিশী হেফাজতে হয়। জাপানে এই সময় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে Shinto চিন্তাধারা এবং সামরিক প্রশাসনের উপর গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়।

১৯২৯ সালে জাপানের রাজপুত্রের ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যাত্রার পরে বেশ কিছু আধুনিকীকরণের বিষয়বস্তু দেখা দেয়। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ছাত্রদের আকৃষ্ট করে। বামপন্থী ছাত্ররা বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। "বিপদজনক চিন্তাধারা" হিসেবে চিহ্নিত পশ্চিমী চিন্তা, পশ্চিমী প্রযুক্তি ইত্যাদি জাপানে ছাত্র এবং শ্রমিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯২৪ সালে একটি সংগঠন তৈরি হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্টির পুনর্বাসন, শ্রমিক সংগঠনের উন্নয়ন মার্কসিস্ট, ছাত্র সংগঠনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ১৯২৬ সালে আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্বাসন হয়। ১৯২৬-২৭ সালে এই পার্টি গণআন্দোলনকে গুরুত্ব দেয়।

১৯৩৩-২৭ সালের মধ্যে জাপানে বহু অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাদের লেখাগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, এক মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদকে পুলিশ গ্রেফতার করে কিছু সময়ের জন্য জেলে রেখে দেয়। বিশের দশকে টোকিওতে গুজব ছড়িয়ে যায় যে

কোরিয়ার জাতীয়তাবাদীরা জাপানি কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক (Revolutionary) সরকার গঠন করবার চেষ্টা করে। কোরিয়ানদের সাথে বহু কমিউনিস্টদের পুলিশ গ্রেফতার করে এবং হত্যাও করে।

১৯৩০ দশকে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠন করতে অসফল হয় ফলে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি ও বামপন্থী দলগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারে না।

শ্রমিক সংগঠনগুলি যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলে জন্ম দিয়েছিল তার সবকটি কমবেশিভাবে জাপানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯২০-২২ সালে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে anarcho-syndicalist দৃষ্টিভঙ্গি। তাতে শ্রমিক সংগঠন দ্বারা বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৯২২ সালে anarcho-syndicalist যে কমিউনিস্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বিভাজিত করে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত যে কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলনের আয়োজন হয় তাতে সমাজের বৈষম্যতা প্রকটভাবে শাসকশ্রেণীর সামনে ততটাই চলে আসে। বামপন্থী সংগঠনগুলি বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে। বলা হয় যে সরকার এবং কিছু বেসরকারি সংস্থা সামাজিক এবং শ্রমিক সমস্যাগুলির পর্যালোচনায় বসে। কিছু কিছু সংস্থা শ্রমিক সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করে যাতে বেশ কিছু দক্ষ এবং স্থায়ী শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে। বলা হয় যে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সময় শ্রমিক এবং সামাজিক আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সংগঠিত শ্রমিক দলগুলি গুরুত্বভাবে প্রভাবিত হয়। একদিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক অবস্থা অন্যদিকে রাষ্ট্রশিল্পের অবস্থা এবং সরকারের আর্থিক নীতি শ্রমিকদের মধ্যে বেরোজগার এবং বেতন হ্রাস এনে দেয়। ১৯৩০ দশকে জাপানে প্রধান শিল্পগুলির উন্নতি হওয়ার শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপে বামপন্থী সংগঠনেরা শ্রমিক দলকে ভবিষ্যতে সংগঠিত করবার সুযোগ পায়।

শ্রমিক সংগঠনগুলি মূলত বৃহত্তর শিল্পের পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে গঠন করা হয় ফলে বহু শ্রমিকবর্গ অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে থাকায় কোনো শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিতে পারেনি। ১৯৩০ দশকে বহু শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পের অধীনে সংগঠনের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯৪০ সালে এই সংগঠনগুলি সম্মিলিত হয় একটি Greater Japan Industrial Patriotic Society-তে। এর ফলে স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যায়। উল্লেখ করা যায় যে, কট্টর দক্ষিণপন্থী দলগুলি গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে ফলে শ্রমিক এবং উৎপাদক শ্রেণীরা সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির কার্যকলাপে একজোট হয়ে যায়। দেখা যায় যে ১৯৪৩ সালের পর থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২০ দশকে জাপানের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সাধারণ মানুষকে গুরুতরভাবে বিচলিত করেছিল। সমাজের একদিকে সরকার অপরদিকে শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা থাকায় ফলে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন—জনসাধারণের নাগরিক অধিকার ও সমাজ কল্যাণ ভোটাধিকার, অভিজাত-সম্প্রদায় বিরোধী সমাজব্যবস্থা ও Zaibatsu মুক্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে। সামাজিক আন্দোলনের মুখ্য শক্তি হিসেবে পরিচিতি প্রায় বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠিত শ্রমিক, এই সামাজিক আন্দোলন জাপানের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২০ সালের জাপানি মহিলারা New Women's Association নামে একটি সংগঠন তৈরি করে, যার প্রধান দাবি ছিল মহিলাদের ভোটাধিকার। ১৯২২ সালে যদিও মহিলা ভোটাদিকারের উদ্দেশ্য একটি সংগঠন League for the Achievement of Female বেশ কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীদের নিয়ে আন্দোলন চালায়।

১৯৪৩ সালে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্রীদের আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে সরকারের সামনে উপস্থিত হয়। জুলাই, ১৯৪৩ সালে ছাত্রীদের শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয় এবং ২৫ বছরের অনূর্ধ্বে অবিবাহিত মহিলাদের কৃষি এবং শিল্পের কাজ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৭টি কর্মক্ষেত্রে কেবলমাত্র মহিলা নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়। কিছু সংখ্যক এলিট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়।

সংসদীয় রাজনীতিতে ক্রমশ বিশ্বাসে অভাবের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ জাপানে ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন দিতে আরম্ভ করে। ১৯৩০ সালে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ার ফলে এই ধারণাটি বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল। একদিকে যেমন ক্ষুদ্র শিল্প ও দরিদ্র কৃষকদের সমস্যা বাড়ছিল অপরদিকে দলীয় নেতারা ভ্রষ্টাচারের ফলে মানুষের বিশ্বাস হারাচ্ছিল। অনেকেই তখন একটি শক্তিশালী authoritarian সরকারের পক্ষপাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৬৩.৭ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দূরপ্রাচ্যের ইতিহাসে অন্যতম গতিধারা ছিল বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে জাপানের দ্রুত আত্মপ্রকাশ। জাপানের রাজনীতিতে এল এক সার্বিক পরিবর্তনের জোয়ার। এই পরিবর্তন জাপানকে এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে পরিণত করে, যা পরবর্তীকালে দূরপ্রাচ্যের ইতিহাসকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। জাপানের অভাবনীয় রাজনৈতিক উন্নতি তাকে পাশ্চাত্য দেশগুলির সমপর্যায়ভুক্ত করেছিল। জাপানের আভ্যন্তরীণ উন্নতির কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ ও তার প্রতিক্রিয়ার ফলে জাপানে এই রূপান্তর ঘটেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশের চ্যালেঞ্জের সঙ্গো আভ্যন্তরীণ কারণও বর্তমান ছিল এই সার্বিক রূপান্তরের পশ্চাতে। কারণ জাপানের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজ তথা প্রক্রিয়াটি জাপানি ঐতিহ্য বিশেষ করে সিন্টোধর্মের আদর্শের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেই রূপান্তরের প্রক্রিয়া এত দ্রুত লয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

এরপর জাপান দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। জাপান পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণ করে, ফলে সংঘটিত হয় চীন-জাপান যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধ। দুটি যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ দূরপ্রাচ্যে তাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বিনা বাধায় দূরপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, চীনে জার্মানির অধিকৃত অঞ্চল দখল করে এবং চীনের উপর পনেরো দফা দাবি আরোপ করে। ১৯৩১ সালে পুনরায় জাপান প্রথমে মাঞ্চুরিয়া ও পরে চীনকে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। মাঞ্চুরিয়া মুকডেন অঞ্চলে স্থাপিত হয় জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীনে মাঞ্চুকুয়ো সরকার। বিনা প্রতিরোধে মাঞ্চুরিয়াকে পদানত করার পর জাপান পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারনীতি

শুরু করে। ১৯৩৭ সালে জাপানের প্রাধান্য চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। সাংহাই, নানকিং, ক্যান্টন, পিকিং প্রভৃতি অঞ্চল জাপানি শাসনের আওতায় চলে আসে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে ইউরোপে সংঘটিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা জাপানি আগ্রাসনের সানে এক সুযোগ নিয়ে আসে। জাপানের আক্রমণে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয় সত্য কিন্তু পশ্চিমী শক্তি তাদের সাম্রাজ্য নতুন করে গড়ে তুলতে পারেননি।

৬৩.৮ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) ক্যাবিনেট গঠনের পদ্ধতির বিবরণ দিন।

(খ) জাপানের রাজনীতিতে নির্বাচনের ভূমিকা কী ছিল ?

(গ) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাম এবং শ্রমিক সংগঠনের অবদানের বিবরণ দিন।

(ঘ) মহিলাদের নির্বাচন অধিকারে মহিলা সংগঠনের কী ভূমিকা ছিল ?

২। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কবে পাশ হয় ?

(খ) Peace Preservation Law কী ?

(গ) বিশের দশকে জাপানে যে দুটি বিপরীতমুখি রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয় তার নাম উল্লেখ করুন।

(ঘ) জাপানি কোকুতাই (Kokutai) তত্ত্বটি কী ?

(ঙ) জাপানের রাজনীতিতে Genro কারা ছিলেন ?

(চ) জাইবাৎসু ব্যবস্থাটি কী ?

(ছ) দেশের প্রধান কার্যকলাপের দায়িত্ব কোন্ বিভাগের উপর ছিল ?

(জ) জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ? তিনি কোন্ দলের সভাপতি ছিলেন ?

(ঝ) May 15th Incident কী ? কত সালে ? কেন সংঘটিত হয় ? এর ফলে কী হয়েছিল ?

(ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের সময় ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে কে ছিলেন ?

৩। **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

(ক) জাপানে ক্যাবিনেটের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) রাজনৈতিক দলের জাপানি রাজনীতিতে কী অবদান ছিল ?

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে Commnist Party-র অবদান কী ছিল ?

(ঘ) জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেনার ভূমিকার বিবরণ দিন।

৬৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। A Political History of Modern Japan 1868-1952 by R. L : Sims.
Pub. Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1991.

২। Modern Japan : A brief history by Arthur E. Tiedeman.
Pub : Euraica Publishing House (p) Ltd.

৩। The Emergence of Modern Japan : An Introductory History Since 1853 by Janet E. Hunter. Pub : Longman, London and New York.

৪। The Japanese Communist Movement 1920-1966 by Robert. A. Scalapino.
Pub : The English Book Store.

একক ৬৪ ❐ জাপানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ১৯৩১-১৯৪৫

গঠন

৬৪.০ উদ্দেশ্য

৬৪.১ প্রস্তাবনা

৬৪.২ ১৯২১-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের অর্থনৈতিক বিকাশ

৬৪.৩ সারাংশ

৬৪.৪ অনুশীলনী

৬৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৬৪.০ প্রস্তাবনা

এই এককটির পড়ার পর আপনি জাপানের অর্থনীতির উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন।

- একটি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র জাপান কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের পরিণত হয়।
- আধুনিক রাষ্ট্রে উত্তরণের পথে এই রাষ্ট্র কী কী অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল।
- কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছিল।
- কিভাবে বিবিধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাপানের অর্থনীতিতে একটি পরিকল্পিত রূপদান করা হয়েছিল।

৬৪.১ প্রস্তাবনা

জাপানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বিলুপ্ত করেন। বিলোপ করা হয় পুরাতন ভূমিব্যবস্থারও। একই সঙ্গো প্রবর্তন করা হয় এক নিয়মিত জাতীয় কর ব্যবস্থা। সম্রাট মেইজির শাসনকালে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার ফলে জাপান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। জাপান পশ্চিমী সভ্যতার সৎ গুণগুলি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল যেমন কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা। ফলে এই ক্ষেত্রে দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা জাপানকে দূরপ্রাচ্যের ইতিহাসে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করল।

৬৪.২ ১৯২১-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের অর্থনৈতিক বিকাশ

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা অতি সাধারণ স্তরে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের অর্থনীতিতে বিশাল পরিবর্তন এনে দেয়। জাপান একটি বৈভবশালী দেশ হিসেবে চিহ্নিত

হয়ে যায়। আর্থিক উন্নতির ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বেশ কয়েক সংখ্যক নব্য ধনী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ১৯১৮ সালে চালের দাম বাড়ার ফলে একটি Rice Riot ঘটে। সরকার সেনাবলের মাধ্যমে হামলাকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনে।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি জাপানে শিল্প বিরোধিতা ঘটে। সাধারণ মানুষের মধ্যে Zaibatsu এবং ব্যবস্থাপক সভার প্রতি অসন্তোষ দেখা দেয়। বলা হয় যে জাপানি সামরিক ফ্যাসিবাদ এই অসন্তোষের কারণেই সমর্থন পায়। ক্যাবিনেট একদিকে যেমন রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করে। অপরদিকে সেনাবাহিনীও কিছু কম বৃদ্ধি পায় না। ১৯২৭ সালে আর্থিক অবস্থার পুনরায় অবনতি ঘটে। অপরিদকে কান্টোর ভূমিকম্পে জাপানের প্রচুর অর্থ সাহায্যে বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং বেশ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। এই আর্থিক অবস্থার মধ্যে সরকারি ব্যয়ের মধ্যে কিছু নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। ১৯২৯ সালে শিল্পের ব্যয় সীমিত করার জন্য জাপানে একটি rationalisation প্রক্রিয়া চালান হয়। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্যতা বেড়ে যাওয়াতে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা জাপানে দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের ফলে জাপানের কৃষি ও শিল্প ব্যাহত হয়। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২ থেকে সরকার সোনার রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এবং বিভিন্ন চেষ্টায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত exchange rate কমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে জাপানে নূতন ব্যবসা এবং রাষ্ট্রীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৩ সালে Rice control আইন চালের দামকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই সময়তেই নানাধরনের ব্যবসায়িক সংস্থার স্থাপনের ফলে বেকার সমস্যা কমতে থাকে। ১৯৩৯ সালে সরকার Temporary Measures Act, Production Expansion Plan, ইত্যাদি গ্রহণ করে পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থার স্থাপনা করে। ১৯৩৯ পর থেকে জাপানের আর্থিক অবস্থার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে Planning Board.

Goods Mobilisation Plan জাপানের মুখ্য আর্থিক পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন মালপত্রকে নির্ধারিত আদান-প্রদানের মধ্যে রেখে দেয়। ১৯৪০-৪১ সালের New Economic System কর্মসূচীটি প্রত্যেক শিল্প-সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু সূচনা আদান-প্রদান করা হত।

New Financial System-এর মাধ্যমে নূতন একটি পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রের স্থাপনা হয়। একটি ব্যবসায়ীকে ব্যাঙ্কের এই পদ্ধতির সঙ্গো যুক্ত করে জাপানের আর্থিক সম্পত্তির পরিচালনা করা হত। অপরদিকে সরকার শ্রমিকদের পরিচালনার মধ্যে নিয়ে আসে। এইভাবে আর্থিক পরিচালনার মধ্যে সরকার ঋণদাতাদের ভূমিকা কমিয়ে দেয়। আর্থিক ব্যবস্থার সংশোধন আনার সময় Shareholder-দের ভূমিকা আর্থিক পরিচালনায় কমে যায়। ১৯৪৩ সালের Munitions Company Code এই ধারাকে বেঁধে দেয়। Company-র সর্বাধিকারী ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশি ক্ষমতা প্রদান করে share holder-দের সাধারণ সভার অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় যে জাপানের shareholder-দের এই সমকালীন ব্যবস্থাটি তখন থেকেই চলে আসছে।

জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে বলা হয় একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি যেখানে সরকারি ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে জাপান সেই সময় যুদ্ধবাজ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তৎকালীন জাপান Soviet Union-কে একটি শক্তিশালী শত্রু বলে মনে করে। যার ফলে জাপানে আত্মরক্ষার নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তর চীনের একটি অঞ্চলকে জাপানী প্রভাবে নিয়ে আসার একটি পরিকল্পনা ছিল। ১৯৩৬ সালে জাপান জার্মানির সঙ্গে একটি Commintern-বিরোধী চুক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে করে। বলা হয় যে ১৯৩৫-এর সপ্তম Commintern Congress-এ জার্মানি আর জাপানকে রাশিয়ার দুই গুরুত্বপূর্ণ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে ১৯৩৭-এ চীন-জাপান যুদ্ধের আরম্ভ হয় জাপানি আক্রমণ দ্বারা। বলা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই এই যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, এবং জাপানের ধারণা ছিল যে চীনকে সহজেই নিজের অধীনস্থ করে নেবে, পলে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে জাপানে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাকেও বোঝা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৬৪.৩ সারাংশ

আলোচ্য এককটি পড়ে আপনারা জানতে পেরেছেন যে সুদূর প্রাচ্যের দুটি রাষ্ট্র চীন ও জাপানে পশ্চিমী অনুপ্রবেশের ফলাফল হয়েছিল ভিন্ন প্রকৃতির। জাপানের রাজনীতিকরা অনুভব করেছিল তাদের রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অগ্রগতির কারণে। তাই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সভ্যতার সদ্‌গুণগুলির থেকে দূরে সরে থাকা সঠিক হবে না। এই অনুভূতি জাপানকে তার মধ্যযুগীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে অনুসরণ করেছিল। জাপানের অর্থনীতি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সুপরিকল্পিত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ এক অর্থনীতি।

৬৪.৪ অনুশীলনী

১। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের অর্থনীতির একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

(খ) জাইবাৎসু গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) Rice Riot কবে হয়?

(খ) Rice control আইন কবে চালু হয়?

(গ) Rationalisation প্রক্রিয়া কী?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) Goods mobilisation Plan কী?

(খ) আর্থিক ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত করার জন্য ১৯৩৯ সালে কী কী আইন পাশ হয়?

৬৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১ । A Political History of Modern Japan 1868-1952 by R. L : Sims.
Pub. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1991.

২ । Modern Japan : A brief history by Arthur E. Tiedeman.
Pub : Euraica Publishing House (p) Ltd.

৩ । The Emergence of Modern Japan : An Introductory History Since 1853 by Janet E. Hunter. Pub : Longman, London and New York.

৪ । The Japanese Communist Movement 1920-1966 by Robert. A. Scalapine.
Pub : The English Book Store.

৫ । Unlocking the Bureaucrats Kingdom, Edited by Frank Gibney.
Pub : Brookings Institution Press, 1998.

NOTES